পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়
মাতামহী শ্রীচরণেষু

এতো তুলো পিঁজবে কে ?

এক আকাশ তারা মাথায় করে পূর্ণশশী বসেছিল অন্ধকার আমগাছটির নিচে। আমপাতার ছাদনা গলে তারার আলো গড়িয়ে পড়ছে আকাশ থেকে কুয়াশার মাঝখান দিয়ে। এরই একপাশে এক চিলতে চাঁদ—মহাদেবের জটার কোণে আড় হয়ে গিঁথে থাকা গহনার মতন। আলো কিন্তু আধখানা নয়। সামর্থ্য যেমন ঠিক ততখানি দান, এখানে কোনো কৃপণতা নেই। মা বলত আকাশ হল মহাদেবের কপাল। দিনের বেলায় তেতে ওঠে আবার রাত্রি হলেই জুড়িয়ে স্থির। জগতের মানুষজন, পশুপক্ষী, গাছপালা, সারাদিনের কাজকর্ম চুকিয়ে নিশ্চিন্তে আকাশের দিকে তাকায়, চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তাদের মন ঠাণ্ডা হয়। পৃথিবীর সবাই তখন ঐ আকাশের মতনই বিশ্রামে বসে।

অগ্রহায়ণ শেষ হতে চলেছে। আর কয়দিন পরেই পৌষ। পিঠে পার্বণের মাস, পুণ্য স্নানের মাস, গোলা ভঁরা লক্ষ্মীর মাস। কিন্তু এ মাস তো সকলকে ঠাঁই দেয় না। কেউ তার আপনারজন, কুটুম্ব আবার কেউ বা সতীনের বেটাবেটি। তার সঙ্গে যেন চিরকালের জন্য টকখাই টকখাই সম্পর্ক। হয়তো সমস্ত জীবনভর তার মাথায় ঐ আকাশের তেজ বৃষ্টি হয়ে গলে পড়ে আর দুঃখ হিম হয়ে ঝরে—ঠিক এখন যেমন হু হু করে নামছে এই দুর্দান্ত জাড়ের মধ্য রাতে। ছেঁড়াখোঁড়া বি ডি ও অফিসের কম্বলে এই পাঁচ কম চারকুড়ি বছরের দেহ তাতে না, শীতের দাঁত নখ তোবড়ানো চামড়া ঢাকা হাড়মাস অনবরত খুঁচিয়ে মারে। সাইকেলে চেপে যে খাঁকি জামা ছেলেটি চিঠি বিলি করে বেড়ায় সে একদিন বলেছিল—বলি ও ঠাক্‌মা, আর কতোদিন ঘানি টানবে ? পূর্ণশশী হেসে বলেছে—আর পাঁচটি বছর বরাদ্দ মানিক। ছেলে অবাক।—কেন ? পাঁচ বছর কেন ? পূর্ণ আবার হাসে—আশী না হলে কি আর আসি বলতে পারি।

ছেলে রসিকতা বুঝতে পেরে একগাল হেসে চলে গেছে।

অন্ধকারে বাঁশ চেরার শব্দ উঠছে খটাখট্। হারাধন তার মেয়ের ঘরের বেটা

আর তার তিন ছেলে খোঁটা পুঁতছে। কেউ শাবল দিয়ে গর্ত করছে আবার কেউ বা ঝোপঝাড় টেনেটুনে জায়গা পরিষ্কার করছে। যা করবার আজ রাতের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। কাল রাত পোহালে যেন পাঁচজন দেখতে পায় পূর্ণশশী জমির দখল বুঝে পেয়েছে, আর কারোর সেখানে খোঁটা পুঁতবার অধিকার নেই। যার লাঠি তার মাটি এতোবড়ো কথা না বললেও নিদেনপক্ষে খোঁটা তো বলা যেতে পারে। আর তার জোরেই এই বাস্তু পত্তন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে লোকে বলবে—এ হল পুণ্য নাপতেনীর ভিটেবাস্তু। সাবেক কি হাল তাই নিয়ে কুটকচালি চলবে আরো কয় বছর। কিন্তু এ কথা তো ঠিক যা এখন সাবেক তাই তো একদিন হাল ছিল। মায়ের পেট থেকে পড়েই তো আর ছেলের একমাথা পাকা চুল হয় না।

বাঁশের মাজায় দা পড়ছে, রাত্রি চমকে চমকে উঠছে। কিন্তু সে শব্দে হিমের শরীর কাঁপছে না। আমপাতা বেয়ে শিশির টোপাচ্ছে টুপটাপ। পড়ে থাকা কাঁচা বাঁশের গায়ে যেন তেল মাখানো, রাংচিতের ঝোপে জোনাকি টিমটিম করছে। কি আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটে গেল এই একটি দিনের মধ্যে। সে কি কালও জানতো যে আজ রাতেই পোড়ো জমিদার বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শেষ রাত্রি বাস। তখম কি বোঝা গিয়েছিল এতোকালের আশ্রয় থেকে এমন করে পাট তুলতে হবে—বলতে গেলে বিনা আগাম তলবে। কাল রাতেও কি ভাবতে পারা গিয়েছিল এতোকাল পরে নিজের বলতে একটু মাটি হবে, ভিটে গাড়া হবে যাতে কিনা একদিন আর সব পুরুষের নাড়ি পোঁতা হবে একের পর এক। কতোকাল পরেও পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষ বলবে পুণ্য নাপতেনীর ঝাড় বংশ এখানে পোঁতা রয়েছে। একবার শিকড় গাড়লে নিশ্চিন্দি। যারা রয়েছে তাদের থেকে ফ্যাকড়া বার হতে হতে বংশের ঝাড় অনেক দূর অবধি চারিয়ে যাবে। কেউ বা বলবে—আহা গো মানুষটা বড়ো দুঃখী ছিল। তবু শেষ সময় নিজের মতন হাত পা খেলাবার একটু জায়গা পেল।

আজ সকালে নাতি হারাধন সবেমাত্র সাইকেল বার করে কারখানায় যাবার তাল করছে এমন সময় চণ্ডীমণ্ডপের সামনে হেলে পড়া সিংদরোজায় একখানি সাইকেল এসে দাঁড়ালো। নাতি বৌ তখন উনোনের কাঠ চ্যালা করতে বসেছে। পূর্ণশশী রোদে বসে চাল মিশেল খুদ বাচছে। রেশনের চালে কুলোয় না। হারাধন বদলীর কাজ করে হাজিনগর চটকলে। একহপ্তা কাজ তো দুই হপ্তা বসা। এদিকে মা ষষ্ঠীর দয়া উজোড় করে পাঁচটি এ্যাণ্ডাবাচ্ছা—চার ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলে নীলমণি চোদ্দ আর কোলেরটি সদ্য তিনমাস পেরিয়েছে। নাতির বয়স চল্লিশ টপকালেও এখনো জ্ঞানগম্যি কম। আজকাল তো কতো

সুবিধে। অন্তর করলেই নিশ্চিন্দি। কিন্তু সে কথা শুনছে কে।

সাইকেল থেকে নেমে পঞ্চায়েতের নতুন ছোঁড়াটা কালাচাঁদ হারাধনের কানে কানে কি যেন বলে গেল। দূর থেকে মুখনাড়া দেখে তো বোঝবার জো নেই, কেননা কান এখন আর আগের মতন সেয়ানা নেই। হাতের কাজ নাড়তে নাড়তে পূর্ণ ভাবছিল কি এতো কথা হচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার ফাঁকটুকু মেলেনি। তাই দূর থেকে দেখা আর মনে মনে ভাবা—এ নাড়ে মাথা ও নাড়ে মাথা, আমি ভাবি বুঝি আমারই কথা। তা সত্যিই আমার কথাই বটে। কালাচাঁদ চলে যেতে নাতি সাইকেল তুলে রেখে কাছটিতে এসে বসেছিল। হারাধন নাকি যেহেতু কালাচাঁদের দলের কানচাটা সেই জন্যে বাড়ি বয়ে খবর নিয়ে এসেছে স্বয়ং পঞ্চায়েত। মানুষ মানুষের কান চাটলে সেখানে ঘা হয় না বরং জুলুস বাড়ে। তবে চাটতে চাটতে হয়তো এক সময় জিভ ক্ষয়ে যায়। তখন আর রা কাড়বার ক্ষমতা থাকে না। কালাচাঁদ বলে গেছে মুখুজ্যেদের উত্তরপাড়ার শেষ মাথার জমিটুকু সরকারি খাস হয়েছে। আজ রাতেই যেন সে জমির দখল বুঝে নেয় হারাধন। না হলে কাল রাত পোহালেই ভিন্ন দলের লোক এসে সেখানে বসে পড়বে। হারাধন পাকা কাগজের কথা বলেছিল। কালাচাঁদ বলেছে আগে তো দখল নাও পরে জমি আপিস থেকে পাট্টা বার করা হবে। হারাধন নাকি কালাচাঁদকে বলে দিয়েছে দরখাস্তখানা দিদিমার নামেই হবে। আগে মাথা পরে তো আর সব। পূর্ণশশী বুঝতে পেরেছে পাট্টাখানা তার নামেই বেরোবে। তার মুড়োয় লেখা থাকবে মালিকানীর নাম আর শেষকালে সরকারবাহাদুরের দস্তখত। এ যেন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখা।

অন্ধকারে নাতি পুতির বাস্তু পত্তন দেখতে দেখতে চোখে জল আসে। হ্যাঁ, বুড়ো বয়সে চোখের জল বড়ো সাধ্যসাধনার। তার ওপর যে মানুষ সারাজীবন ধরে চোখের জলের জোয়ার ঠেলেছে একদিন না একদিন তো সেখানে ভাঁটা পড়বেই। কিন্তু আজ যেন সব কিছু উলটে ফেলে পালটি জোয়ার নামল—অনেককাল পরে সিটে পড়া জিভের ডগায় লোনা জলের সোয়াদ। না, একে জাড়ের তাড়সের জল বলে ভুল হয় না। তার সোয়াদ কেমন পানসে পানসে। অমনি মায়ের আর একটি কথা মনে পড়ে যায়। মা বলেছিল, আমার জীবনের অনেকখানি তো পরের আশ্রয়ে পার করলাম। তোকে যে কতোদিন এখেনে পড়ে থাকতে হবে কি জানি। তবে যেদিন তোর নিজের বলতে একটু ঠাঁই হবে সেদিন জানবি আর বেশীদিন জগতের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে না। এখানকার থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত হলে ওপরের জায়গাও পাকা হয়ে যাবে।

পূর্ণশশীর কোলের কাছে একটি পুঁটলি আর দুই বছরের পুতিনি বাদলী।

ডিগডিগে রোগা, মাথটি বড়ো আর পেট ডগরা। পায়ের সামনে একখানি টিনের তোরঙ্গ, দুটি ডালাহীন বাকসো, হাঁড়িকুড়ি, হাতাখুন্তি—ছড়ানো ছিটানো চারপাশে। এ পাশে ও পাশে ছেঁড়া কাপড় ন্যাকড়ার স্তূপ। কোলের কাছের পুঁটুলির মধ্যে একটি ছোট থলি আছে, গায়ে বিস্তর তালি তাপ্পি। বৃহস্পতিবার কিংবা একাদশীর দিন সে থলি হাতে ওঠে। এতে কোনো ভুল নেই। ঠিক যেন ঘড়িতে দম দেওয়া আছে, ঘণ্টা বাজবে সময় মত। কাছেপিঠের গ্রামগুলি পায়ে পায়ে সারা হয় আর দূরের শহরতলি কখনো এক পিঠ বাসে চেপে আবার ফিরতি পথ পা টেনে টেনে। সব জিনিসের বাজার আক্রা হয় কিন্তু এয়োদের নখ কাটা আলতা পরানোর দক্ষিণা চার আনা থেকে বড় জোর আটআনা—ক্বচিৎ কখনো একটাকা। থলিতে আছে একটি সাবেক ঝামা যা নাকি মা ব্যবহার করতো, খান দুই নরুন, তরল আলতা, ছোট বাটি আর তুলি। আগেকার দিনে তরল আলতা ছিল না। তার বদলে চ্যাপ্টা তুলোর আলতা মাখানো শুকনো পাত—যার নাম ছিল আলতাপাতা। তাই দিয়েই কাজ চলতো। নাতি মাঝে মাধ্যে রাগ করে। বলে কি দরকার এই উঞ্ছবৃত্তি করে দু-চারটে পয়সার জন্যে পথে বেরোনর। আধবেলা সিকিবেলা খেয়ে যেমন চলছে ঠিকই চলবে। ও কটা পয়সার জন্যে তো আর কিছু আটকে থাকে না। পূর্ণ সব সময় নাতির কথার মুখসই জবাব দেয় না। কাকে বলবে। সে যে মনে মনে জানে থলি হাতে যজমানিতে না বার হলে যেন নিজের সঙ্গে চাতুরি করা হয়। মনে হয় নিজের মানে বুঝি হাত পড়ছে। এ বার হাওয়া নিশ্বাস ছাড়া নেওয়ার মতন। পূর্ণ ভাল করেই জানে সে মরলে সঙ্গের চিতায় এ থলিও যাবে। বড়জোর দু-পাঁচটি বিয়ে পৈতায় হারাধন গিয়ে দাঁড়াবে, তাও নিতান্ত চেনাজানার মধ্যে। নাতির মান বড়ো ভারি। পেটে নেই ভাত কিন্তু কেউ পরামাণিক বলে ডাকলে অমনি মন কট কট করে ওঠে। পূর্ণর মনে পড়ে অনেকদিন যজমান বাড়ির মানুষ তার স্বামী ভাসুর সম্বন্ধে 'নাপতে' বলে কথা তুলেছে। তাতে করে তাঁদের নিজেরই মান সম্মানের মাথায় ছাই পড়েছে। আসলে এভাবে কখনো জাতের মান ক্ষয়ে যায় না। জাত জিনিসটা এতো পলকা নয় যে ছুঁলেই গেল। মা বেশ বলত। বলত পরামাণিক মানে হল পথের পাশে পড়ে থাকা মাণিক, আর নিজের কাছে সে হল পড়ে পাওয়া অমূল্যনিধি। নিজের ধন আপনাকে নিজেরই আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে হয়। আপনার পাদোদক খেয়ে আপনি কৃতার্থ। লোকে শুনলে বলবে অহংকার, গুমোর। বলুক গে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। মানুষের মধ্যে গুমোর থাকবে না তো কি পাথরের মধ্যে থাকবে।

নীলমণি আর তার বাপ মিলে চড় চড় করে একখানি বাঁশ চিরে ফেলল। দূরে

কোথায় শিয়াল ডেকে উঠলো। একটা পাখি আমগাছের মগডালে বসে গা ঝাড়া দিল, চা-চারটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ল এদিক ওদিক। গাছটির ও পিঠে ঠেসান দিয়ে বসে নাতি-বউ-কাজলী—তিনমাসের ছানাকে মাই দিচ্ছে। অন্ধকারে জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় বুঝি মায়ের দেহ তপ্ত হয় শিশুর ঐ চকাস্ চকাস্ মাই টানায়। কিন্তু শুকনো শিরায় দুধ আর কতো থাকতে পারে। মধু নেই ভাণ্ড আছে কেবল। তাই টেনে টেনে মন ভোলানো। এতে শিশুর প্রাণ কোনমতে বাঁচলেও মায়ের জীবন যে বার হয়ে যায়। টাটিয়ে বিষফোড়ার ব্যথা। তাই তো নাতি-বউ মাঝে মধ্যে স্তনের বোঁটায় নিমপাতার রস লাগিয়ে রাখে। ভোলানাথের জাত যেই না মুখে দেয় অমনি ছিটকে বেরিয়ে আসে। তখন আর কান্না থামতে চায় না, শস্তার গুঁড়ো দুধ-গোলা জলে মন ঠাণ্ডা হয় না।

চারকোণে চারটি খোঁটা পোঁতা শেষ। যেন তার কাঠিব চৌহদ্দির মধ্যে ভিটের প্রাণ বন্দী করা হল। ছেলেরা পড়ে থাকা কাপড় ন্যাকড়ার আণ্ডিল থেকে একখানা দুখানা করে নিয়ে বাঁশের চৌকোণ ঘিবে দেয়াল তৈরি করছে। রাজবাড়ি না হলেও নিজের ঘর তো বটে, তা সে যেমন তেমন হোক না কেন। এই তো সবে শুরু। পত্তন হল, দখল নেওয়া হল—হলেই ব[illegible]কে চোখ ঠারার মতন ঘর, চিরদিন কি আর এমন থাকবে। নিদেনপক্ষে এক[illegible]নি চালা তো উঠবে। একের পর এক ছেঁড়া কাপড় পরানো হচ্ছে খোঁটা বেড় দিয়ে. মাঝে মাঝে চট দিয়ে ফাঁক ফোকর [illegible]াকা হচ্ছে। বাস্তু পত্তনের কাজ যতো এগোচ্ছে, ততই মনে মনে মা নিভাননীর সেই কথাটি উলসে উঠছে। নিজের একটু জমি, এক ফোঁটা দাঁড়াবার জায়গ হলেই মরণের ব্যবস্থা পাকা। নিজের একানে আসনে যেমন বসে শান্তি তেমনি মরেও।

মা নিভাননীর কথার পিছনে এতক্ষণ যে কথাটি ঘুর ঘুর করছিল তার আগাপাছতলা পাওয়া মুশকিল। কোথা থেকে চলতে চলতে এই আমতলার মাটিতে এসে ঠাঁই হল. কতোখানি বয়স ডালপালা মেলল. কতো সুখদুঃখের পাঁচালী পড়া হল—সবই এই জায়গাটিতে পৌঁছবার জন্যে। কে জানে বাপু। কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায় তা কে বলতে পারে। এই সব আকাশ পাতাল ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একখানি গল্প। বলেছিলেন উকিল মা, বিহাবী উকিলের পরিবার। বিহারী মুখোপাধ্যায় এ গাঁয়ের নামজাদা উকিল, মানী মানুষ ছিলেন। পূর্ণশশী উকিল মাকে ধর্ম মা মেনেছিল। এক একজন এমন থাকেন, যাঁকে দেখলেই মা বলতে ইচ্ছে যায়। তাঁব জন্যে যেন খুড়ীমা, জেঠাইমা বরাদ্দ নয়। উকিলমা ছিলেন ঠিক তেমনি মানুষ। রামায়ণ মহাভারত কথকতার মতন বলতেন। দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন, পাঁচজনকে পড়ে

শোনাতেন। আর কতো কি যে জানতেন তিনি। রোজকার সন্ধ্যাবাতি দেখানোর পর আর পাঁচজনের সঙ্গে পূর্ণও গিয়ে জমতো উকিলমার ভিতর দালানে। বাতি জ্বলত মাঝখানে। ওপাশে জলচৌকির ওপর বই রেখে তিনি। এ পাশে থাকতো ছোলা মটর বাদাম মাখা তেল চপচপে মুড়ি। কখনো আবার গরমের দিনে বারকোশ বোঝাই তরমুজ। উকিলমা ডাবর থেকে ঘন ঘন পান মুখে দিতেন। পাঠ চলত নিত্য নতুন বিষয়। আর সব শেষে এমনি সব টুকরো টুকরো গল্প দিয়ে মুখ মিষ্টি করা।

দুই বন্ধু মিলে জাহাজে চাকরি করবে বলে জাহাজঘাটায় গিয়েছিল। প্রথমে সব দেখাশোনার পালা। তা সেই দেখ বুঝ করতে গিয়েই প্রথম জনের চক্ষু স্থির। মুখ দিয়ে কথা সরে না, চোখের পলক পড়ে না। দ্বিতীয়জন তা লক্ষ করে বলে—কি রে। অমন হাঁ করে কি দেখছিস ?

বন্ধুর ডাকে যেন সাড় ফিরে পেল সেই অবাকজন। তারপর হাত তুলে সামনে দেখালো। একটি জাহাজ তখন ভেসে চলেছে, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দূরে। তাতে রয়েছে বোঝাই করা তুলো। বলতে গেলে তুলোর পাহাড়। সেই দিকেই তার আঙুল তোলা। দ্বিতীয়জন তো বুঝতে পারে না তুলোর জাহাজ দেখে বন্ধুর ঘোর লেগেছে কেন। আর মুখেই বা অমন খিল পড়েছে কেন। সে তখন তার পিঠে একটি খোঁচা মারে। অমনি সে বলে ওঠে—তাই তো। এতো তুলো পিঁজবে কে ?

—তার মানে

—হ্যাঁ। বলি এতো তুলো পিঁজবে কে ?

যতোবার জিজ্ঞাসা করা যায় ততবারই জবাবের বদলে ঐ প্রশ্ন হয়। ভবি আর কোনো কথাতেই ভোলবার নয়। তা যাই হোক, দ্বিতীয়জন চাকরি নিয়ে জাহাজে গেল আর সেই প্রথমজন তুলোর জাহাজের পাহাড় মাথায় করে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর বেশ কটি বছর কেটে গেল। একদিন ঐ জাহাজে চাকুরে ছুটিতে বাড়ি এসে দেখা করতে গেল বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর মা তাকে দেখে কেঁদে পড়লেন—বাবা আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি হয়েছে এটুকু বলবারও ফুরসৎ পেল না সে। মা জননী বলে চলেন—সেই যে জাহাজঘাটা থেকে ফিরল তারপর থেকে একেবারে উন্মাদ। মুখে আর কোনো কথা নেই। কেবল বলছে এতো তুলো পিঁজবে কে ?

বন্ধুর ঘরের দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সে দেখলো তক্তপোশের ওপর যে বসে আছে সে এক হতশ্রী জীর্ণ শীর্ণ মানুষ। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ আর চোখ দুটি অস্থির। কি রে, কেমন আছিস ?

বন্ধুর প্রশ্নে মুখ তোলে উন্মাদ। ঠোঁট নড়ে। তারপর সেই অবাক চোখ দুটি তুলে বলে—এতো তুলো পিজবে কে ?

—বলি আছিস্ কেমন ?

প্রশ্নের জবাবে আবার প্রশ্ন—এতো তুলো পিজবে কে ?

বন্ধু সামান্য সময় চুপ করে থাকল। বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কি। তারপর ধপাস করে পাশে বসে পড়ে তার পিঠে চাপড় মেরে বলে উঠলো—আরে হ্যাঁ। সেই খবরই তো তোকে বলতে এসেছি।

বলা মাত্র তার চোখ চক চক করে। কাঁপা ঠোঁট স্থির হতে চায়। সে বলে—কি ?

—সেই তুলো বোঝাই জাহাজটা—

—জাহাজটা ? কি হল ?

—সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে গেল।

তক্তপোশ ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে পাগল। থর থর করে হাত পা কাঁপছে। অতি কষ্টে বলে—সে কি !

—হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখলাম। যেতে যেতে হঠাৎ তলিয়ে গেল তুলোর পাহাড় সমেত। একেবারে মাঝ সমুদ্রে। কেউ আর কোনো হদিস পেল না।

উন্মাদের বাঁকা ভ্রূ সরল হল। অস্থির চোখ শান্ত হল। ঘন ঘন শ্বাস থেমে একটি টানা নিঃশ্বাস পড়ল—স্বস্তিতে। আঃ, বাঁচলাম। বাঁচলাম।

মধ্য রাতের আকাশের নিচে নতুন করে সংসার পাতবার উদ্যোগ করতে বসে পূর্ণশশীর কেবলি মনে হয় এতো তুলো পিজবে কে। পিছনবাগে পেরিয়ে গেছে পঁচাত্তরটি বছর। এখন এই এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মনে হয় চলে যাওয়া দিনগুলি যেন সেই অকূল দরিয়ায় ভেসে যাওয়া যাহাজে বোঝাই তুলোর পর্বত। এতো আর পুরনো কাসন ঘাঁটতে বসা নয় বরং ঐ প্রায় আকাশ ছোঁয়া তুলোর আণ্ডিল পিজতে বসা। ধুনতে বসলে তুলো উড়বে ছেঁড়া মেঘের মতন হাওয়ায় হাওয়ায়। উড়তে উড়তে ভেসে বেড়াবে চারধারে। হাওয়ার দমকে ওপরে উঠবে। তখন আর হয়তো একখানা আকাশেও কুলোবে না। পুরনো দিনের বোঝা বয়ে বেড়ানোর মতন যাতনা আর কিছুতেই নেই। কাউকে ডেকে বলা যায় না বলতে গেলেও মনের কথা মুখে আসে না। আবার যদিও বা মুখে আসে তাকে ঠিক মতন গোছ করে সাজানো হয় না। যে জীবন এলোমেলো হাওয়ার নিচে রাখা ঐ একরাশ তুলোর বোঝা তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরে কোন্ আহাম্মক। একদিক সামলাতে অপরদিক বেসামাল হয়ে পড়ে। লেজ ধরতে

মুড়ো ফসকে যায়। তখন সেই যাকে বলে আমও যায় ছালাও যায়। কেবল বসে বসে আঁটি চোষ আর আফশোষ করো—এতোখানি জীবন ঘেঁটে কি একটুখানি রসও পেলাম না। তার চেয়ে বাপু অতো শত বাছবিচার না করে আঁটঘাট না বেঁধে সুমুখে যা পাও তাই পিজতে বসো। সাত পাঁচ না ভেবে একটিবার পিজবার যন্ত্রে টংকার দাও।

আজ এই শেষ বেলাকার মাটির ব্যবস্থা পাকা হতে মনে মনে চাগাড় দিয়ে উঠলো মাথা নোয়া বাসী দিনগুলি। অনেকটা একটি নানা ফুলের মালার মতন। যার বেশীর ভাগই বুনো। আদাড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, দিনগুলি যে কখনো শুকিয়ে যায় না একেবারে। বাসী ফুল আধা শুকনো হলেও তার বুনো বুনো কাঁচা গন্ধ মরে না। মন হাতড়ে বেড়াবার দরকার নেই। হাতের কাছে যা আছে তাই পিজলে যে অনেক। শেষ হয়েও ফুরোবে না। তবে হ্যাঁ, যাতনা একদিনই জুড়োবে—যেদিন ঐ তুলোর জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ভুসস্ ডুবে যাবে। আপনার মাটিতে মাথা রেখে শুতে পারবে সেইদিন—বোঝা নেমে দাঁড়াবে—আকাশ পরিষ্কার নীল। কোথাও পেঁজা তুলোর মেঘ নেই।

বারো বাড়ি তেরো খামার, যে বাড়ি যাই সে বাড়ি আমার।

চার কোণে চার বাঁশের খোঁটা না কি তীরকাঠি। ঘর-বন্ধন দোর বন্ধন। ছেঁড়া কাপড়, থলি আর চটের দেয়াল, মাথার ওপর কাপড়ের আচ্ছাদন—যেন বিয়ের ছাদনাতলা। এও এক বিয়ের আসর বটে, আবাগী অভাগী যেই হোক না কেন বিয়ের পিঁড়িতে তো বসতেই হবে। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার নেই। সেই যে কি বেশ একখানি গান রয়েছে না—নদীর কূলে হবে রে শেষ বিয়ে। এও তো এক নদীর কূল। জীবনের শেষ পঁইঠেতে পা রেখে নিঃশ্বাস ফেলবার মতন আশ্রয়—হালে গ্রামের নাম গ্রাম কাঁচরাপাড়া, সাবেক নাম কাঞ্চন পল্লী। বেশ নামটি। সোনার গ্রাম, সোনার দেশ। কোন কালে যেন বলতো সোনার বাংলা, তার মধ্যে এই এক ফোঁটা গ্রাম কি একটু সোনাও পেতে পারে না। মায়ের এক গা গহনার মধ্যে একটি নাকের নথের ফুল কিংবা পায়ের আঙুলে রূপার আঙটে এই ফোঁটা সোনার কুসুম। এ বড়ো প্রাচীন গ্রাম। পশ্চিম ধার দিয়ে বহে চলেছেন গঙ্গা—ত্রিদোষনাশিনী, পাপহারিণী। নেমে এসেছেন সেই কোন মুলুক থেকে, পাহাড়-পর্বত ভেঙে। উকিলমা বেশ বলতেন—গঙ্গা হলেন হিমালয়ে নিবাসিনী গৌরী মায়ের এলোচুল। আচমকা খোঁপা ভেঙে চুলের ঢাল গড়িয়ে পড়েছে। আর গোছ করে টেনে বাঁধা হয়নি। পূর্ণশশীর সামান্য লেখাপড়া,

জানাশোনার হাতেখড়ি ঐ মা জননীর কাছেই। তিনি হাতে ধরে অক্ষর চিনিয়েছিলেন। একটু একটু করে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস পড়তে শিখিয়েছিলেন। একজন বলেছিল নাপতেনীর আবার বিদ্যেধরী হবার সাধ। উকিলমা সে-কথা শুনে বলেছিলেন—বিদ্যে বামুন কায়েতের খাসতালুক নয়! যে নিতে জানে তাকেই তিনি দেন। উকিলমার কৃপাতেই এখনো দরখাস্তে কাঁপা হাতে দস্তখত হয় গোটা গোটা অক্ষরে। কেবল পড়ার দৌড় শেষ। কারণ চোখের নজর আস্তে আস্তে পতিত হতে চলেছে। তাই চোখ বুজেই মহাভারতের সেই অমৃতসমান পদগুলি দেখতে হয়।

আমতলা ছেড়ে ঘরে ওঠা হল। নাতি বউ কাজলী টিনের তোরঙ্গের ওপর কাঁথা-ন্যাকড়া বিছিয়ে ছানাকে শুইয়ে একপাশে মাথাটি ঠেকিয়ে এলে পড়েছে। লম্ফর আলোয় মেয়ের চিমসে গাল বেয়ে নাল গড়াচ্ছে, বুকের কাপড় সরে গিয়ে পাঁজবার পাশ বরাবর নুনের পুঁটুলির মতন দগদগে স্তন বেরিয়ে পড়েছে। হুঁশ নেই, সহবত জ্ঞান নেই। বাঁজা মেয়েমানুষের অনেক বয়স অবধি লজ্জাসরম থাকে, দেহে রাখঢাক থাকে। থাকে থাকে বুকের কাপড় তুলে দেয়। আর কাঁচা বযসী মেয়ে যদি বছর বিয়োনী হয় তো লজ্জার মাথা সেই কোন্ কালেই খেয়ে বসে থাকে। মেয়ে মানুষ তো দূরের কথা পুরুষ সামনে এলেও আড়ষ্ট হতে ভুলে যায়। নাতি বউয়ের হয়েছে সেই হাল।

পূর্ণর কোল থেকে পুতিনি বাদলী এখনো নামেনি। পুতিনি তো নয় এ হল পুতনার জাত। অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে, আর বেশীর ভাগই মরে শেষমেষ সেই কৃষ্ণের দাঁতের কামড়ে—সে ধিনি কেষ্ট হোক আর নাড়ুগোপালই হোক না কেন।

চটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আমতলায় আগুন জ্বলেছে। কাঠকুটো আর পাতা-নাতা জড়ো করে হারাধন আর তার তিন ছেলে আগুন ঘিরে তাপাতে বসেছে। রাত পোহাতে এখনো দেরী আছে। এখনো গাছে গাছে পাখিদের পাকা ঘুম। শিশু পাখিরা দ্যায়লা করছে। একটু দূরে ফেলে আসা পোড়ো জমিদারবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে লক্ষ্মী পেঁচার কান্না এখানেও ধেয়ে আসছে। বাড়িটার অন্দরমহলে খানকতক ঘর এখনো বাসযোগ্য। প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় কলকাতা থেকে চৌধুরীবাবুরা গাড়ি চেপে আসেন। সেই সময় বাড়িতে কোথাও কোথাও রঙ পলেস্তারা পড়ে। আলো জ্বলে, ঢাক বাজে, মানুষজনের কলকলানিতে ভাঙা বাড়ি জম জম করে—সেই সব সাবেক দিনের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে কতো না আনন্দের হাট ছিল এখানে যখন জমিদার কর্তা শ্যামাচরণ চৌধুরী বেঁচে ছিলেন। কর্তা মা শৈলনন্দিনী—আহা কি মধুর মানুষ।

কৃষ্ণরাইজীর মন্দিরে জমিদারদের সেবার পালা আছে। তাঁরা যেমন মা-মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন তেমনি মাসে ছয়দিন করে মন্দিরে পালায় কাজ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঐ ছয়দিন দুইবেলা মিলিয়ে অন্ন আর শীতল ভোগ মেলে। এছাড়া আট আনা করে জলপানি। ঐ কটি দিন বড়ো আহ্লাদে কাটে। মনেই হয় না পাথরের সেবা করছি। এ যেন নিজের সেবা নিজেই করা। সত্যি কথা বলতে কি ছয়দিন আত্মসেবা—পেটপুজোও তো হয়। পুতি-পুতনার হাতে নাড়ুটা, কলাটা কখনো বা কানা ভাঙা সন্দেশ তুলে দিতে মন ভরে যায়। মনে মনে মার্জনা চায় পূর্ণ পাষাণ মূর্তির কাছে। বলে—মাপ করো শ্যামরায়, আমার পেট তো আর পাথরের না। সেখানে যে মোচড় মারে অনবরত। তোমার এই বিরাট রাজত্বে আমার মতন দীনভিখারী প্রজা যদি অভুক্ত থাকে তাহলে কি রাজভোগ তোমার মুখে রুচবে। মাপ করো ঠাকুর মাপ করো, আমার কাছে তোমার চেহারা অমনিই। পরে কেবল একটি মহাশয় যোগ করে দিই। কেননা কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমন। তা আমার মন অমন ধারাই। কেমন যেন মানুষের গন্ধ পাঁউ পাঁউ ভাব। তাই তো সন্ধ্যা-আরতির সময় শ্যামের ডাগর চোখের আড়ালে সেই অকালে চলে যাওয়া মানুষটির বড়ো বড়ো চোখ দুটি ঝিকমিক করে। গাঁটছড়া বাঁধার পর মাত্র চারটি বছর এক সঙ্গে—তারপরে সব.কাটান ছেঁড়ান। কার্তিক কুমার—নাম যেমন তার সঙ্গে চেহারা—ছবিতেও মিল তেমন। গলায় পৈতে আর নামাবলি গায়ে চড়ালে মনে হবে বুঝি কোন ভটচায মশায় এলেন। লোকে চোখ বুঁজলে মানুষ বলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটেছে। তা 'আমারও ঐ পালা সেবার মাঝখান দিয়ে একরকম কেষ্টপ্রাপ্তি হচ্ছে।

বুড়ো পুতি নীলমণি ডাক দেয়—বড়মা, ও বড়মা।

হাত দিয়ে চট' সরায় পূর্ণ—উঁ।

—ঘুমোলে নাকি ?

—না বাপ। এই জাড়ে যে দাঁত নেগে যাচ্ছে।

নীলমণি হেসে ওঠে—মিথ্যে কথা।

—অ্যাঁ, যতো বড় মুখ নয় ততো বড়—

হ্যাঁ, মিথ্যেই তো। তোমার কি দাঁত আছে একটাও। সব তো মাড়ি।

ঠাণ্ডায় বুঝি হাসিও আড়ষ্ট। তাই হাসতে গিয়েও পারে না পূর্ণ। বাইরে কিন্তু তখন হাসির ধূম। তিন পুতি হাসছে, হাসছে নাতি হারাধনও। এ তো দুঃখেও হাসি আসে। এদিকে উত্তুরে হাওয়া মারছে। হাওয়ার দমকে পাতলা কাপড় উড়ছে, হাড়মাস হিম হয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে জল গড়ায়, চোখও শুকনো নয়। ঠিক মালুম হচ্ছে না কোনটি আনন্দের আর কোনটি দুঃখের জল। গায়ের কম্বল

দিয়ে মেয়ের দেহ ভাল করে ঢেকে দেয় পূর্ণ। মেয়েটা একটু নড়ে ওঠে। সর্বনাশ, এখন জেগে গেলেই অনাসৃষ্টি করে ছাড়বে। একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে আর থামবার নাম নেই। তাড়াতাড়ি কাপড় সরিয়ে পূর্ণ মাছের পটকার মতন স্তন বার করে পুতনার মুখে গুঁজে দেয়। চামড়ায় দাঁত বসে আর শীতল বুকের খাঁচা অমনি তেতে ওঠে। হারাধন বলে—দিমা, একটু চা খাবে নাকি ?

কোথা থেকে যে চায়ের কৌটো খুঁজে বার করা হয় তা কে জানে। মাথা নেই গলা নেই ছোট হাঁড়িতে চা ফুটছে—দুখানি ইটের ওপর, নিচে আগুন। এই চা নিয়ে কি কম হেনস্তা হয়। হালিশহরের কবিরাজ পাড়ার ঘোষাল বাড়ি হল পুরনো যজমান। সেই মায়ের আমল থেকে এখানে কাজকারবার। কিন্তু এখনো তারা আপন হতে পারল না। কেমন যেন ছাড়ো ছাড়ো ব্যবহার। এতোখানি পথ ভেঙে রোদে ঘেমে হয়তো বিকেলের দিকে গিয়ে পৌঁচেছে পূর্ণ। বাড়ির মেয়ে-বউরা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তখনো সকলের আবুল্লি কাটেনি। ভেতরে রান্নাঘরে যে চা চেপেছে তা এই বারান্দায় বসেও টের পাওয়া যায়। ঠুং ঠাং কাপডিসের বাজনা, কেটলির সোঁ সোঁ। বউমেয়েরা সব হাত মটকাচ্ছেন, হাই তুলছেন। গিন্নীমা পা ছড়িয়ে বসে ব্রহ্মতালুর পাকা চুল একহাতে আয়না ধরে পটাপট ছিঁড়ছেন। পূর্ণ একপাশে বসে একটু দম নিতে নিতে হাতপাখার বাতাস খায় আর ভাবে এমন সময় একটু চা পেলে যে কি তৃপ্তি না হতো। একটু পরে রান্নাঘর থেকে রাঁধুনী মেয়ের ডাক এল—আপনারা আসুন গো।

গিন্নীমা হাঁটুতে ভর রেখে উঠে দাঁড়ান—চলো গো তোমরা। তুমি একটু বোসো পুণ্য।

মা, মেয়ে, বউ সবাই মিলে পড়ি কি মরি করে রান্নাঘরে ছোটে। পূর্ণ এখানে বসেই শোনে হুস-হাস চা টানার শব্দ, আঃ উঃ আরামের আহ্লাদ আর তার সঙ্গে হা হা হো হো হাসিতামাশা। বারান্দায় একলা বসে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে পূর্ণ মাঝে মাঝে হাই তোলে আর ভাবে তার চেয়ে বরং থলি থেকে ঝামা, নরুন, আলতা সব সরঞ্জাম বার করে গুছিয়ে রাখুক।

রান্নাঘরে চা পর্ব মেটে। কেউ পান মশলা মুখে আবার কেউ বা শুধু মুখে আবার এসে বারান্দায় জমে। তারপর সব একে একে হাত-পা বাড়িয়ে দেয়। পূর্ণ মাথা হেঁট করে সেবা করতে বসে। যজমানকে সেবা করবার জন্যেই তো জগতে আসা। এ ছাড়া যে আর কোনো গতি নেই। তবে হ্যাঁ যতো দিন যাচ্ছে ততই সব কেমন বদলে যাচ্ছে। অগেকার দিনের মতন এক বাড়িতে কুড়ি-পঁচিশ কখনো বা তার বেশী মেয়ে বউয়ের নখ কাটা আলতা পরানোর দায় মাথায় নিতে হয় না। তার ওপর একাদশীর দিন হলে তো কথাই নেই। বলতে গেলে পাড়া

ঝেঁটিয়ে এয়ো-মেয়েরা এসে জুটতো। সকলকে একবার করে ছুঁতে বিস্তর সময় চলে যেত। তার মধ্যে আবার কোনো ছোট মেয়েটির আরদার—ওগো, আমার পায়ের মধ্যিখানে এই এমনি একটা ফুল করে দাও না গো। কারোর বা পা জুড়ে আলতার চেন টানা গহনা। কেউ আবার ফরমায়েস দেয় হাতের তেলো জুড়ে পাখি-লতাপাতার চিত্রবিচিত্র। তখন দেহে ক্ষমতা ছিল, তাই হাসি মুখে সব আবদার তামিল করেছে। এখন যেন সময়ের সঙ্গে সব কিছু মানিয়ে গেছে। কোনো ধকল পোহাতে হয় না। বেশীরভাগ বাড়িতেই মেয়ে বউরা আজকাল আর আলতা পরতে চায় না। বিশেষ করে কলেজে পড়া মেয়েরা তো নয়ই। এখন সব বিদ্যাধরী কিন্নরীর দল। পায়ের নখে রঙ, খটখটে খড়ম জুতো—চলনে বলনে কেমন বেটা বেটা ভাব। মা জননীরা মুখে বললে কোপ ধরবেন তাই মনে মনে বলতে হয়—মা গো, একটিবার নিজের পা দুখানি চেয়ে দেখেছো কি। সকলের তো আর ছ্যাকড়া চরণ না। অনেকেরই তো পায়ে লক্ষ্মীর শোভা। একবারও কি ইচ্ছে যায় না অমন ট্যাঁপা-টোপা পা দুখানি রাঙাতে। আসলে এ চোখ থাকার ব্যাপার না, মনের সাধ। মন না রাঙালে দেহ কি করে রাঙে। মন না সাজলে দেহ কি আর সুন্দর করে সাজে। কে জানে, হয়তো এ ভুল। এখনকার সাজের ধরন হয়তো বদলেছে, মনের ভাব পাল্টে গেছে। দিনকালের এই বদলির জন্যে শখ-আহ্লাদও কেমন হাওয়া বদল করেছে। তবুও সেই মা জননীরা যখন মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা দেখে বেড়ান তখন কি একবারও তাঁর চরণ দুখানিতে চোখ যায় না। তখন কি একবারও মনে হয় না আমারও কতক কতক অমন এক জোড়া পা ছিল। সেখানে রাঙালে মন্দ লাগত না। সব থেকে বড়ো কথা এই এখনকার মতন কঠিন শীতে মায়েদের চরণ আটফাটা হয়ে যায়। যাঁদের উপায় আছে তাঁরা মলম দাওয়াই লাগান—কিন্তু তাতে কেবলি ঝক্কি বাড়ে। তার চেয়ে বরং পা দুখানি সামনে মেলে বসো দেখি মা। প্রথমে বেশ করে জলে ভিজিয়ে ঝামা দিয়ে ঘসেমেজে দিই। তারপর শুকনো কানি দিয়ে ভাল করে মুছিয়ে তিন পুরু করে আলতা টেনে দিই। তিনদিন পরে দেখবে সব ফাটাফুটো, খানাখন্দ কোথায় মিলিয়ে গেছে—পা দুখানিতে তেল গড়িয়ে পড়ছে আর নিকানো উঠোনের মতন ঝকমক করছে। তখনকার দিন হলে বলতাম—আলতা নাহি পরলে রাই, আসবে না তোর প্রাণ কানাই।

—নাও বড়মা, ধরো।

চমকে তাকায় পূর্ণ। নীলমণির হাতে কলাই করা বাটি চাদরের খুঁট দিয়ে ধরা। ধোঁয়া উঠছে। হাত বাড়িয়ে পাত্রটি নিতে নিতে দখিন হাত দিয়ে পুতির

চিবুক ছুঁয়ে চুক করে চুমো খায়—ধন আমার।

নীলমণি হাঁ হাঁ করে ওঠে—হাত পুড়ে যাবে। পুড়ে যাবে। কাপড দিয়ে ধরো।

—পোড়া হাত আর কি পুড়বে বাপ। তার চেয়ে এই জাড়ে আড়ষ্ট আঙুল একটু সাড় পাবে।

দুধ বিনা গুড় গোলা চা। আহা যেন অমৃত। চুমুক মারতে পাথরে প্রাণ এল, গলা দিয়ে পাতলা আগুন নেমে এসে সমস্ত দেহ ওম পেয়ে তেতো উঠলো। বাস্তু স্থাপনের পর এই প্রথম তার ওপরে বসে কিছু মুখে তোলা হল। হলেই বা চা, তাও মিষ্টি মুখ তো বটে। কয়েক ঢোক খেয়ে মনে পড়ে নাতি-বউটা শীতে কুঁকড়ে রয়েছে। এতোবার বিয়োলে দেহে কি আর রক্ত থাকে, সব যে জল হয়ে যায়। বাঁ হাত দিয়ে কাজলীর পিঠে আস্তে করে ঠেলা দেয় পূর্ণ। একবারে সাড় পায় না। বেশ বার কতক ঠেলাঠেলিতে বউ হুঁশ পেয়ে চমকে মুখ তুলে তাকায়। তাড়াতাড়ি টিনের তোরঙ্গের পালঙে শোয়া ছানাটির দিকে হাত বাড়ায়। সে হাতে এসে পূর্ণর হাত পড়ে—এটুকুন খেয়ে নে বউ।

'থতমত কাজলী প্রথমে বুঝতে পারেনি। বোধহয হাতে গবম লাগতে ধাতস্থ হয়—কি দিমা।

পূর্ণ একগাল হেসে বলে—দেখ কেমন অর্মত্য বানিয়েছে তোব বেটাবা।

বাইবে আমতলার আগুনে আরোপাতা-কাঠ পড়েছে। মেজো পুতি দিনমণি গলা ছেড়ে গান ধরেছে—ও আমার দযাল বে, ও আমার বান্ধব বে এ এ এ...

হারাধন দুই হাঁটুতে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে। সেজো ছেলে অমরনাথ বাপের পিঠে মুখ গুঁজে দুই হাত দিযে তাব গলা জাপটে রেখেছে। দাউ দাউ আগুনের চারপাশ ঘিরে হিমের ঘের। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আগুন নিবলেই আস্তে আস্তে সকলকে জাপটে ধরবে। কোলের মেয়েটার মুখ থেকে বুকের পুঁটুলি নিস্তার পেয়েছে। রাক্ষসী ঘুমিয়ে গেছে আবার। নিজের মতন জায়গা পেয়ে যেন সকলেই নিশ্চিন্ত। পূর্ণশশী বেশ টের পায় এই মেয়ে-মর্দ, ছানাপোনা সকলেই যেন বেশ থিতু হযেছে। কিন্তু তা হলেও তার মনের কোথায় যেন একটি আলগা ভাব রয়ে গেছে। সব কিছু নিয়ে বেশ ভাল করে জেবড়ে বসা যাচ্ছে না। না না, সেই ওপরতলায় জায়গা খালি হওয়ার জন্যে নয়—এ এক পুরনো অভ্যাস। এতোকাল পরে তা কি আর এক কথায় চলে যেতে পারে। এই একটি ভাব নিয়েই তো সমস্ত জীবন কেটে গেল। এখন এই শেষ বেলায় কি আর ধাতস্থ হওয়া যায়। সবই ঠিক আছে কিন্তু কোথায় যেন বেঠিক বাজে—সামান্য সামান্য।

যজমানি করতে যে বাড়ি যাওয়া হয় সেইটিই তখনকার মতন নিজের বাড়ি। পর পর মনে করলেই গেল। এই মন্ত্রটি বংশ পরম্পরায় কানে বাস করছে, এর থেকে বেচাল হলে আর ধর্ম থাকে না। অমনি তার থেকে পতন। মানের জ্ঞান টনটনে রেখেও এই মন্ত্র মেনে চলা যায়। বিয়ে বা পৈতে বাড়ি হোক না কেন— কামানের কাজ সারা হলে বঁটি পেতে এক বস্তা আলু কুটতে বসা হল; এক পাঁজা পান নিয়ে খিলি করা হল, বরণডালা গোছ করা হল। এমনি কতো কাজ। কোথাও কেউ যেচে কাজ দেয় আবার কোথাও নিজে খুঁজে নিতে হয়। না থাকলে নেই কাজ তো খই ভাজ। আকাশ থেকে কাজ পয়দা করে নিতে হয়। নিজের গুণে তখন চরম অকাজও মস্ত কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সারা দিনের পরে রাতের বেলা যখন সবাই বাসরঘরে কিংবা শয়নে তখন একধারে মাদুর-চাদরে পড়ে পড়ে মহাসুখে নিদ্রা। সারাদিনের কাজকর্মে সমানে যোগান দিয়ে গেছে নিজের সাধ্য মতন। একবারও মনে করেনি পরের বাড়ি, পরের কাজ। এ মনে করলে আর ধর্ম রক্ষা কবা যায় না।

কিন্তু সব তো আর একতরফা হয় না। অনেক বাড়ি আছে যেখানে পা রাখা মাত্র সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। এসো এসো হাঁক পড়ে। তাদের মুখের হাবভাব দেখে মনে হয় কেউ ভান করছে না, সত্যি ভালবেসে ডাকছে। যেন তাকে দেখে ভরসা পেল সবাই। সঙ্গে সঙ্গে চা, পান-দোক্তার যোগানে আর বাড়ির গিন্নীর পক্ষ থেকে কয়েকদিন থাকবাব জন্যে আগাম বাযনা। এতোদিন মানুষ নেড়েচেড়ে মনের কথাটি পড়ে ফেলবার বোধটি পাকা হয়েছে। মানুষেব মন বোঝবার নাড়িজ্ঞান রপ্ত হয়ে গেছে। তাই গিন্নীমার কথার মায়ায় পড়ে যেতে সময় লাগে না। পূর্ণ আসন পেতে বসে পড়ে। বিয়ের পরদিন বিকেলে মেয়েটি যখন স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে চলে যায় তখন সারা বাড়িতে কান্নাকাটি। মেয়েব বাপ কাঁদছেন, মা কাঁদছেন—কাঁদছে অনেকে। তখন বুঝি এই বুড়ি মানুষটাকেই সবাই আঁকড়ে ধরে। ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসে, কতো জানাচেনা সান্ত্বনার কথা তার মুখ থেকে শুনতে চায় সকলে। এইভাবে সইয়ে সইয়ে দু-চারটি ছোট হাসি-মস্করা, পুরনোগল্প—এই করতে করতে অনেকটা ধাতস্থ হয় সবাই। উনুনে নতুন করে চা চাপে, পান সাজতে বসে পূর্ণ। বুড়ি ঠাকুমা তখন ফরমায়েস দেন—একখানা গান বল্ পুণ্য।

মাথা হেঁট করে পূর্ণ বলে—সে বয়েস কি আর আছে কত্তা মা। এখন যে গলা পড়ে গেছে।

—তা হোক। তোর যে কি মিঠে গলা ছিল। আহা— সেই ইস্টিমারের গানখানা বল্ না রে। ছেলেমেয়েরা সকলে হৈ হৈ করে ওঠে—হ্যাঁ হ্যাঁ। করো

করো।

অগত্যা মুখ খুলতেই হয়। মুখের পান বাইরে ফেলে এসে পা মুড়ে বসে পূর্ণশশী। চোখ বোজে। তারপর চাপ ধরা গলা চিরে গুণগুণ করতে করতে এক সময়ে সুর উঠে আসে—দেখে এলাম গঙ্গারঘাটে মহাভাবের ইসটিমার, হরিদাস কেরানি যে তার আর দয়াল নিতাই চাঁদ টিকিট মাস্টার...

ছেলে মেয়েরা কেউ গান শুনে হাসে আবার কেউ বা অবাক হয়। এখনো এই বুড়োকালে গলায় সুর বড়ো একটা বেমক্কা বলছে না। এখনো জোয়ারি মরে যায়নি। কেননা এ দেহে যে বাপের মিষ্টি রক্ত আছে। যে রক্তে সুর থাকে তা কি কখনো লোনা হতে পারে। বাবাই এ সমস্ত গান শিখিয়েছিল। আহা, কি দরিয়ার মতন গলা ছিল প্রাণকৃষ্ণ পরামাণিকের। কানে হাত চেপে টান দিলে মনে হতো মনের ভেতরে গিয়ে বুঝি সে সুরের দাগ লাগছে। এই এতোখানি চওড়া আওয়াজ। বাপেব চেহারা কিন্তু প্রকাণ্ড না। একহারা, ছিপছিপে, বাবরি চুল। মুখের মধ্যে কেবল লদলদে লম্বা নাকটি সার। তার নিচে খেজুর কাঁটার মতন দুই টুকরো গোঁফ। কিন্তু আওয়াজখানি ছিল খাঁচা ছাড়া, যাত্রা দলে জুড়ির গান গেয়ে গেয়ে একেবারে চাঁচা-ছোলা। লোকে বলতো—ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভাবি।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এক জায়গায় এসে তো থামতেই হয়। হয়তো পরদিন সকালেই থলি গোছগাছ সারা, বাড়তি পাওনা কাপড়খানা পাট করা শেষ আর উপরি পাওনা হাঁড়িতে নাতি-পুতির জন্যে মিষ্টি কিংবা ছোট ভাঁড়ে খানিকটা ভিযেনের কড়া চাঁচা চিনিব বস। ছেলেপুলেরা ক'দিন রুটি দিয়ে সোনা মুখ করে খাবে। এগুলি ঘরে পৌঁছে দিয়ে আর দাঁড়ানো চলবে না। গিয়ে দাঁড়াতে হবে বীরপাড়ার সান্যাল বাড়িতে। পূর্ণ জেনে গেছে আগে থাকতেই কদিন আগে সান্যালকর্তা মারা গেছেন। সে গিয়ে দাঁড়ালে চারপাশ থেকে শোকের হাত থেকে জাপটে ধরবে আষ্টেপৃষ্টে। সেও বাড়িয়ে দেবে দুই হাত, যতোখানি সামর্থ তার চেয়ে অধিক হাতের বেড় দিয়ে মানুষের দুঃখ আড়াল করবার চেষ্টা করবে। আবার সেই কথাই ঘুরে ফিরে মনে হয়। সত্যি এই জন্যেই তো পৃথিবীতে আসা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি কর্মের ডোর গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়। কেবল কাজে জুতে পড়তে যতক্ষণ। কি যে আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে চলেছে অনবরত তা ভাববারও সময় মেলে না। আনন্দের আসর থেকে দুঃখের আঙিনায়, বাসরঘর থেকে শ্মশানভূমি—এই রকমই হয়ে চলেছে জীবনভর। এ বেলা নতুন বউয়ের হাসি দেখে এলাম, ও-বেলা দেখতে হল সদ্য বিধবার মাথা কোটা। জোড়-বেনারসীর পরব সরিয়ে রেখে কাছা-থানের যোগাড়-যন্ত্র। সত্যি,

জীবনটাই যে এমনি।

যে বাড়ি যাই সে বাড়ি আমার—সত্যি হলেও এর পাশাপাশি একটি বেঁকা স্বভাবও আছে। আর সেই স্বভাবের কারণেই হয়তো অনেকজনকে নিয়ে এই মস্ত সংসার। কোথাও এক জায়গায় আটক থাকার উপায় নেই। কোথাও বন্দী হয়ে পড়ার মতন মন নেই। এ বদনাম শুধু বাইরে নয় ঘরেও রটে। নাতি হারাধন সুযোগ পেলে ছেড়ে কথা কয় না। বলে, তুমি হলে উড়ো পাখি। এই আছো আবার এই নেই।

এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামতেই পিছনকার সব কিছু অন্ধকার। তখন আর মনে থাকে না গত কয়দিন এ-বাড়িতে কেমন সুখে কাটলো। সুখের মধ্যে কোথাও বা একটু ব্যাজারও ছিল। কেউ আদর করলো আবার কেউ বা খোঁটাও দিল। সেসব কিছুই চৌকাঠ পার হলে ঝাপসা হয়ে যায়। পথে নামলে মাথার ওপরকার ঐ আকাশের মতনই সব একাকার। পিছনটা মনে থাকে না। তখন কেবল সামনে এগিয়ে চলবার তাড়না। আরো কতো মানুষ অপেক্ষা করে বসে আছে। কিংবা হয়তো কেউ অপেক্ষা করেও নেই, তাদের করবার অনেক মানুষ আছে। তবুও যেতে হবে।

মাঝে মাঝে সেজো পুতিটা থলির কানা টেনে ধরে—ও বড়মা, যেও না।

পুতির মাথায় হাত রাখে পূর্ণ—না মানিক। অমন করতে নেই। তোমার জন্যে মিষ্টি আনবো।

না তুমি যাবে না। আমি রাত্তিরে কাঁদবো।

—ধন আমার, মানিক আমার।

হারাধন ছেলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকে ওঠে—যেতে দে যেতে দে। উড়ো পাখি উড়ে যাক।

পথে পা রেখে আর পুতিটার কান্নার কথা মনে থাকে না। কি করে থাকবে। তখন পথটাই যে সব হয়ে যায়।

অচিন বন অচিন বন হাওয়া ফুরফুর
এ বন ছেড়ে আর না যাব আর যাব না দূর।

উকিলমা তো সেদিন [illegible] আগে ভাল করে চোখ ফোটার আগেকার কথাও [illegible] মনে পড়ে। উকিলমা বলতেন মানুষের চোখ ফোটে দুবার। একবার [illegible] গর্ভে আর একবার [illegible] বুদ্ধি হলে। এ হল সেই দুই নম্বর চোখ ফোটার কথা। আবছা আবছা, [illegible] মাঠে শীতের সকালবেলাকার

কুয়াশার ধন্ধের মতন। জীবনের কাঁটাঝোপ মাঠ ময়দান ভেঙে চলতে চলতে, আগুনে জলে পড়তে নামতে ঐ দ্বিতীয় চোখ ফোটে। তার ওপর যদি উকিলমার মতন সলতে দেবার মানুষ থাকেন তো কথাই নেই। আস্তে আস্তে একজোড়া ড্যাবডেবে নয়ন তৈরি হয়। মায়ের পেটের অন্দরের অন্ধকারে যে চোখ ফোটে সে দৃষ্টিতে সব যেন কেমন অথৈ। কোথা দিয়ে শুরু হয় আর কোথায় যে থামে। তবুও ঐ আঁধারে বাস করে, দশ মাস দশদিন ধরে কুকুর কুণ্ডুলী হয়ে থাকতে থাকতে চোখ সয়ে যায়। তখন আর অন্ধকারকে কুটুম্ব মনে হয় না। সে সময় কেবল একটিই প্রার্থনা অনবরত মনে ঘোঁট পাকায়। মনে মনে বলে—হে বিধাতা পুরুষ, একটিবার আমায় বাইবে নিয়ে যাও, একটিবার আমাকে জগতের আলো দেখাও। তোমার কথা আমি একদিনের তরেও ভুলবো না। যতোদিন তোমাব আলোতে খেলে বেড়াবো ততদিন তোমায় মনে রাখবো। মনে মনে বলবো তোমার কাছে আমার ধারের শেষ নেই গো।

কিন্তু যেই না মায়ের পেট থেকে খসে পড়া অমনি সব বেভুল। ট্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ কান্না। আসলে ও কান্না না, আলো দেখামাত্র সব কড়ার ভুলে বলে ওঠা—আর না আর না। এক নিমেষে সমস্ত অন্ধকারের কথা, হেঁট মস্তক ঊর্ধ্বপদে সাধনার কথা—ভুল হয়ে যায়। মনে পড়ে না কাল কি ছিল। মনে পড়ে না সেই কুটুম্ব ভুলে জোর করে আপন করে নেওয়া অন্ধকারের চেহারা। মনে থাকলে কি হতো। মনে থাকলে কি এই মানব জনম এমন করে পাঁচমেশালী আটভাজার মতন ভাজা ভাজা হত। মনে থাকলে কি এমনভাবে সারা জীবন বেঁচে থাকবার রঙ্গটুকু নিয়েই মজে থাকতে হতো। এইভাবে চলি ফিরি কিন্তু একবারও মরণের কথা মনে পড়ে না। হ্যাঁ, মুখে বলি বৈকি আর যে সয় না। কিন্তু ঐ মুখের কথা মুখেই থাকে, মনে নামে না। আজ এই বাস্তু গেড়ে বসে মুখের কথা মনের দোরে এসে কড়া নাড়ল, মায়ের সেই কথার সুতোব টানে পড়ে। মনে হল এবার বুঝি নিশ্চিন্তে যাবার সময় হল, আর কোনো ভাবনা নেই। আসলে মরণ কখনো মানুষের দিকে এগিয়ে আসে না' মানুষই তার দিকে আগ বাড়িয়ে ধেয়ে যায়। কিন্তু যেতে যেতে জানতেও পারে না কোথায় যাচ্ছে সে। ঐ যে সেই কথায় বলে না—জল কখনো এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়।

এগারো বছরে বিয়ে। পনেরো ছেড়ে ষোলয় পা দিয়ে বিধবা, কোলে দুইমাসের মেয়ে—বাপখাগী আবাগী, নাম অন্নপূর্ণা। আবার সেই মেয়েও চলে গেল ঠিক কুড়ি বছরের মাথায় দ্বিতীয়বার বিয়োতে গিয়ে। পূর্ণ কোলে তুলে নিল তার রেখে যাওয়া সবে ধন নুড়ি মাত্র দুই বছরের ছেলে ঐ হারাধনকে, মা হারানো ধন, পাপের যন্ত্রণা। সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়ানোর অভিমান, জাত

ব্যবসার হেনস্তাকারী—অলপ্পেয়ে। ঘরে ধামাভরা ক্ষুর রয়েছে কিন্তু পরামাণিকটি অকর্মা। দাড়ি চুল কাটার চেয়ে অপমান আর কিছুতে নেই বলে চট কলে ওঠ বোস কাজ। আজ কাজ তো কাল নিকাজ। আজ পেটে ভাত তো কাল পেটে হাত। তবুও যজমানিতে যাবে না। তাহলেও এরই মধ্যে অনেক বলে কয়ে বিয়ে পৈতে বা শ্রাদ্ধ বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু একলা কোথাও যাবে না। যাবে কি করে, মুরোদের নামে তো ও কম্মো। কাজ জানলে তো করবে। বিদ্যে রপ্ত থাকলে তো ঝাড়বে। গুণ নেই গুণীন আছে। তাই পূর্ণকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয় পুরোহিতের তন্ত্রধারকের মতন। পিছন থেকে নাতিকে ছুঁয়ে থাকতে হয়, শোলোক ধরিয়ে দিতে হয়। এর পরে এটা কর, সেটা কর, বলে দিতে হয়। যেখানে নাতি সেখানে বুড়ি। জেলের পোঁদে কেলে হাঁড়ি।

আঁতুড় ঘরে ছয়দিনের দিন সেই রাতটি বড়ো অদ্ভুত। পূর্ণশশীর ফাগুন মাসে জন্ম। পয়লা তারিখে—যেদিন কিনা ফাগুন কোনা ব্রত আরম্ভ করেন পুণ্যবতী ভাগ্যবতী।

কে জানে সেই দিনটিতে কেউ পূর্ণর জন্যে ফাগুন কোনার তিন কূল উপছে উঠবার প্রার্থনা তুলে রেখেছিল কিনা। নিশ্চয় না। তাহলে কি জীবন এমন হতো?

আঁতুড়ঘরের ছয়দিনের দিন সেই গা ছম্ ছম্ পাতা সর সর রাতে বিধাতা পুরুষ এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বাইরে তখন হাওয়া দিক পালটে দখিনে বইছে। চারধার ম ম করছে সজিনা ফুল আর পাকা কুলেব বাসে। এখনো শিশির ঝরছে আমের বোলের মুখে। বোলের মুখ আর কয়দিন পরে ফাটবে, গুটি ধরবে। হিমের ভারে পাখনা ভারি আমপোকারা এখনো উড়তে শেখেনি। এই সব কিছুর মাঝখানে তুমুল হাওয়া ঠেলে তিনি এসে থামলেন পোয়াতির দরোজায়। চোখ তুলে দেখলেন চারপাশ তারপর হাওয়ায় উড়ুক্কু ঢোলা জোব্বাখানি সামলে ধরে আস্তে আস্তে চৌকাঠ ডিঙোলেন। শিশুর মা তখন ঘুমে চেতন নেই। শিশুও দ্যায়লা করছে। তার মাথার কাছে রাখা আছে লালকালি ভরা দোয়াত, কলম, একটি তালপাতা আর একটি টাকা। শিয়রে প্রদীপ জ্বলছে। শিখাটি কাঁপছে তির তির আর বিধাতা পুরুষের ঘরজোড়া ছায়াটিও কাঁপছে। হেঁট হন তিনি। দোয়াতে কলম ডোবান তারপর শিশুর কাছে গিয়ে তার দিকে পিছন করে বসেন। প্রদীপ ঢাকা পড়ে তাঁর মস্ত আড়ালে। ঐ পিছন ফিরে বসেই বিধাতা পুরুষ তার কপালে যা লিখবার লিখে ফেলেন একটানে, শেষকালে খস্ খস্ দস্তখত। আর দাঁড়ান না। একবার ফিরেও দেখেন না কপাল লিখন। তিনি চলে যাওয়ামাত্র দমকা হাওয়ায় প্রদীপটি নিভে যায় আর

শিশু ককিয়ে ওঠে। কেননা কারোর লিখনই তার মনের মতন হয় না।

মায়ের কাছে শুনেছে পূর্ণ বাবা প্রাণকৃষ্ণের সাধ ছিল বড়ো যাত্রা অভিনেতা হয়। জাতব্যবসা পরামাণিকগিরির পাশাপাশি প্রাণকৃষ্ণ প্রসন্ন হালদারের দলে যাত্রা করতো। যতো দিন যায় ততই ঐ যাত্রাপালায় বেশী করে টান পড়ে। ফলে হয়কি নিজের ধর্ম ব্যবসার মুলে ছাই পড়ে, কাজে ভাঁটা পড়ে যায়। একদিন ঘরে ফেরে তো সাতদিন বাইরে। আজ এ গ্রাম, কাল সে শহর—এমনি করে প্রাণকৃষ্ণ নেচে বেড়াতে লাগল দেশ-দেশান্তরে। মায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কম। কালেভদ্রে চার চোখের চাউনি এক হয়। ঘরের টান মজে গিয়ে বাইরে নতুন খাল কাটা হল। পরামাণিকের পো নরুণ ফেলে নাচ ধরল। আর তাইতে বুঝি হল কাল। চিরটা কাল জুড়িব গান গেয়েই কাটাতে হল। কোনদিন আর বড়োসড়ো দূরের কথা মাঝারি পার্ট বলবারও সুযোগ এল না। পূর্ণর মনে আছে বাবা যেদিন বাড়ি আসতো সেদিন বাতেই কচি মেয়ের গলায় সব নতুন গান তুলে দিত। বাপ হারমোনিয়াম পেড়ে বসতো, মেয়ে গলা মেলাত—দেখবো যদি রাখতে পারি গোপনে, অধরে আদর হেবে করবে আদর যতনে…। সেই বাবা যখন চোখ মুদলেন পূর্ণর তখন নয় বছব বয়স। মা বলতো ধর্মকর্মের অভিশাপ নেমেছে বলে বাবা যাত্রায় পার্ট পেল না কোনকালে। ঐ জুড়ি গেয়েই জীবন গেল। পূর্ণ ভাবে বিধাতা পুরুষেব লিখন খণ্ডাবার নয়। যা লিখিতং তাই ফলিতং।

পূর্ণব কেবল মাত্র মনে পড়ে একবাত্রির পালাগানের কথা। বাবার যাত্রা করাব স্মৃতি বলতে ঐটুকু ভেতবে জ্বল জ্বল করছে। আর সব কিছু আশ পাশ মোছা। জমিদারবাড়িব নাটদালানের সামনে উঠোনে বসেছিল যাত্রার আসর। সন্ধ্যা ঘনাঘন সেও গিয়েছিল পড়শী মেয়ে বউদের সঙ্গে। মাঝখানে চারচৌকো মঞ্চে সতরঞ্চি বিছানো। চাবধাবে কেবল মানুষ আর মানুষ। যেদিকে মেয়েরা বসেছে তার ঠিক পিছনে সাজঘব। দরোজায় চটেব পর্দা আড়াল করা। তার ভেতবেই সাজগোজ চলছে। মাঝে মাঝেই একজন মোটাসোটা বাবরি চুলো লোক এসে মঞ্চে দাঁড়াচ্ছে। এদিক সেদিক দেখছে আব মুখে এমন ভাব কবছে—সব ঠিক আছে তো। একটু পবে দোহার আর বাজনদাররা এসে বসল মঞ্চের দুই পাশে। প্যাঁ পোঁ করে বাজনায ফুঁ মাবে. হাবমোনিযামে নাক ঘসে সুর বার করে আবাব কেউ বা হঠাৎ কবে গদাম্ গুম করে তবলে কিল বসায়। একজন লোক এসে মঞ্চেব একপাশে একটি বড়োসড়ো মাটির হাঁড়ি বাখল, তাতে ছাই বোঝাই। সকলে হৈ হৈ কবে উঠল। এবারে একটি চেয়াব এনে রাখা হল মঞ্চে। হৈ হৈ হল আবাব। এই ফাঁকে পূর্ণ গুটি গুটি উঠে গেল সাজঘরেব সামনে। এদিক ওদিক

তাকিয়ে চট সরিয়ে দেখলো ভেতরে যাকে বলে সব রঙবেরঙের ব্যাপার। কেউ যেন মানুষ না। রাজা, রানী. পেয়াদা, দেবতা—সব মিলে যেন স্বপ্নের মতন। কিন্তু বাবা কোথায়, বাবা ? ইতিউতি দেখে পূর্ণ। খোঁজে বাবাকে। একজন বলে ওঠে—অ্যাই খুকি, কি হচ্ছে ?

পূর্ণ বলে—বাবা কোথায় ?

—বাবা !

লোকটার অবাক হওয়ার ফাঁকে পূর্ণ দেখতে পেল একপাশে একটি ইটের ওপর বসে আছে বাবা, হাতে একখানা খাতা। সেইটি একমনে পড়ছে আর মাঝে মাঝে শূন্যে হাত তুলে কেমন সব ভঙ্গী করছে। পূর্ণ আর থাকতে না পেরে ডেকে ওঠে—বাবা, ও বাবা।

প্রাণকৃষ্ণ একবারের জন্যে খাতা থেকে মুখ তুলে তাকায়। মুখের ভাব এমন যেন অচেনা কেউ ডাক দিয়েছে। সামান্য ভ্রূও কোঁচকায়। তারপর আবার মুখ নামিয়ে নেয়। সেই লোকটি এবার ধমকে ওঠে—অ্যাই, যাও। এখান থেকে যাও।

চোখে জল এসে গেল অমনি। আস্তে আস্তে আবার আসরে এসে বস্‌ল পূর্ণ। মনে বড়ো ব্যথা আর অভিমান। আর এক মুহূর্তও এখানে বসতে ইচ্ছে করছে না। বাবা যেন কোন মগডালের মানুষ। আর পাঁচজন যাত্রাদলের লোকের মতন অহংকারী, নাক উঁচু। রাজারাজড়ার দেশের মানুষ যারা নাকি মানুষের সঙ্গে কথা কয় না। মানুষের কাছে আসে না। সকলে দূর থেকে তাদের কথা শোনে, গান শোনে আর কাঁদে হাসে। বসে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে পূর্ণর অমনি মার জন্যে কষ্ট হয়। কেন হয় তা কিন্তু বুঝতে পারে না। হঠাৎ ঝম্‌ করে শব্দ। করনেট বাঁশীর সঙ্গে ফ্লুট, বেহালা আর হারমোনিয়াম বেজে ওঠে, আসর শুদ্ধু মানুষ নড়ে বসে আর ঠিক তখনি চণ্ডীমণ্ডপের ওপর পাতা তক্তপোশে তাকিয়া হেলান দিয়ে এসে বসেন জমিদার চৌধুরী মশাই। সেই মোটাপানা লোকটি এসে জমিদারবাবুর কাছে অনুমতি চাইল। যাত্রা শুরু হয়ে গেল। পালার নাম সাবিত্রী-সত্যবান।

সেই বাবা প্রাণকৃষ্ণ একদিন রাত না পোহাতে নিজের জীবন পুইয়ে ফেলল। কি ব্যামো হয়েছিল পূর্ণর মনে নেই। কেবল এই পর্যন্ত মনে আছে সেদিন বাকি রাতটুকু মা মেয়েতে মিলে পরামাণিকের মড়া আগলে বসেছিল। পৌষ মাসের সংক্রান্তির রাত্রি। এই দিন নিজের ঘর ফেলে কোথাও যেতে নেই। সংক্রান্তিতে যাত্রা নেই। প্রাণকৃষ্ণ সেই নিষেধ মানল না। চলে গেল ভরা সংক্রান্তি মাথায় করে। পরদিন পাঁচজন মানুষ বলল মরে গিয়ে পরামাণিক তিনটে দোষ

পেয়েছে। যে যায় তার নাকি তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যারা রয়ে গেল তাদের অমঙ্গল। সে কথা ভাবলে পূর্ণ এখনো অবাক হয়ে যায়। কিছুতেই বুঝে পায় না জন্মদাতার মতন আপজনের দোষ পাওয়ার কারণে কি করে তাদের ক্ষতি হতে পারে। কে জানে, হয়তো মানুষটা স্বপ্নের দেশের ছিল বলেই বরাবরের জন্যে সেখানে চলে গেল। তার আগে বা পিছুতে কারোর জন্যে কোনো টান রেখে যায়নি। যে মানুষের কারো জন্যে কোনো টান থাকে না তার চলে যাওয়াতে কার কি বিঘ্ন হতে পারে। সত্যি ভাবলে বড়ো আশ্চর্য লাগে।

রাত পোহাতে যে আর দেরী নেই তা বেশ টের পাওযা যাচ্ছে। ভারি হাওয়া আস্তে আস্তে পাতলা হল। আমগাছের ডাল-পাতায় পাখিদের ঘব গৃহস্থালীতে উশখুশ, গা ঝাড়, দেয়, আলসেমি ভাঙে। আমতলার আগুন নিবে গেছে। এখন কেবল টকটকে লাল আংবা আর তারই আশপাশ বেয়ে ধোঁয়া। হারাধন গায়ের চাদরটি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। তাকে জাপটে কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে দুই ছেলে। তিন নম্বরটি উঠে এসে এই কাপড়কানিব ঘরে শুয়েছে চাটাইয়ের একপাশে। আমতলায় তাকালে মনে হয় সাবারাত্রি ধবে বুঝি হোম করা হল ওখানে। আগুন জ্বেলে সব ভিজে ন্যাতামনগুলি চাঙ্গা হল। এবার নতুন করে চলতে ফিরতে হবে। চটেব ফাঁক দিয়ে বাইরের আকাশ চোখে পড়ে। রঙ সামান্য ফিকে হযেছে। তাবাগুলি সব ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে আছে। রাতভর পালা গান শুনে যেন সব ক্লান্ত। এখন একটু আড় হতে পাবলে বাঁচা যায়। কি একটা পাখি ঝটাপট ডানা নাড়তে নাড়তে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। এই বুঝি একজন প্রথম জাগল। উকিলমাব কাছে শোনা আছে সেকালে মুনি ঋষিবা ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে তপে বসতেন। এ সময়ে নাকি পৃথিবী হালকা থাকেন তাই মনটিও সহজে তরল হয়ে যায। যা কিছু ভাল চিন্তা এখন করবার সময়। সব কিছু ঝরঝরে ফটফটে।

আব খানিক পরেই তো গা তুলতে হবে। হলই বা কানি চটের ঘব। উঠোনে গোবরছড়া দিতে হবে না। অবিশ্যি এখনো উঠোন বলতে কিছু নেই চারদিকে কাঁটা ঝোপ। তবুও তার মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে। ঐ দিকে একটি তুলসী মঞ্চ আর তার ওপাশে ছোট মাচা করে একটি লাউ গাছ তুলতে হবে। সঙ্গে শিমও দেওয়া যেতে পারে। আর ঐ আমতলায় বাখারি চেঁচে খোঁটা পুঁতে বসবার মতন একটি জায়গা করতে হবে। শীতের দিনে রোদ তাপানো হবে আবার দু-পাঁচজন এলে একটু বসতে দেওয়াও যাবে। তারপর কোনমতে এই ঘরটি খাড়া করতে পারলে দখিন কোণে ছোট একটি রান্নাঘর। পঞ্চায়েত যখন জমি দিল তখন কি আর কিছু বাঁশ দরমার ব্যবস্থা করতে পারবে না। দলের

লোকের জন্যে এ তো সামান্য কাজ। হারাধনকে বলতে হবে একবার পঞ্চায়েতের কাছে দরবার করে দেখতে। মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর উঠবে। সামনে একটু দাওয়া। দাওয়ার উত্তর দিকটি ঘেরা। সেখানে পূর্ণ ঠাকুরের আসন পাতবে। একখানা জলচৌকিতে আলপনা দিয়ে তার ওপর লক্ষ্মীর ঘট ঝাঁপি। লক্ষ্মীর আসনের মাথায় বাঁশের খোঁটায় টাঙানো থাকবে সেই থলিটি যা নাকি মূল লক্ষ্মী। ঐ থলি বয়েই তো চলতে হল এতোকাল। না, আর ঐ পুরনো থলি না, এবার কৃষ্ণরাই-এর রথের মেলা থেকে একটি নতুন কিনতে হবে। কিন্তু এখন যে কিছুই হয়নি। এর মধ্যে মনে মনে এতো ভাবন সাজন করলে কি চলে। সেই—কোন কালে হবে পো:, ন্যাকড়াকানি রেখে থো।

চাটাইতে শুয়ে আছে সেজো পুতি অমরনাথ। সেদিকে তাকিয়ে আর চোখ তুলে নিতে ইচ্ছে করে না। ঘুমে বিভোর বালকের আধবোজা চোখ দুটি দেখলে মনে হয় ওখানে এখন ঘুমের চেয়ে স্বপ্নই বেশী। ছেলে পড়ে আছে ছেঁড়া চাটাইয়ে বলতে গেলে আকাট আকাশের নিচে। কিন্তু হয়তো স্বপন দেখছে রাজারাজড়ার মতন।

তা না হয় হল, কিন্তু পূর্ণ নিজে দেখছে কি। সারাটি রাত্রি মনে মনে কেবল, সেই তুলোর পাহাড় পিঁজে চলেছে। আকাশ-পাতাল ভাবনা নয় এ যে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। নেড়ে চেড়ে দেখতে কি ভালই না লাগে। এ তো মন না এ যেন এক অজাগর বন। যতো ভিতরে সেঁধোও ততই অফুরান। শেষ নেই, কেবল একটি যেমন তেমন শুরু আছে। না না, মরে গেলেও বাপু এ বন ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। এর মধ্যে একবার ঢুকলে পথ তো হারাবেই। এ যেন যেচে পথ হারাবার ফিকিরে পড়া। নেশার মতন ঘোর লাগে, বনের ভিতর দিয়ে বহে যাওয়া একানে ছোট নদীটির ছল ছলাৎ শব্দ বড়ো আনন্দের। এ আমোদে চিৎকার নেই হুল্লোড় নেই। কেমন শান্ত, বিকেলের জুড়িয়ে আসা চাপা আলোর মতন।

ভোরের ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে সেই রূপকথার ছোট পরীর কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে-সেই শাল পিয়াল চন্দন বন, যার মাঝখানে কাকচক্ষু সরোবর। তাতে থৈ থৈ ফুটে আছে পদ্ম। পরীর দল এসে নামল সেই বনে সরোবরের পাশে। তখন হাওয়া হয় ফুর ফুর, গাছের পাতা-পত্রে সোঁ সোঁ শিরশিরানি। বাতাসে ম ম করছে পদ্মগন্ধ, সরোবরের জলে পদ্মমধু মিশে আছে। পরীরা এ সবই দেখলো নয়ন ভরে, ঘ্রাণ নিল বাতাসের বুক ভরে, তারপর—। ছোট সেই পরী কিন্তু আর রইতে পারে না। সে ডানা মেলে গিয়ে নামে সরোবরের জলে। আহা কি আনন্দ, কি আমোদ। জলে ডানার বাড়ি মেরে সাঁতার দেয় মেয়ে, ডুব

দিয়ে ওঠে একরাশ পদ্মের পাপড়ি মাথায় করে, হেসেখেলে জলে ঝাঁপাই ঝুড়ে একসা করে। তার সেই জলছলাৎ হাসিতে গোটা বন খিলখিলিয়ে ওঠে। চাঁপা বলে—আহা মরে যাই। চন্দন বলে, এই তো বেশ। পারুল বলে—কি সুন্দর, কি সুন্দর। ছোট পরী মেয়ে সরোবরে মজে। পাড়ে বসা আর পরীর দল বলে—ওঠ্‌লা ছুঁড়ি। বলি ফিরে যেতে হবে না কি ? সেই ছোট মেয়ে মুখ তুলে তাকালো একবার, তারপর সাঁতার কাটতে কাটতে বলল—এ বন ছেড়ে আর যাবো না ভাই—পরীরা অবাক। বলে কি মেয়ে। কোথায় সেই সুন্দর মেঘের দেশের প্রাসাদ। চাঁদের আলো, রামধনু—সেই সব ছেড়ে কিনা এই বনবাস। তারা অনেক করে বোঝাল, বলল এ মোহ ক্ষণিকের। সে কিন্তু বুঝল না। যে মন একবার জলে গেছে তা কি আর ফেরে। তখন সেই পরীর দল সরোবরের জলে চোখের জলের মুক্তা ফেলতে ফেলতে মেঘলোকের দিকে উড়ে গেল। রয়ে গেল সেই একলা ছোট পরী বিজন বিভুঁই বনে।

ভোর হল। ওঠো গো সবাই। আমিও উঠি—পাতাল হতে। মুখ তুলি আকাশ পানে। দুই হাত দিয়ে মাথার ওপর থেকে রাশি রাশি পদ্ম পাপড়ি ঝেড়ে ফেলে দিই। পাপড়ি জলে ভাসে কিন্তু ভিজে মাথায পদ্মরেণু লেগে থাকে। অচিন বনে, হাওয়া দেয় ফুর ফুর। এ বন ছেড়ে আমি তো কোথাও যাবো না। যেতে পারবো না। মরে গেলেও না।

পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল।

প্রাণকৃষ্ণ পরামাণিক যেদিন আকাশে ঠাঁই পেল তার তিন দিনের মাথায় পূর্ণশশী তার মা নিভাননীর সঙ্গে এই চৌধুরীবাবুদের বারবাড়ির ঘরে পাকাপাকি আশ্রয় পেল। এতোদিন গ্রাম কাঁচরাপাড়ার এক প্রান্তে দয়াল ঘোষের ভিটের লাগোয়া একটি খোড়ো ঘরে বাস করে এসেছে। চারদিকে বনবাদাড়, জঙ্গল। গ্রামের শেষদিকে যেন জঙ্গলগড় একটি। কেবল ঘোষের বাড়ির পুব পাশে টানা বাগদীপাড়া আছে। ঐ মানুষগুলি ভরসা হলেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ না। কেননা তাদের যাতায়াতের পথ ঐদিক পানে। তাহলেও এতোদিন বাবা ছিল, সময় অসময় হলেও ঘরে আসতো যেতো। এখন যে আর ভরসা করা যায় না এই বিজন বিভুঁইয়ে। তার ওপর ঘোষ কর্তার নজর ভাল না। পরামাণিক বেঁচে থাকতেই মাঝে-মধ্যে গায়ে পড়ে এসে উপকার করতে চাইত, মা'র সঙ্গে গোপনে কথা বলবার সুযোগ খুঁজতো। সে খবর জমিদারবাবুর কানে কে তুলেছিল জানা নেই তবে তিনি নিশ্চয় একথা জানতেন যে বউ-মরা দয়াল

ঘোষের মেয়ে মানুষের দোষ আছে। বাড়ির পাশে ওপাড়ায় তার একটি বাঁধা মেয়েমানুষ আছে। কিন্তু ঐ এক ফুলে ভ্রমরা মজে না। তার নজর চারদিকে। ঘোষ যেচে ঐ ভিটেটুকু নিভাননীকে 'চাকরাণ' সম্পত্তি হিসাবে লিখে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল—আমার অনেক আছে আবার কিছু নেই। যে বেটাছেলের রমণী নেই তার যে জীবনটাই বৃথা। তাই আমার ঐ অনেকের থেকে একফোঁটা তোমাকে দিলে বরং আমি শান্তি পাবো। প্রাণকেষ্ট আমার যজমানি করলে কি হবে সে তো আমার বন্ধু ছিল।

নিভাননী এসব কথা শুনেও শোনেনি। কারণ যে রাতে পরামাণিক স্বর্গে গেল তার পরদিন রাতেই বিধবার দরোজায় টোকা পড়েছিল। নিভাননী চমকে উঠেছিল—কে, কে ওখানে?

বাইরে থেকে চাপা গলার আওয়াজ এসেছিল—আমি।

—আমি তো আমিও। বলি নাম কি মুখপোড়ার?

—আস্তে। আমি দয়াল। দোর খোল ননী।

নিভাননী গর্জে উঠেছিল।—দিনের দিন আসবেন। রাতে কি কাজ?

তারপরদিনও ঘোষের বাচ্চা আবার জ্বালাতে এসেছিল।' এদিন আব. দরোজায় টোকা নয় বাঁদরের ছা ঘরের চালে উঠে বসেছিল। নিভাননী ঘুম চমকে দেখতে পেয়েছিল মাথার খড় আস্তে আস্তে হাঁচড় পাঁচড় করে সরছে। সে শব্দে পূর্ণর ঘুমও চটে গিয়েছিল। সে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে—ওমা চোর চোর।

নিভাননীও চিৎকার করে উঠেছিল—ওগো কে কোথায় আছো বাঁচাও বাঁচাও।

সে চিৎকারে ব্যাগদীপাড়ায় শোর পড়েছিল। অন্ধকার বাদাড় পেরিয়ে অনেকগুলি লণ্ঠন ছুটে এসেছিল নিভাননীর ঘরের সামনে। অনেক হাতের চাপড় পড়েছিল দরোজায়—খোল, খোল।

মানুষের ডাকে দরজা খুলে দিয়েছিল সদ্য বিধবা। মার আঁচল কামড়ে পিছনে পূর্ণ দেখেছিল তাদের কুঁড়ের সামনে গোটা বাগদীপাড়া ভেঙে পড়েছে। লণ্ঠনের আলোয় মানুষগুলির কালো কুলো শরীর চকচক করছে, চোখ জ্বলছে। সকলের এক প্রশ্ন—কি হল দিদি?

মা মাথা নিচু করে একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—না, এমনি ভয় পেয়েছিলাম।

ওদের মধ্যে একজন মোড়ল গোছের মানুষ বলে—ভয় পাওয়ারই তো কথা। পরামাণিক দাদা যে দোষ পেয়েছে।

আর একজন বলে—তেনার কুবাতাস এসে তোমায় ডরাচ্ছে গো। তোমার মন্দ করতে চাইছে।

নিভাননী ছেলেমানুষের মতন ককিয়ে কেঁদে ওঠে—না না। বোল না, অমন করে বোল না।

পূর্ণরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। মায়ের চোখের জলের ছোঁয়াচে মেয়ের চোখ ভেসে গিয়েছিল। বাবা কি মরে ভূত হয়ে তাদের মন্দ করবে! মরে গেলে মানুষ কু-বাতাস হয়! আপনার জনেরও মন্দ করে! কিন্তু যে এসেছিল সে তো জিয়ন্ত ভূত। সে কথা তো ওরা জানে না।

ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই মেয়ে মতি। দয়াল ঘোষের বাঁধা মেয়েছেলে। নিভাননীর হাত ধরে বলেছিল—ভয় নেই দিদি। আমি তোমার সঙ্গে রেতে শোব। আমি থাকলে আর কোনো অপদেবতা আসবেনিকো।

মনে আছে, মাঝখানে পূর্ণ আর দুই পাশে দুইজন—মা আর মতিমাসী। মায়েতে মাসীতে মিলে মেয়েকে হাত দিয়ে বেড় দিয়ে রেখেছে। মাও ফোঁপাচ্ছে আর মাসীও। আজ সেই রাতটির কথা মনে পড়লে আনন্দে চোখ চলকে ওঠে। বুকের ভিতরে কেমন করে। মেয়েমানুষের দেহ নষ্ট হলেই সে নষ্ট হয়ে যায় না। মনটি তোলা থাকলেই হল। গঙ্গা দিয়ে তো কতো মড়াই ভেসে যায়। তা বলে কি মা গঙ্গা নষ্ট অপবিত্র হন। মতিমাসীর মনটিও ছিল ঐ গঙ্গাজলের মতন।

পরদিন সকালেই জমিদার মা-মেয়েকে তলব করেছিলেন। ডেকে বলেছিলেন—যতোদিন না তোমার নিজের সামর্থ্য হয় ততদিন তোমরা আমার বারবাড়ির উত্তর ঘরে থাকবে।

নিভাননী চুপ করে ছিল। জমিদার আবার বলেছিলেন তুমি যেমন আমার প্রজা তেমনি আমিও তো তোমার যজমান নিভাননী। না না, তোমাকে এমনি রাখবো না। কেষ্টরাই মন্দিরে আমার পালা সেবার সময় তোমরা মা মেয়ে মিলে কাজ করবে, প্রসাদ পাবে।

সেদিন রাতে রাজআশ্রয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি সদ্য বিধবা আর তার নয় বছরের অন্ধের নড়ি। মনে দুঃখ থাকলে কি আর ঘুম আসে। কেননা—নিদ্রা সুখের সহচরী, দুঃখের কেউ নয়। পরদিন ভোরবেলা বিছানায় শুয়েই পূর্ণ শুনেছিল মন্দিরে বিগ্রহের প্রাতস্নানের ঘণ্টা বাজছে। সেইদিন দ্বিতীয়বার বাবার জন্যে মনটা হু হু করে উঠেছিল। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল উদাস গঙ্গার আঘাটা। জলের কিনারে কাঠের শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে প্রাণকৃষ্ণ পরামাণিক। হাঁ-করা মুখের গোড়ায় পিণ্ড লেগে আছে। দিগম্বর কাঠি দেহটি আড়াল করে আছে ওড়ন পাড়নের দুই টুকরো বস্ত্র। এতো বড়ো

মানুষটাকে কেমন ছেলেমানুষের মতন লাগছে। হাঁ-করা মুখে যেন মাই গুঁজে দিলে বেশ হয়। মেয়েকে মা বলত পরামাণিক। বলত—তোর কোলে শুয়ে মাই খাবো মা। সে মুখে দুই হাতে জ্বলন্ত পাটকাঠির গোছা ছোঁয়াতে হল, পিছনে ধরে রইল মুড়িপোড়া বামুন। মুখটা আগুন ছোঁয়াতেই কেমন নীল হয়ে গেল। আগুনে কি বিষ আছে? একটু পরে পুড়ে কালো কাঠকয়লার তৈরি একটা পুতুলের মুখ হয়ে গেল।

জমিদার বাড়ির বারমহলে একপেশে ঘরের মেঝেতে শুয়ে প্রথম ভোরেই মনটা হু হু করে উঠেছিল। মা মেয়ের চোখে জল দেখে কি আন্দাজ করেছিল কে জানে। মেয়ের হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে বলে—সকাল বেলা কাঁদতে নেই মা। এই তো সবে শুরু। এখন যে গোটা জীবন পড়ে আছে।

পূর্ণ কথা বলে না। উঠে বসে দেখে বন্ধ দরোজার নিচ দিয়ে রোদ এসে সেঁধিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। ঘরখানা মোটামুটি বড়ো। অনেকদিন ঝাঁটপাট না পড়ায় ধুলো জমেছে এখানে সেখানে। কড়িকাঠ বেয়ে মাকড়সার জাল নেমেছে। চার দেওয়ালে দুটি করে আটখানি কুলুঙ্গী, প্রতিটির মাথায় ফুলকাটা কল্কার কাজ : রঙ চটে গেছে অনেক জায়গায়। উত্তর দক্ষিণে দুটি জানালা। চওড়া দেয়ালে নোনা ধরে ঘাম তেল গড়াচ্ছে। এতো বড়ো ঘরের একপাশে একটি টিনের তোরঙ্গ, কিছু কৌটো, বঁটি, শিলনোড়া, সামান্য দুই একটি পোঁটলা আর একপাশে রাখা লক্ষ্মীর আসন—এ সমস্তই বড়ো বেমানান লাগে। তারওপর মানুষ দুটিও ছোটখাটো।

সেইদিন সকালেই জাগুলি থেকে পূর্ণর কাকা রামকৃষ্ণ এসে পড়েছিল। জমিদারের গোমস্তা জাগুলি গিয়েছিল তলব তাগাদায়। সেই দাদার মৃত্যুর সংবাদ রামকৃষ্ণকে পৌঁছে দিয়েছে। রামকৃষ্ণ এখানে আসবার পথে কাঁপা গ্রামে একটিমাত্র বোন বিদ্যাধরীকে সমাচার দিয়ে এসেছে। তারাও সব এসে পড়বে দু একদিনের মধ্যে।

দুপুরবেলা পূর্ণ পায়ে পায়ে জমিদার বাড়ির খিড়কি দরোজা দিয়ে বাগানে চলে এল। বাগানে পা দিতে চোখ যায় পুব-দক্ষিণ কোণে মন্দির চূড়া। লোহার তৈরি কয়েকটি পতাকা যেন দমকা বাতাসে সোজা হয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটি চক্র। ঠিক তার মাথায় একটি কাক বসে আছে। কাকটা এদিক সেদিক তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে হাঁ করে ডেকে উঠছে। নিরিবিলি দুপুরে ঐ কাকটিই কেবল চিৎকার করছে, আর সব চুপ। সামনে একটু তফাতে টলটলে জলের পুকুর। ঘাটের সিঁড়ির নুনছাল চটে গেছে। ঠিক তার ওপরে একটুখানি চাতাল। দুইপাশে বসবার জন্যে বাঁধানো আসন। আর তারই একটির মাথা ঘিরে

মাধবীলতা আর জুঁইফুলের ঝাড়। শুকনো ফুল পাতা পড়ে আছে ঐ ছায়া ছায়া চাতালে। শীতের বেলা ওখানে বসতে আরাম না লাগলেও পূর্ণর মনে মনে দুদণ্ড বসতে ইচ্ছে করে ফুল লতার ঝাড়ের নিচে। ঐখানটি বেশ কুঞ্জ মতন।

বাগানের সামনের দিকে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুলবাগান। গন্ধরাজ, শ্বেত টগর, চাঁপা, বেল, কলকে ফুল—এমনি কতো কি। একধারে রয়েছে তুলসীগাছের ঝাড়। ওদিকে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে নীল অপরাজিতার লতা। একটা ফিঙে পাখি নীল ফুলের লতায় বসে দোল খাচ্ছে। ফুলবাগান থেকে চোখ তুললে নজর গিয়ে ঠেকে অনেকদূরে ঐ শেষমাথার নারকেল সুপারি গাছের সারবন্দী পাহারায়। ঐখানে বুঝি বাগানের শেষ সীমানা। তার আগে পুকুরের ওপার থেকেই শুরু হয়েছে নানান জাতের আম কাঁঠাল জাম আরো কতো না গাছের পত্তন। পুকুরের জলে ঝুঁকে এসেছে কুলগাছের ভার। গাছ বোঝাই কুল। এখনো অবিশ্যি খাওয়ার মতন হয়নি।

পায়ে পায়ে পুকুরঘাটে এসে দাঁড়ালো পূর্ণ। একেবারে নিচের সিঁড়িতে নেমে এল। দুপুরবেলাকার শান্ত পুকুর জুড়িয়ে আছে। জলে শুকনো পাতার নৌকায় ভেসে চলেছে এক পাল ফড়িং। মাঝপথে গিয়ে হঠাৎ উড়ে পড়ল ওপরে, পাতার নৌকা অমনি এক পাশে টাল খেয়ে পড়ে। জলেব বুকে জলপোকা আঁকিবুকি খেলছে। শুঁড়তোলা গোদা শামুক ঘাটের ধারে গুঁড়ি মেরে বসে আছে আর মাঝে মাঝে শুঁড় নেড়ে ওপরে ভেসে উঠছে। বাগানের গাছে গাছে নির্জন দুপুরে কিচিরমিচির পাখি ডাকে। দূরে নারকেল গাছের বুকে বসে কাঠঠোকরাটি ঠোঁট বিঁধিয়ে যায় অনবরত। পূর্ণ এইসব দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ জলে ঝপাং শব্দ। জলে কি একটা এসে পড়ল। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সিঁড়ির একেবারে প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে এক মেয়ে। তার চেয়ে সামান্য কিছু বড়োই হবে। ডুরে শাড়ি গাছকোমর করে পরা, নাকে নোলক, দুই হাতে দুটি বালা আর কোমর ছোঁয়া চুল, পূর্ণর দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেলে মেয়ে। তারপর আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। পূর্ণ উঠে দাঁড়ায়। নিচে একধাপ নেমে পূর্ণ আর ওপরে সে। এখানে বসে কি করছো?

পূর্ণ চুপ করে থাকে।

—বোবা কালা নাকি?

—না, মানে—

—যাক্ তাহলে বোবা নয়কো।

পূর্ণ বলে—এমনি। বসে আছি।

—তোমার নাম পূর্ণ নয় ?

পূর্ণ অবাক হয়ে বলে—পূর্ণশশী।

—বাঃ ! আমিও। তবে কিরণশশী।

—আমার নাম জানলে কি করে ?

—জানি। তোমরা তো কাল এয়েছো। এটা তো আমাদের বাড়ি।

পূর্ণ মাথা কাত করে—জমিদার বাড়ি।

—হুঁ। জমিদার আমার বাবা। তোমার তো বাবা মরেছে ?

—সগ্যে গেছে।

পূর্ণ হাত তুলে আকাশে দেখায়। গাছপালার সীমানা পার হয়ে ঐ উঁচুতে তো তার বাবা রয়েছে। ওখানে দেবতাদের দেশ। মা বলে সেখানে নাকি সব সুন্দর, পরিষ্কার ঝকঝকে। আঁস্তাকুড় পাঁদাড় নেই। কোথাও ঝাঁটিপাট দিতে হয না। কেবল মেঘ করে এলে একটু যা ঝক্কি। তখন ঐ ঈশান কোণে শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। ঝড় আসে রে রে করতে করতে। ব্যাস্, অমনি আকাশ ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার। তারপবে বৃষ্টি। আর মেঘ নেই। সেখানে মানুষ পাখির মতন, পরীর মতন। প্রত্যেকের পিঠে একজোড়া করে পাখনা। চাঁদ-সূর্যেব আলোর নিচে তারাদের অলিগলির মাঝখান দিয়ে তারা ভেসে বেড়ায়। গান গায় আর নেচে বেড়ায়। নেই ভাবনা নেই চিন্তা। কিন্তু একটা কথা তো মাকে জিজ্ঞাসা কবা হয়নি। বড়ো ভুল হয়ে গেছে। আজ কদিন হল বাবা যে কিছু খাযনি। কি কবে রয়েছে এতো সময় না খেযে। এই এতো বড়ো থালায় করে মুড়ি গুড় দিযে যে মানুষ জল খেতো সে কিনা এই কদিন না খেয়ে। আকাশে কি খাবার মেলে ? স্বর্গে কি খিদে পায় না ?

কিরণশশী হাত ধরে পূর্ণকে টেনে বসায়। নিজেও বসে পড়ে তাব পাশে। তোমার আর কে আছে গা ?

পূর্ণ তাকায় কিরণের দিকে। বড়ো বড়ো চোখে হাসি নেই তার ভাব এখন ঐ টলটলে পুকুরের মতন যার জলে জলপোকার নাচানাচি আর শুকনো পাতাব নৌকার টাল খেয়ে এলোমেলো ভেসে যাওয়া। কিরণ হাত দিযে পূর্ণর হাতে চাপ দেয়—বলো না।

—মা।

—আর ?

—আর—

পূর্ণ আবার আকাশে দেখে। আর কে আছে। কোথায় আছে। মনে পড়ছে কি। হ্যাঁ, আছে তবে তারা তো কেউ কাছে থাকে না। তারা সব আত্মীয় স্বজন

কুটুম্ব পরিজন। কাকা, কাকীমা, তাদের ছেলেমেয়েরা, পিসী পিসে। পিসতুতো দিদি, তার বর। হুঁ জামাইদাদা। কালো মিশমিশে মানুষ, মাথায় টাক আর মুখে পান। নাম রসরাজ। বড়ো ভালবাসেন পূর্ণকে। কালেভদ্রে যখনি আসেন পূর্ণর জন্যে শাড়ি কিনে আনেন, পুতুল কিনে দেন। কোলে করে কতো আদর করেন।

—আর কে আছে বললে না?

কিরণের ঠেলায় পূর্ণর চমক ভাঙে। একটু হেসে বলে—এখানে কেবল মা।

—আর আমরা বুঝি কেউ না।

তখন এ কথার উত্তর দিতে পারেনি পূর্ণ। পরে-আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছিল সকলেই পর নয়। কেউ কেউ অতি সহজে বড়ো আপনারজন হয়ে যায়। সেখানে জাত-পাত, মান গুমোর সব ছাই। মনের সঙ্গে মনের ভিয়েন কড়া পাকে হলে রস আপনিই মজে গিয়ে গাঢ় হয়। তা না হলে দয়াল ঘোষের মেয়েমানুষ কেন সে রাত্রে এসে অমন করে দাঁড়ায়, কেন বুক দিয়ে বাঁচায় বিপদের দিনে। যে সংসারের কাছে আবর্জনা সেই তো কারো কাছে কানের সোনা—বা তার চেয়েও দামী।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল।

আজ আর হারাধন কাজে বার হয়নি। সকাল হতেই বেরিয়ে গেছে একটা ত্রিপল আর কিছু বাঁশ যোগাড় করতে। এক রাতেই ছেলেপুলের চোদ্দ হাল হয়েছে। কোলেরটা কেবল কাশছে।

সকাল হবার পরে পরেই পূর্ণ এসে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের আলোয় দেখলো নতুন বসতের চেহারা চরিত্র। এ যেন সেই জঙ্গল কেটে তার মাঝখানে বাস করবার ব্যবস্থা। আমতলায় গত রাত্রির ছাইপাঁশ জমে আছে। এদিকে সেদিকে বাঁশের টুকরো বাখারি পড়ে। দাখানা তুলে রাখতে ভুলে গেছে ওরা। দুখানি ইঁটের ফাঁকে পোড়া কাঠ ছাই ঠেলে একটা গুবরে পোকা বাইরে আসছে।

উত্তরদিকে সরু কাঁচা পথ। তার ওপাশে কঞ্চির বেড়া ঘেরা অনেকটা জায়গা। জঙ্গলে বোঝাই। একটি কাঁঠাল আর কিছু কলাগাছ। এইসব পিছনে রেখে ঐদিকে দুটি মেটে ঘর। এটা হল পিছন দিক। অনুমানে বোঝা যায় এ ঘর হালে তৈরি না। ঘরের সামনে খানিক উঠোন আছে। উঠোনের এককোণে একটি বাঁশের খোঁটার সঙ্গে শুকনো লাউয়ের বস টাঙানো আছে। তার সঙ্গে একই যুগলে একগোছা ধুঁধুল শুকিয়ে বাঁধা রয়েছে। খোঁটার মাথায় একটি তিতির উড়ে এসে বসেছে। ওপাশে হাঁস পালবার খুপরি। তার সামনে ছাগল বাঁধা। কার ঘর কে জানে। পড়শি যখন তখন নিশ্চয় আজ বাদে কাল দেখা সাক্ষাৎ হবে। তবে পড়শি যদি বঁড়শি হয় তাহলেই মুশকিল।

পুবদিকে কোনো ঘরবাড়ি নেই। পিটুলি যজ্ঞডুমুর ভেরেণ্ডার বন। আরো পিছনে যে একটি ছোট ডোবা মতন আছে তা ঐ গাছপালার গড়ানে নেমে যাওয়া দেখেই বোঝা যায়। বনের গাছ বেয়ে বুনো লতার ঝাঁক বেড় দিয়ে আছে, শেষ মাথায় আকাশে নেচে উঠেছে সরু সরু ডগাগুলি। হাওয়ায় হেলছে দুলছে। পশ্চিম দক্ষিণেও সেই একই ধারা। গাছগাছাল বোঝাই। কেবল পশ্চিমবাগে একটি প্রকাণ্ড দেবদারু গাছ সটান দাঁড়িয়ে আছে। এ বন মহালে তিনিই মহারাজ।

আমতলায় আধখানা রোদ এসে পড়ছে। সকালে এখানে রোদ নামে না। সূর্য সরলে রোদও সরে দাঁড়াবে। গরমের দিনে ওখানে দুপুর জুড়োতে বেশ লাগবে।

সকালে হারাধন বার হবার আগে পূর্ণ মনে করিয়ে দিয়েছে কয়েক আঁটি খড় যোগাড় করবার কথা। ছেলেপুলেরা শুয়ে বাঁচবে। বড়ো পুতি নীলমণিও নেই। সেও কোথায় বেরিয়ে গেছে। ইসকুলের পড়া আজ একবছর হল বন্ধ। সাত ক্লাস অবধি পড়ে লেখাপড়ায় দাঁড়ি পড়েছে। এখন একটা যেমন তেমন কাজ খুঁজছে। সে কোনো চায়ের দোকান অথবা কোনো মুদির দোকানে হোক না কেন।

নীলমণির পরের দুই পুতি দিনমণি আর অমরনাথ কাঁচাপথে বসে কাঠিকুটি নিয়ে খেলছে। বাদলীকে পিঁড়ি পেতে রোদে বসিয়ে তার সামনে চটে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে কাজলী গেছে পুকুরে।

পূর্ণ পুবের আগাছা ভরা জায়গা বেছে কাঁটানটে আর দুধকচুর পাতা তুলে রেখেছে। চুবড়িতে দু-তিনটি আলু আছে, একটি মুলো আর খানকতক শিম। হঠাৎ চোখে পড়ে ঐ দিকের পিটুলি গাছ বেয়ে একটি বুনো উচ্ছে লতা উঠেছে। হলুদ ফুল ফুটে আছে আর বেশ কয়েকটি উচ্ছে ঝুলছে। দেখে আর আনন্দ ধরে না। বনের ফল তো জলের মতনই। সকলের অধিকার। যে পায় তারই। মনে মনে একটি মিশেল তরকারির পদ ভাবতে ভাবতে পূর্ণ ঝোপ জঙ্গল সামলে পিটুলি গাছটির দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে হঠাৎ কাপড়ে টান। হেঁট হয়ে কাপড়ের কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে চোখে পড়ে বঁইচিগাছ। পাকা ফলে গাছটি ভরে আছে। আবার মনের মধ্যে আনন্দের বাতাস বয়। তাড়াতাড়ি দুটি ফল ছিঁড়ে মুখে দেয়। অমনি মনে হয় মন আর মুখের সোয়াদ পালটে গেল। আহা কতো বঁইচির মালা বদল হয়েছে সইয়ের সঙ্গে। ফুল দিয়ে মালা বদল হয় কেবল পুরুষের সঙ্গে। মেয়েতে মেয়েতে যে বউপাট্টি খেলা সেখানে তো বঁইচির মালাই মূল। ফলের মালা বদল। কি ফল না বুনো ফল। কেমন সোয়াদ, না টক মিষ্টি

পানসে। তাই বুঝি সইয়ের সঙ্গে অমন সম্পর্ক। তেতো কখনোই নয়। একটু আধটু মন কষাকষি হলে বড়োজোর টক বা পানসে। টক পানসে তো আর বরাবরের জন্যে থাকে না। কি করে থাকবে, ঐ মিষ্টির তেজ যে বেশি। তবে হ্যাঁ, ঐ দুই সোয়াদ না থাকলে কি আর মিষ্টির দেমাক থাকতো।

টপাটপ আরো কটা বঁইচি ফল মুখে ফেলে এদিক ওদিক তাকায় পূর্ণ। না কেউ দেখেনি। কেবল ঝোপের মধ্যে থেকে একটা ছাগলছানা নাক বার করে দেখছে। পূর্ণ ফিক করে হেসে ফেলে—আ মর।

আঁচলের খুঁটে কিছু বঁইচি বেঁধে নেয়। বউয়ের মুখে রুচবে ভাল।

গোটা পনেরো উচ্ছে পেড়ে পূর্ণ আবার নিজের সীমানায় এসে পড়ে। কাজলী ভিজে কাপড়ে মাথা ঝাড়ছে। হাতের ঝাঁকুনিতে পাঁজরা কাঁপছে। পূর্ণকে দেখে কাজলী বলে—দিমা, চাট্টি কলমি শাক এনেছি।

—ওমা! কোথায় পেলি?

—পুকুরে। নাইতে গিয়ে।

—তবে আর ভাবনা কি। হাঁড়িতে খুদ চাল মিশিয়ে যা আছে তাতে তিন-চারদিন চলবে। তার ওপর হাতের কাছে এতো ব্যাঞ্জন।

উচ্ছেগুলি মাটিতে ঢেলে দেয় পূর্ণ। কাজলী হাসে। পূর্ণ মুখ টিপে হেসে বলে—আরো আছে। তবে কেবল তোর জন্যে।

—কি দিমা?

—টক পানসে মিষ্টি। রসাল ফল হুঁ।

আমতলা ঝাঁট দিয়ে আর একবার পরিষ্কার করে পূর্ণ। কাজলী বালতিতে জল বয়ে এনেছে। মেজো পুতিকে বলে আমতলার একপাশে একটি গর্ত করানো হয়েছে। পূর্ণ ইঁট পেতে ঐখানে একটি উনুন তৈরি করতে বসেছে। একটু আগে নীলমণি ফিরেছে। সে তার দুই ভাইকে নিয়ে গেছে স্নান করতে। হারাধন এখনো ফেরেনি। একটু দেরী করে ফিরলেই মঙ্গল। নাতির মাথায় জল পড়লে আর দাঁড়াতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাত চাই।

সুধন্য কাঞ্চনপল্লী, শ্যাম তরু তৃণ বল্লী

যে মাটিতে নাড়ি কাটা সেই মাটিতেই আবার ফিরে আসা। এতোকাল বাস করা পরের আশ্রয়ে, কিন্তু নিজের মতন। এখন নিজের আশ্রয়ে নিজের মতন। জমিদারবাবুকে ভরণপোষণের দায় নিতে হয়নি। তিনি নিতে চাইলেও নিভাননী রাজী হত না। মায়ের পেট যদিও সব সময়ের জন্যে খিদেয় নাকাল তবুও

কোনদিন মাথা হেঁট করে পরের দয়া নিয়ে বাঁচতে চায়নি। মায়ের পেটে হাত পড়লে সয় কিন্তু মানে হাত পড়লে সয় না। সব সময়ের জন্যে চোখ পড়ে থাকে মানের দিকে। তবে হ্যাঁ, বিপদে আপদে দরকার পড়লে জমিদারের কৃপা নিয়েছে আর সময় সুযোগ মতন গায়ে গতরে খেটে শোধ করে দিয়েছে।

মাঝখানে মাত্র চারটি বৎসর। পূর্ণশশী মাত্র এই কটি দিনের জন্যে গ্রামছাড়া হয়েছিল। স্বামীর ঘর করতে চাকদহ গমন। তারপর মেয়ে কোলে করে থান পরে আবার এই পুরনো ঘরে ফিরে আসা। সে সময় সে সত্যিই পূর্ণশশী, ষোড়শী। সে সব বিস্তর কথা। পিজতে পিজতে সাত মণ তেল পুড়ে যাবে।

দশ দিন ছেড়ে এগারো দিনের দিন প্রাণকৃষ্ণ পরামাণিকের শ্রাদ্ধশান্তি মিটল। পুরুত ডেকে গঙ্গার আঘাটায় কোনমতে নমো নমো করে সারা হল। এক মাস ধরে অশৌচ পালনের বিধান মানতে পারেনি মা-মেয়ে। এতোখানি সময় যজমানি বন্ধ করে বসে থাকলে অন্ন আসবে কোথা থেকে। এইসব ভাবনাই তোলা ছিল মা নিভাননীর জন্যে।

কাকা রামকৃষ্ণ, পিসী বিদ্যাধরী এসে শ্রাদ্ধের সময় দাঁড়িয়েছে। যেমন তেমন করে দায় তুলে দিয়ে গেছে। কাকা মাকে অনেক করে বলেছিল এখানকার পাট তুলে দিয়ে তার সঙ্গে চলে যেতে। নিদেন পক্ষে পূর্ণ অন্তত থাক। কিন্তু মা মাথা কাত করেনি। শুধু যে স্বামীর ভিটে তাই নয় এ যে নিভাননীর বাপের দেশও বটে। এই মাটিরই বাঁশ চিরে বাখারি করে তারও যে নাড়ি কাটা হয়েছে। এখান থেকে চলে গেলে নাইকুণ্ডলের শুকনো গর্ভে যে আবার ব্যথা মোচড় মারবে, রক্তের মুখ ফুটবে। হলোই বা বুনো দেশ,এ মাটির টান যে এড়াবার যো নেই। বনেই তো মন মজে।

পরের অধীন থাকার মতন গারদবাস আর কিছুতে নেই। তার চেয়ে খাই না খাই আছি ভাল, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।

কাকা ফিরে যাবার সময় মা কেবল বলেছিল—আমার পূণ্যর জন্যে একটি পাত্তর দেখো ঠাকুরপো। একটু জায়গা জমি, ঘর। দু মুঠো অন্নের জন্যে যেন হা-পিত্যেশ করতে না হয়। আমার মত দুঃখের পিছনে দড়ি দিয়ে যেন জীবন না পার করতে হয়।

কাকা বলে—সে তোমায় বলে দিতে হবে না বৌদিদি। তবে মেয়েকে একটু গড়ে পিঠে দিও। বিপদে পড়লে নিজের পেট যেন চালাতে পারে।

সেদিন রাতে শুয়ে মা বলে—মা পূণ্য, এবার যে তোকে কাজ শিখতে হবে।

পূর্ণ বলে—হুঁ মা। গোবর নেদি দিতে পারি, ভাতের মাড় গালতে পারি। তারপরে তোমার গিয়ে উনুন পাড়তে—

মা হাসে—ওরে পাগলী মেয়ে, সে কাজ নয়। পরকালের কাজ। বলি নিজের ধম্মো তো রাখতে হবে নাকি। যজমানি শিখতে হবে না?

—আমি পারবো মা?

—কেন পারবি নে। তুই কি বোকা হাবা মেয়ে। তোর ভেতরে বাপ ঠাকুদ্দার রক্ত আছে না। ওরে মেয়ে নাপিতের হল ষোল চোঙা বুদ্ধি।

ষোল চোঙা বুদ্ধি কি আঠারো চোঙা তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই পূর্ণর। তবে মায়ের একটি কথা বড়ো মনে ধরেছিল। মা বলেছিল এই মাটিতে কেউ পড়ে পড়ে মার খায় না। যেমন তেমন যা হোক ঠিক বেঁচে বর্তে থাকে। এখানকার মানুষের বুদ্ধিও একেবারে সোনার মতন ঝকঝকে। সোনার দেশে সবই কি লোহা কাঠ ফলে।

এই সোনার দেশ কথাটির ভিতরে যে এতো বৃত্তান্ত লুকিয়ে আছে তা তখন জানা ছিল না। পরে বড়ো হয়ে একটু জ্ঞান পেয়ে কেরমে কেরমে সব জানতে পেরেছিল। জানান দেবার মানুষের অভাব ছিল না। মা নিভাননী তো ছিলই আর ছিলেন সেই মা সরস্বতীর মতন জ্ঞানবতী উকিলমা। উকিলমা জানতেন বিদ্যা কখনো একালষেঁড়ে হয় না। সে সব সময় নদীর মতন বহে যায়। আশপাশের মাটিতে পলি ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায়। কতো অনাবাদি পতিত জমির গর্ভে সোনার খনি জেগে ওঠে। কতো আঁদাড়-পাঁদাড় বন-জঙ্গল ফসলে ফুলে থৈ থৈ করে। ঐ উকিলমার বহে যাওয়া জ্ঞানবিদ্যার স্রোত পূর্ণশশীর মতন সামান্য মেয়ের পতিতজমিকে একটু ছুঁয়ে গিয়েছিল। না না, সোনার ফসল বা ফল ফুল কিছুই ধরেনি। কেবল একটি ঘেঁটু ফুল গাছ মাথা তুলেছিল যা না পড়ে দেবসেবায় না লাগে মানব ভোগে। আর সে কারণেই এখনো মাথার ভিতরটা পরিষ্কার আছে, কোনো ঝুল পড়েনি। এখনো চেষ্টা করলে মনসা মঙ্গল কি রামায়ণ-মহাভারত থেকে দু-চারটি পদ হুড়হুড় করে বলে যেতে পারে। কোন কালের কি কথা এখনো মন হাতড়াল্লে টেনে আনতে পারে। আর সবশেষ পাঠ নেওয়া হয়েছিল এই-গ্রামের অঙ্গে কস্তা পেড়ে শাড়ির পাড়ের মতন বহতা গঙ্গা, মাটি, গাছপালা, আকাশ সব কিছু থেকে। সকলেই দিয়েছেন হাত উজোড় করে, কেউ ফিরিয়ে দেয়নি। তাই গ্রামে এখনো কানুনগো জমি মাপতে এলে কিংবা দারোগা ঢুকলে পুরনো কথার জের টেনে আনতে পূর্ণর ডাক পড়ে। কথা শুরুর মুখে ভণিতার মতন সে বলে—আমি কি আজকের মানুষ বাবা।—এ অহংকার না এ হল পড়ে পাওয়া অধিকারের ছটা।

কাঞ্চনপল্লী—সেকালে পাশের গ্রাম কুমারহট্ট—এখনকার হালিশহরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। তখন তো সমস্তটাই নদে জেলা। এখনকার মতন বাগের খালের

এপার চব্বিশ পরগনা আর ওপার নদীয়া জেলা নয়। মুসলমান আমলে এই এলাকার নাম ছিল হাবেলীশহর পরগনা। শোনা যায় এই গ্রামে অনেক কাঞ্চন বা সোনার ব্যবসায়ীর নিবাস ছিল। এই সেদিনও তো এখানকার তৈরি নামকরা নিক্তি বাজারে বিকোত। কলকাতার স্যাকরারাও বলতো কাঁচরাপাড়ার নিক্তির মতন অমনটি আর হয় না। সেই সোনার কারবারিদের লেজ ধরে এই গ্রামের নাম হল কাঞ্চনপল্লী। কেউ কেউ বলে তারও আগে নাকি এই জায়গার নাম ছিল কাঁচড়াগ্রাম। গ্রামের নাম কাঞ্চনপল্লী বা পরে কাঁচরাপাড়া যাই হোক না কেন, মৌজার নাম কৃষ্ণদেববাটি।

এ গ্রামের মাটি বড়ো পবিত্র।

এখানে যে পা রেখেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

মহাপ্রভু নীলাচল থেকে জলপথে প্রথমে এলেন পানিহাটি। সঙ্গে ভক্ত শিষ্য। সেখান থেকে কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীবাস অঙ্গনে। শ্রীবাসের ঘরে দুই-তিনদিন থেকে তিনি পথে নামলেন। কোথায় যাত্রা—না কাঞ্চনপল্লীর সেন শিবানন্দের বাড়ি। কিন্তু মাঝপথে তাঁকে আর একবার থামতে হল। এই কুমারহট্টেই তাঁর গুরুর ঈশ্বরপুরীর পাট। সে সময় ঈশ্বরপুরী আর ইহজগতে নেই। চৈতন্যদেব গুরুর ভিটায় কেঁদে গড়াগড়ি দিলেন আর সেই জায়গার পবিত্র মাটি তুলে নিয়ে নিজের পরনের কাপড়ের প্রান্তে বেঁধে নিলেন। সে এক উৎসবের দিন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিবাস থেকে শিবানন্দের ভবন পর্যন্ত গোটা পথ ভক্ত জগানন্দ মনোরম করে সাজিয়েছিলেন। ফুল লতা পাতার মালা দুলছে, চন্দনরেণু উড়ছে, খোল করতাল বাজছে। চৈতন্যদেব যেদিন শিবানন্দের ভবনে এসেছিলেন সেদিন ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী—অমাবস্যা তিথি। সেন শিবানন্দ ছিলেন এই গ্রামের ধনী মানী মানুষ। মহাপ্রভুর পার্ষদদলের প্রধান। সেদিন কাঞ্চনপল্লীতে ভাবের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সকলে আনন্দে নৃত্য করছে, একে অপরকে আলিঙ্গন করছে। যাকে বলে প্রেমের বান ডেকেছে। এই শিবানন্দের ছেলে পরমানন্দ যিনি বাল্যকাল থেকেই বলতে গেলে জন্মকবি ছিলেন। দেবী সরস্বতী তাঁর ঠোঁটের আগায় বাস করতেন। সেই বালকের তখন মাত্র সাত বৎসর বয়স। শিবানন্দ ছেলেকে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গেলে পর পরমানন্দ তাঁকে তার সুন্দর কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া কণ্ঠে কৃষ্ণ বিষয়ে সংস্কৃতে দুটি চরণ শ্লোক বলে শোনাল। চৈতন্য অবাক হয়ে দেখলেন এই একফোঁটা ছেলের এতো ক্ষমতা। আশ্চর্য প্রতিভা। পরমানন্দ তাঁকে প্রণাম করলে মহাপ্রভু তার ঠোঁটে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল রেখে আশীর্বাদ করে বললেন—আজ হতে তোমার নাম কবি কর্ণপুর। সেই কোনকালে শুনেছিল পূর্ণ, এখনো মনে

আছে—“শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইলা, মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা।”

এই শিবানন্দ সেনই গঙ্গার ধারে নিজের গুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের নামে একটি মন্দির আর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই মন্দির কোনকালে গঙ্গা গ্রাস করে ফেলেছেন। তার বদলে একটি নতুন মন্দির তৈরি হল। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়োর ছেলে কচুরায়ের কীর্তি এটি। সে মন্দিরও গঙ্গায় গেল। এখন যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বয়সও প্রায় দুশো বৎসর। এই তৃতীয় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে দেন কলকাতা পাথুরেঘাটার নয়ানচাঁদ মল্লিকের ছেলেরা। তবে হ্যাঁ, সেই প্রাচীন বিগ্রহ এখনো আছে। শোনা যায় মহাপ্রভুর লীলা শেষ হওয়ার পর শিবানন্দ তাঁরই স্বপ্ন পেয়ে ভাগীরথীর গর্ভে একটি কালো কষ্টি পাথর পেলেন। সেই পাথর কুঁদে তৈরি হল কৃষ্ণমূর্তি আর সঙ্গে অষ্টধাতুর এক রাধাও এলেন। প্রতিষ্ঠিত হলেন কৃষ্ণদেবরাই। আর সেই বিগ্রহের নাম ধরেই এ মৌজার নাম কৃষ্ণদেববাটি।

পূর্ণ মায়ের আমল থেকে এই মন্দিরের পালা সেবা করে আসছে। প্রতি মাসে দুই খেপে তিনদিন করে মোট ছয়দিন। এই ছয়দিন বড়ো আনন্দের। মনও ভরে আবার পেটও।

ছেলেবেলায় পূর্ণ শিবানন্দের পোড়ো ভিটের ঢিবি জঙ্গল দেখেছে। মনে আছে অনেক দিন আগে ঐখানে অনেক নেড়া-নেড়ী কণ্ঠি তিলকধারী বৈষ্ণব এসেছিলেন। ক'দিন ধরে নামসংকীর্তন আব মালসাভোগ হয়েছিল।

জমিদারের মেয়ে কিরণশশীর সঙ্গে পূর্ণর বন্ধু পাতানো হয়ে গিয়েছিল সেই প্রথমদিন দুপুরবেলা থেকে। দুইজনের বাইরের মিলেব চেয়ে ভিতরের মিল বড়ো বেশি। আব সে কারণেই একজন আর একজনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। দুই সখীতে মিলে খেলে, গান করে, গল্প করে। একদিন কিরণ জিজ্ঞাসা করে—বলতো—রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা এর মানে কি ?

পূর্ণ অবাক। হুঁ, ধাঁধা বড়ো সহজ না। ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু অনেক ভেবেও কূল পায় না। তখন মনে মনে ফন্দী করে মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাল বলবে।—আজ রাত্তিরটা ভাবি, কাল জবাব দেবো।

পরদিন দুপুরে চণ্ডীমণ্ডপের দরোজায় দুইজনে আবার দেখা। পূর্ণ কিরণের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাগানে। তারপর একরাশ কুঁচ ফল পেড়ে এনে কিরণের গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে বলল—কি হলতো তোমার উত্তর।

সেদিন আবার পূর্ণ একটি ধাঁধা বলে। কিরণ উত্তর করে না। পরদিন ঐ

একইভাবে পূর্ণ কিরণের কাছ থেকে জবাব পেয়ে যায়।

একদিন গরমের দুপুরে দুজনে মিলে পায়ে পায়ে বাগান ছেড়ে গ্রামের উত্তর পশ্চিমে বেড়াতে গেল। বাঁশবাগান, আম কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে, মাটিতে দেদার বিছিয়ে থাকা সুপারি মাড়িয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে দেখলো কাঁচাপথ খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে আবার উঠে গেছে। পথ যেখানে নেমেছে ঠিক তার মুখে এক প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ, চওড়া গুঁড়ি আর তেমনি চওড়া তার ছায়া। তারপরে সরু পথ চলে গেছে উত্তর পশ্চিম দিকে আম নারকেলের বাগান পার হয়ে। সেই পথে নেমে পড়ল দুইজনে। দেখলো ঐ গাছপালার ফাঁক দিয়ে জেগে রয়েছে ছড়ানো এক ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি। ইঁট খসে পড়েছে, কোথাও বা দেয়াল পড়ো পড়ো। বাড়ির বাঁ দিকে একটি ছোট্ট ডোবা, জল কমে কেবল তলানির মতন মাঝখানে ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে। সাবেক কোঠা বাড়ি, ছোট ইঁটের তৈরি। দেয়াল বেয়ে বুনো লতা উঠেছে, কোথাও বা অশ্বত্থ গাছের ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। বাড়িটি দুই মহলা। বার মহলে পুবে পশ্চিমে দুটি বৈঠকখানার মতন ঘর। তারপরে চ্যাটালো উঠোন। উঠোনের সামনে বেশ বড়োসড়ো পূজার দালান নিয়ে ঘর। ঐদিকের একটি দরোজা দিয়ে অন্দরমহলে যেতে হয়। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি ইঁদারাও রয়েছে। অনেক নিচে জল টলটল করছে। শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ছে জলে। সবুজ রঙের ব্যাঙ ডুবছে উঠছে একটি দুটি। নিঃশব্দ বাড়ির ভিতরে কোনো মানুষের শব্দ নেই। কেবল যা আছে পাখির ডাক, পূজার দালানে গোলা পায়রার বকবকম আর ঝোড়ো গরম হাওয়ার মুখে শুকনো পাতার উড়ে যাওয়া। পূর্ণ কিরণের হাতে বেড় দিয়ে বলে—এ কোথায় এলাম ভাই।

কিরণ বলে—মানুষ কই?

—তাই তো!

[illegible]লের গা বেয়ে ঝুর ঝুর করে ঝুরো ইঁটসুরকি ঝরে পড়ে। একটি পাখি [illegible] এখানে। সে উড়ে যেতে একটা মেটে রঙের গিরগিটি এসে মুখ [illegible] চঞ্চল চোখ তুলে চারদিক দেখে। ঘন ঘন জিভ বার করে। তাবপর সাঁ করে নেমে যায় পাঁচিলের ওপিঠ বেয়ে।

উঠোনের মাঝখানে একটি কুমোরের চাক। এক বোঝা মাটির স্তূপ আর কিছু ভাঙা আভাঙা মাটির হাঁড়ি কলসী। মণ্ডপের সিঁড়িতে সার দিয়ে সাজানো মাটির হাঁড়ি, সরা আরো কতোকি। উপুড় করে রোদে শোয়ানো আছে। ঠিক এমনি সময় ভিতর ঘর থেকে গলা খাঁকারির শব্দ। দুইজনে তাড়াতাড়ি কাছাকাছি সরে আসে। ঘরের ভিতর থেকে আধভেজানো পাল্লা ঠেলে একমাথা পাকা চুল এক

বুড়ো কাশতে কাশতে এসে দাঁড়ালো দালানে। ঠিক তার পিছনে এক কাঁচা পাকা চুলো বউ, হাতে বালতি দড়ি আর কলসী। ওদিকে দুই বুড়োবুড়ি আর এদিকে দুই ছুঁড়ি। যাক, তাহলে মানুষ আছে। শুধু মানুষ নয় জোড়া মানুষ। বুড়ো বলে—কি গা, ওগুলো তুলবে নাকি?

বুড়ি বলে—আর একটু পুড়ুক না।

—যদি জল আসে তখন?

বুড়ি কপালে হাত রেখে আকাশে তাকালো। তারপর বলে—না।

—কি না?

—জল হবে না।

হঠাৎ লোকটির চোখ গেল ওদের দিকে। চোখ বড়ো বড়ো করে বলে উঠলো—কে মা তোমরা?

কিরণই মুখ খোলে—বেড়াতে এয়েছি গো।

বুড়ি এগিয়ে আসে—ওমা। দুটিতে বেশ মানিয়েছে তো। সই বুঝি?

কিরণ পূর্ণর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে—না। এখনো সই পাতানো হয়নিকো।

—না পাতালেই বা। মনের মিল থাকলেই হল।

কিরণ বেশ মটমট করে বলে—হুঁ তা বাপু আছে। কি বল্ পূণ্য।

পূর্ণ মাথা কাত করে। বুড়ি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। বালতি দড়ি কলসী ইঁদারার পাশে নামিয়ে রেখে ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর আলতো করে পূর্ণর মাথায় হাত রেখে বলে—মেয়ের চুলগুলি তো বেশ। কোঁকড়া হলে কি হবে বেশ গোছ গাছে।

বুড়ো ততক্ষণে সিঁড়িতে বসে পড়েছে। বসে বসেই বলে—তোমরা কোথায় থাকো মা?

পূর্ণ এবার কথা বলে—জমিদার বাড়িতে।

বুড়ো আবার চোখ বড়ো করে—ওমা কি কাণ্ড। তুমি কি আমাদের জমিদারবাবুর মেয়ে?

—আর ইটি কে?—বুড়ির প্রশ্ন।

পূর্ণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না না, আমি নয়। এ।

কিরণ হাত তোলে—হুঁ তাই। আর এ হল—

পূর্ণ মাথা হেঁট করে বলে—আমার বাবার নাম প্রাণকেষ্ট পরামাণিক। সগ্যে গেছেন।

—আহাহা মরে যাই বাছা। এমন সোনার পুতলী মেয়ে রেখে প্রাণকেষ্ট চলে গেল।

বুড়ো মুখে চুক চুক শব্দ করে। বুড়ি পূর্ণর থোকা চুলের গোছে হাত ডুবিয়ে বলে—কে বলবে নাপতের মেয়ে।

পূর্ণ বলে—তোমরা এখানে থাকো?

—হ্যাঁ মা। আমরা এই বুড়োবুড়ি আর হাঁড়িকুড়ি।

—হাঁড়ি বানাও?

—হ্যাঁ গো।

কিরণ বলে ওঠে—পুতুল বানাতে পারো না?

বুড়ো হাসে—না। আমাদের যতো সব মোটাসোটা কাজ।

বুড়ি কিরণের হাত ধরে বলে—এসো না মা। দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ। একটু বস।

—তোমাদের ছেলেপুলে কটি গা?

কিরণ বুড়ির দিকে তাকালো। এই কথাটি বলামাত্র বুড়ির মুখটি কেমন নিভে যায়। ঠোঁটে আঙুল চেপে বলে—চুপ চুপ।

পূর্ণ বুঝতে পারে না এতে চুপ করার কি আছে। কিন্তু বুড়ো ঠিক শুনে ফেলে সেকথা। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে কি যেন দেখে নেয়। তারপর হাত নেড়ে বলে—আমার পেছু পেছু এসো।

বুড়ি পূর্ণর আঙুল টিপে বলে—যেও না।

—আঃ। কি হল কি।

বুড়োর ধমকে তারা দুইজনে তার পিছনে চলতে থাকে। বুড়ো তাদের সঙ্গে করে দালানে উঠে আধভেজানো বড়ো দরোজাটা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। পূর্ণ মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এরা মানুষ কেউ খারাপ না। কোনো মন্দ করবে না। ঘরের একপাশে একটি বড়ো লোহার সিন্দুক। তালা নেই, কেবল ডালা নামানো আছে। বুড়ো হাত তুলে বলে—এসো!

ওরা গুটি গুটি সিন্দুকের কাছে এগিয়ে যায়। বুড়ো ভারি ডালাটি আস্তে আস্তে তুলে ধরে বলে—দেখো।

পূর্ণ কিরণের মাথার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকের মধ্যে একথালা ভাত, একবাটি ডাল আর দুই এক পদ তরকারি রাখা আছে।

—দেখলে মায়েরা?

তারা একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। কি বলতে চায় বুড়ো। সিন্দুকের মধ্যে ভাত রেখেছে কেন। পূর্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করবে নাকি। কিরণ ভাবে কি মানুষের হাতে পড়লাম গো। তাদের এই ভাবাভাবির মাঝে বুড়ো ডালা নামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে—লক্ষ্মণ। আমার ছেলে। এর মধ্যে ঘুমোচ্ছে।

—সে কি!

—হ্যাঁ। দিনরাত ঘুমোয়। আমরা যখন খাই ওকে ঐখানে খাবার দিই। নাকে মুখে গুঁজে আবার ঘুমিয়ে যায়।

—সে কি কথা! —পূর্ণ আর কিরণ একসঙ্গে বলে।

—ঐ কথাই। কুম্ভকর্ণের ঘুম যে।

চলে আসবার সময় বুড়ো বলে—বাড়িতে গিয়ে কি বলবে?

পূর্ণ চটপট জবাব দেয়—বলবো মস্ত বাড়িতে দুজন থাকে—

—না না, তিনজন। লক্ষ্মণ আছে না।

—তাই তো।

কিছুই পরিষ্কার হয় না। সিন্দুকের মধ্যে লক্ষ্মণের নামগন্ধ নেই অথচ বলছে সে ওখানে ঘুমোচ্ছে। দিনরাত ঘুমোয়। এতো ভারি খিটকেল ব্যাপার। ইঁদারার পাশে দাঁড়ানো বুড়ি বলে—বাড়িতে জিজ্ঞেস করলে বোলো ঈশ্বর গুপ্তর ভিটেয় গিয়েছিলাম, কেমন।

কিরণ বলে—কিন্তু লক্ষ্মণ?

•চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বুড়ি বলে—সেকথা থাক্ মা।

সেদিন রাতে মার কাছে শুয়ে পূর্ণ শোনে বুড়োর নাম মধু কুমোর। একমাত্র ছেলে লক্ষ্মণ মরে যাওয়ায় তার মাথার দোষ হয়ে গেছে। সবসময় মনে করে ছেলে বুঝি ঐ সিন্দুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। মধু কুমোরের হাতের কাজ বড়ো চমৎকার। সে যখন কাজে বসে তখন মাথা বেচাল হয় না। কিন্তু অন্যসময় ঐ এক চিন্তা। বুড়োবুড়ি বড়ো দুঃখী। পূর্ণ জিজ্ঞাসা করে—ঈশ্বর গুপ্ত কি ভগবান মা?

—ধুর পাগলী, ভগবান হতে যাবেন কেন।

—তুমি যে বলো ঈশ্বর মানে ভগবান।

—ইনি সে ভগবান নন। তবে হ্যাঁ কতক কতক বটেন। মস্ত মানুষ ছিলেন। কতো সুন্দর সুন্দর পদ রচেছিলেন, কেতাব লিখেছিলেন। কিন্তু—

নিভাননী কথা শেষ করে না। পূর্ণ বলে—কি মা?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা—অতো বড়ো মানুষ, কিন্তু বড়ো দুঃখী ছিলেন।

—কেন মা?

আবার একটি নিঃশ্বাস ফেলে মা—মন্দ কপাল। তিনি দেখতে কুচ্ছিৎ ছিলেন। তার ওপর হাবা বোবা।

—তাহলে বিয়ে হল কেন?

—ওমা। কুল রাখতে হবে না। কুলীনের ঘর বলে কথা। তাইতে দুকুল

গেল। সংসার করতে পেলে না দুজনাতেই। কেউ আর জীবনে শান্তি পেলেন না।

—আহা রে।

—তবে হ্যাঁ। পরিবারের মুখ না দেখলেও ঈশ্বর গুপ্ত জীবনে তাঁকে ভাত কাপড়ের কষ্ট দেননি। কিন্তু সেইটুকুনই কি সব। মেয়েমানুষের স্বামী যে সব্ মা।

এখানে এসে পূর্ণর বাবার কথা মনে হয়। মার জন্যে মনটা ভিজে ওঠে। কে জানে বাবার মতন সেই মানুষটিও কি অমনি আলাভুলো ছিলেন। তিনিও কি কেবল নিজের পদ নিয়ে মজে ছিলেন। মেয়েমানুষের কাছে স্বামী যে কতোখানি সে কথা না বুঝলেও এটা বোঝে মায়ের মনটি এখন ভাল নেই। গলা কেমন ধরা, নিঃশ্বাস ভারি। পূর্ণ মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

এর অনেককাল পরে পূর্ণ জানতে পেরেছে ঈশ্বর গুপ্তর কথা। তখন সেই যাকে বলে জ্ঞানের চোখ ফুটেছে। উকিলমার কাছে যাতায়াত হয়েছে। এছাড়া গ্রামের অনেক পুরনো মানুষের কাছে শুনেছে তাঁর গল্প। ছেলেবেলায় কেমন ডাকাবুকো ছিলেন। অল্প বয়সে মা হারিয়ে তাঁর জায়গায় বিমাতা এলেন। ঈশ্বর সেই নতুন মাকে সহ্য করতে পারলেন না। আর সেই কোপেই মাকে একদিন লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ছেলেবেলায় পড়ালেখায় মন ছিল না ছেলের। দিনরাত বনে-বাদাড়ে গাছতলায় পড়ে থাকতেন। আর সেই বালক কাল থেকেই ঈশ্বর চমৎকার পদ আর কবিতা রচনা করতে পারতেন। যে গ্রাম কাঁচরাপাড়ার মানুষ এই বালকের উৎপাতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল তারাই পরে তার নাম ঘটা করে বলে বেড়াতো। গর্ব করতো। কেন না তখন গুপ্তকবি শুধু এ গ্রামের না গোটা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে বসে আছেন। পূর্ণর মনে আছে—কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান। আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥

উকিলমা বলতেন ঈশ্বর গুপ্ত সমস্ত জীবনভর মেয়েমানুষের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা অনেক পদে মেয়েদের নিয়ে হাসি মস্করা করেছেন, হুল ফুটিয়েছেন। পূর্ণর যখনই এই কথা মনে হয় তখনই বাবার কথা মনে পড়ে। মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়।

এখন গুপ্তকবির ভিটে ধুলোয় মিশে গেছে। উঁচু ঢিবির ওপর স্তম্ভ করে তার গায়ে শাদা পাথরে তাঁর বন্দনা লেখা আছে। দূরে গঙ্গার ওপার চোখে পড়ে। নতুন তৈরি হতে যাওয়া পাকা সাঁকোর কাজ কারবারের নিশানা পাওয়া যায়। ফাঁকা মাঠে গরু চরে। ছাগল ঘাস খোঁটে। ধুলো ওড়ে দমকা হাওয়ায়। ছেলেপুলেরা খেলে হা হা হো হো। মাঠের একধারে সেই প্রকাণ্ড পাকুড়তলা।

না জানি কতো নিরিবিলি দুপুরে তার নিচে দামাল ছেলেটি খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে গেছে। ছেলে নেই, গাছ সাক্ষী হয়ে আছে। সকাল থেকে বিকেল হয়। আস্তে আস্তে নির্জন মাঠে অন্ধকার কালি লেপে দেয় আবার কখনো বা চাঁদের আলোয় সব ধুয়ে যায়। একলা দাঁড়িয়ে থাকা স্তম্ভের বুকে জ্বল. জ্বল করে—

সুধন্য কাঞ্চনপল্লী শ্যাম তরু তৃণবল্লী
তব জন্মে ধন্য হেথা মানি।
নহ গুপ্ত, হে ঈশ্বর ব্যাপ্ত তুমি চরাচর
যুগে যুগে সত্য তব বাণী ॥

সত্যি এ সোনার গ্রাম। এখানে পড়ে পড়ে কেউ মার খায় না। হ্যাঁ, মানুষের বিশ্বাসের গোড়ায় ঘা দিতে নেই। বিশ্বাসে কি না হয়। তাই তো হারাধন কোথা থেকে একখানা ত্রিপল যোগাড় করে এনেছে। সঙ্গে কয়েক আঁটি খড়ও যোগাড় হয়েছে। আজ রাতে সুখে ঘুম।

আমতলায় কলার পাত পেতে সকলে মিলে সাপটে খেয়েছে খুদ-চাল মিশেল করা অন্ন। আর তার সঙ্গে শাক পাতা উচ্ছে সব মিলিয়ে একটি পাঁচতরকারি। বনের ধারে বনভোজন সবাই মিলে, এক সঙ্গে। কেবল কোলেরটার জন্যে গুঁড়ো দুধ গোলা জল।

খাওয়া দাওয়া মিটতে প্রায় বিকেল। ঘটি উপুড় করে ঢকঢক করে জল খেতে খেতে পূর্ণর মনে হয় এখন একটি পান পেলে মন্দ হয় না। অভাবে একটু নস্যি। কিন্তু কৌটোটা যে খালি। যজমানিতে না বেরোলে জুটবে না। নাতির পয়সায় আর কোন মুখে নেশা ভাং করা যায়।

তবুও এক চির পান হলে মুখটা ষোল আনা ভরতো।

ঘটিটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে পূর্ণ আপন মনে গজ গজ করে—ভাত পায় না ভাতার চায়। থেকে থেকে চুঁড়ি গয়না চায়।

হাতে দিলাম দই খই, তুমি আমার জন্মের সই।

চারকোণে চার খোঁটা ফেলে এখন দুইদিকে দুই খোঁটা। মাঝখানে আড় করে বাঁশ ফেলে এ মাথায় ও মাথায় বাঁধা। তার ওপরে ত্রিপল ফেলা হয়েছে। দুইদিক দিয়ে ত্রিপলের ঢাল নেমেছে-অনেকটা তাঁবুর মতন। ন্যাকড়া কাপড় দিয়ে সামনে পিছনে আড়াল করে কোণে কোণে থান ইঁট চাপা যাতে করে কাপড় উড়ে না যায়। মাটিতে পড়েছে বিচালি, তার ওপর চট কাঁথা—যাকে বলে রাজশয্যা। মন যদি রাজার মতন হয় বনের গাছতলাই রাজপ্রাসাদ। শাক-অন্ন

রাজভোগ আর চাঁদের আলো হল ঝাড়বাতিরও ঠাকুর্দা। মন যদি কাঙালী হয় তো যেখানেই থাকো না কেন সে জায়গা আঁস্তাকুড় আবর্জনা। তাই তো কাঙাল হতে নেই। মনকে খাটো করতে নেই। হলেই বা পরনে ছেঁড়া ট্যানা যদি মনে করি দামী বস্ত্র পরনে আছে তাহলে আর দুঃখ থাকবে না। অন্নের বেলায়ও তাই। অন্ন কাঙালী যায় নগরে নগরে। বস্ত্র কাঙালী যায় বনে বনে। একদিকে ভিক্ষে করে পেটপুরণ আর একদিকে বনে গিয়ে লজ্জা নিবারণ।

জায়গাটি যে পয়মন্ত তা আজই টের পাওয়া গেল। হারাধনের এখন কাজ থেকে বসে যাওয়ার সময়। চটকলের বদলি কাজের এই তো নিয়ম। কিন্তু কি আশ্চর্য, আজ সে খবর নিয়ে এসেছে এখন নাগাড়ে পনেরো দিন কাজ চলবে। যার জায়গায় হারাধন কাজে লেগেছিল তার ছুটি থেকে ফিরে এসে জমতে এখনো নাকি হপ্তা দুয়েক দেরী। অতএব আবার কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্দি। তা না হয় হল—এর মধ্যে অন্তত যেমন তেমন করে কি একখানা ঘর উঠবে না। হারাধন নাকি কিছু টাকা ধার করবার চেষ্টা করছে। বাঁশ, দরমা আর কিছু সরঞ্জাম যদি কেনা যায়।

মধু কুমোরের বউ সেদিন বলেছিল মনের মিল থাকলেই নাকি সই হয়। কিন্তু আইন করে নিয়ম আচার করে সই পাতালে নাকি মনের সংগে মনের শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়। বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধার মতন এ বন্ধনও বড়ো কমজোরী না। জমিদার বাড়িতে দুই বছর বাস করে কখন যে কিরণশশীর মনের সঙ্গে পূর্ণশশীর মন জড়িয়ে গিয়েছিল তা সে টেরই পায়নি। ঐ প্রকাণ্ড বাড়িতে তাঁরা দুই কর্তাগিন্নি আর ঐ এক মেয়ে। জমিদারবাবুর এক ছেলে। সে কালেভদ্রে বাড়ি আসে। কলকাতায় থেকে ডাক্তারি পড়ে। নাম তার ললিত। কেমন মেয়েলি গড়ন। চোখা নাক চোখ আর পাতলা ঠোঁটের আগায় মিষ্টি হাসি। কিরণশশী পূর্ণর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো। পূর্ণ যখন এগারো সে তখন তেরো। বাড়ন্ত গড়নের জন্যে দুজনকেই বেশ ডাগর ডোগর দেখাতো।

মা সেদিন কেবল যজমানি শেখার কথা পেড়েছিল। তখনো হাতেকলমে শিক্ষা হয়নি। শিক্ষা হল মাত্র সেদিন। মা মেয়ের হাতে বিদ্যা তুলে দিল তার এগারো বছর বয়সে। আর সে শিক্ষাও হল কিরণশশীর কারণে। প্রাণসখী হল প্রথম হাতেখড়ির শেলেট, বিদ্যা পত্তনের মুখপাত। তাকে দিয়েই শুরু।

চৈত্র মাস। ফাল্গুন মাসে রোদে যে মিঠে আগুন উঠেছিল তা এখন আরো চড়েছে। মাটি তেতে উঠেছে। হাওয়ার মতিগতি বদলে যাচ্ছে। গাছের পাতায় ভোরের শিশির পলকা হয়েছে। পাতাঝরে গিয়ে পুকুরধারের আমড়া গাছটিতে কেমন চনমনে নতুন পাতা এসেছে। ফিকে সবুজ বর্ণ আর গায়ে কেমন

শুঁয়োপোকার মতন রোঁয়া। দিনেরাতে আমডালে জারুল ডালে কোকিল ডাকে। এ গাছ থেকে বলে কু উ উ তো ঐ গাছ হতে জবাব ফেরে কু উ উ। আমের বোলের মুখ ফুটে সবুজ গুটিতে গাছ ভরে আছে। আর অমনি দুই একটি করে আমপোকার দল এসে মালিকানা বর্তাতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। ঋতুর রাজা হলেন বসন্ত। তাই তো চারিধারে এতো সুগন্ধ। সুগন্ধ লেবু ফুলে, কাঁচা আমের কচি গুটিতে, সজিনা ফুলে, পথের ধুলোয়—রোদের আমেজে আর চাঁদের আলোয়।

সকাল থেকে কিরণের দেখা পায়নি পূর্ণ। এমনটিতো হবার কথা না। কাল বিকেলেও কথা হয়েছে সকাল্ সকাল উঠে দুজনে পুকুরে নাইতে যাবে। দুপুরে আজকাল জল তেতে যায় বলে স্নানে সুখ হয় না। বেশীক্ষণ জলে থাকা যায় না।

কিন্তু কোথায় কিরণ। চণ্ডীমণ্ডপের বারদুয়ারে একা একা অনেকসময় বসে থেকে আলা হয়ে পড়েছে পূর্ণ। অন্দরবাড়ি থেকে আর মলেব ঝমঝম ছুটে আসে না। ঝটকা বাতাসের মতন কিরণশশী এসে তাব পিঠে ধাক্কা মারে না। তা কি আর করবে পূর্ণ। বসে বসে কাঁই বিচি নিয়ে জোড় বিজোড় খেলে। হাতের তালুতে ধুলো নিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাসে ওড়ায়। বিনুনি খুলে আবার নতুন করে কতোবার বাঁধে তবুও কিরণ আসে না। পূর্ণ বসে বসে দেখে দু'পাঁচজন করে পাড়ার বউ মানুষ এসে অন্দরমহলে সেঁধোচ্ছে। একের পিছনে আর একজন। দুই এর পবে তিনজন। বউ এয়োরা সেই ধানের মবাইয়ের সেঁধোনো চড়ুই পাখির দলের মতন একে একে ভিতব হলে যাচ্ছে. কিন্তু কেউ আর ফিরে বেরিয়ে আসছে না। কি যেন এক শলাপরামর্শ চলছে ওখানে। সকাল থেকে পূর্ণ মাকেও দেখতে পায়নি। মা যে অন্দরমহলে রয়েছে একথা আর বলে দিতে হবে না। মায়ের গলা আওয়াজেই তা মালুম। কিন্তু সকলে মিলে কি করছে ওখানে। কিসের এতো আনাগোনা আর ব্যস্তসমস্ত ভাব।

হালদার বাড়ির ছোট বউ হনহনিয়ে এদিকে আসছে অন্দরবাড়ির দিক থেকে। পূর্ণ উঠে দাঁড়ায়। এই প্রথম একটি পাখি বাইরে এল। হুঁ, ধরতে হচ্ছে ওকে। পালাতে দেওয়া চলবে না। হাতেব গামছাটা কোমরে পাক দিয়ে পূর্ণ ধেয়ে গেল ছোটবউয়ের দিকে। বউটা এমনিতে একটু ক্যাঁট ক্যাঁট করে কথা বলে কিন্তু মনটি খারাপ না। পূর্ণ পথ আগলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অমনি বউয়ের নাকের নথ নড়ে ওঠে—কি লা ছুঁড়ি। কাজের সময় পথ আটকাস্ কেন?

পূর্ণ চোখ ঘুরিয়ে বলে—এই সাতসকালে কি এতো কাজ গা তোমাদের?

বউ হাসে—সে খবরে তোর কাজ কী ?

—আছে।

—উঃ কি আমার কম্মের নিধিরে। ছাড়্ পথ ছাড়্।

—না বললে যেতে দোব না।

ছোটবউ চোখ কপালে তোলে—কি বলতে হবে শুনি ?

—কিরণ কোথায় ? সেও কি তোমাদের সঙ্গে কাজ করছে। আমি বলে সকাল থেকে তার জন্যে বসে বসে—

—কেন ? তার সঙ্গে কি ?

—বারে। চানে যাবো না নাকি।

ছোট বউ আবার হাসে—সে চানে যাবে না।

পূর্ণ ঝাঁঝিয়ে ওঠে—কেন তোমার কথায় ?

—আ মরণ। মেয়ের আবার চোখ আছে। তবে বলি শোন্। কথা আমারও না আমার বাপেরও না। এটা হল বিধেন। কিরণ আজ থেকে তিনদিন বন্ধ ঘরে আটক থাকবে বুঝলি।

—ও মা, সেকি !

—হ্যাঁ তাই। কিরণেব এই পেত্থম হল যে।

—কি পেত্থম হল গো ?

ছোট বউ আবার মুখ টিপে হাসে—তার শরীর ভাল নেই।

এ কথা শোনামাত্র পূর্ণর ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। কি হল কিরণের। কোনো খারাপ ব্যামো হয়নি তো। কেউ কোনো মন্দ করে বসেনি তো। কালও যে মানুষ সুস্থির ছিল আজ তার ঘরের বার হবার যো নেই। পূর্ণর অভিমান গলার কাছে আটকে আসে। কিরণের শরীর খারাপের কথা পাড়া প্রতিবেশী জানে অথচ তার জানবার উপায় নেই। যার সব থেকে আগে জানবার কথা সে জানতে পায় সকলের শেষে—বাইরের লোকের মুখ দিয়ে। কিরণও তো তাকে ডাক করাতে পারতো। সেও কি আর সকলের সঙ্গে সায় দিয়ে বসে আছে। হালদার বউ বলে—সরে দাঁড়া। এখন অনেক কাজ আছে।

পূর্ণ যেন মরিয়া হয়ে দুই হাত দিয়ে ছোট বউয়ের রাস্তা আড়াল করে বলে ওঠে—কিরণের কি অসুখ না বললে—

মুখে কাপড়চাপা দিয়ে হাসিতে ভেঙে যায় ছোট বউ। কি আশ্চর্য, মানুষের অসুখ করলে কি কেউ এমন করে হাসতে পারে। রাগে ভিতরটা মট মট করে, কিন্তু বলবার উপায় নেই। রাগ ঝাল দেখালে যে কিছুই জানা যাবে না। তাই মনের ভাব মনে রেখে পূর্ণ মিনতি করে—বলো না গো। কি হয়েছে কিরণের ?

—তোর যখন হবে তখন আপনিই জানতে পারবি। এ ব্যামো সব মেয়েরই হয়।

অবাক হয়ে পূর্ণ বলে—আমারও হবে!

—হ্যাঁ। না যে হলে তুই মেয়েমানুষ হতে পারবিনি। তোর জন্মই যে বৃথা হবে।

পূর্ণকে জোর করে দুই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে চলে যেতে যেতে ছোটবউ বলে যায়—এমন ধারা ন্যাকা মেয়ে বাপু দেখিনি।

পূর্ণ আর থাকতে পারে না। এক দৌড়ে অনুর বাড়িতে চলে আসে। দেখে জমিদার গিন্নী আর তার মা একপাশে দাঁড়িয়ে কি সব কথাবার্তাবলছে। এদিকে পাড়ার তিনজন এয়োস্ত্রী মিলে একটি ছোট ধামার গায়ে সিঁদুব ফোঁটা আঁকছে। পূর্ণকে দেখে জমিদারনী হাসেন—কি রে মেয়ে। একলা একলা মন খারাপ তো।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। মেয়ের অসুখ কিন্তু মা হাসছে। পূর্ণর ঠোঁট ফুলে ওঠে। গলার কাছে ডেলা পাকানো অভিমান, এতক্ষণের অপেক্ষা আর কিরণের অদেখার দুঃখ সব কিছু একসঙ্গে ঠেলে ওঠে। পূর্ণ ঠোঁট কামড়ে চোখ নিচু করে থাকে। মা বলে—পূণ্য, কোথাও যাসনে যেন। কাজ আছে।

জমিদারনী গলা তুলে বলেন—ওগো বউরা, তোমরা তাহলে বেরিয়ে পড়ো। তিন বামুন বাড়ি থেকে তিন মুঠো করে চাল নেবে। মনে আছে তো?

তিন এয়োস্ত্রী ধামা নিয়ে চলে যায়। পূর্ণ আকাশে তাকিয়ে দেখে বেলা বাড়ছে। রোদ নেমে এসেছে পাঁচিলের পাশ ছুঁয়ে উঠোনে। গড়িয়ে গেছে বেশ অনেকখানি। কোথায় একটা কোকিল ডাকছে এক নাগাড়ে। বাইরে কাঁচা পথে গরুর গাড়ি চলে যাওয়াব ক্যাঁচর ক্যাঁচ। রান্নাঘবে হাতাখুন্তির সঙ্গে বামুন মার গলা তুলে ডাক—মা।

জমিদার গিন্নী সাড়া দেন—কি গা?

—বলছিলাম ডালে কি নারকেল কুচো দোব?

—না আজ থাক। ওরে ও কানাই।

কানাই নামে মুনিষটি কোথায় যাচ্ছিল। ডাক শুনে দাঁড়ায়—আজ্ঞে।

—শোন্ বাবা, গোমস্তাকে বলে তিন বস্তা সর্ষে কলু বাড়ি দিয়ে আসিস। আর তোদের মুড়ি জল বামুন মাব কাছ থেকে চেয়ে নিস। আমার বড়ো কাজ পড়েছে আজ।

কানাই চলে যায়। পূর্ণ একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে কিরণ কোথায়। কি করছে সে। জমিদার গিন্নী নিভাননীকে বলেন—তাহলে তোমরা সব যোগাড়

যন্তর করো।

মায়ের সঙ্গে পূর্ণ জমিদারবাড়ির পিছনে বাগানে চলে আসে। মায়ের হাতে একটি ছোট দা। যেতে যেতে মা বলে—সব শিখে নে। এর পরে তো—

—কিরণের কি হল মা?

মা একটু থামে। এক ঝলক পূর্ণর চোখে তাকায়, তাবপর বলে—তার ওষুধ হয়েছে।

পূর্ণ আবার ভাবনায় পড়ে। কিরণের কি করে ওষুধ হয়। বাপ-মা মরলে বা ছেলে হলে তো ওষুধ হয়। বাবা মরলে পূর্ণও তো কয়দিন মেনেছিল সে নিয়ম। কিন্তু কিরণের কি হল। মায়ের সঙ্গে থেকে পূর্ণ বাঁশতলা থেকে কঞ্চি কাটে। মাথা চাড়া দেওয়া প্রায় এক মানুষ সমান তালগাছ থেকে পাতা কেটে নেয়। আর পুকুর পাড় থেকে এক তাল মাটি। এই সমস্ত একত্র করে মা-মেয়েতে এসে বসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। কঞ্চিসমান করে কেটে চারটি টুকরো করা হয় দুই হাত করে। এবার মাথার দিকটা চিরে তার মধ্যে তালপাতা কেটে ভাঁজ করে প্রজাপতির মতন করে গিঁথে দেওয়া হয়। আর চারটি মাটির তাল সমান ভাগে ভাগ করে রাখা হয়।

বেলা আরো গড়িয়েছে! দুপুরের কাক ডাকছে। হাওয়া দিচ্ছে। পূর্ণ এই প্রথম অনেক সময় না দেখা কিরণশশীর দেখা পেল। ভিতর মহলের ঠাকুর ঘর, ভোগের ঘর পেরিয়ে এক কোণে একটি ছোট ঘরের দরোজা ভেজানো। মায়ের সঙ্গে দরোজা ঠেলে ভিতরে এল পূর্ণ। দেখলো মেঝেতে একখানি মাদুরের ওপর কিরণ বসে আছে—হাঁটুতে মাথা রেখে, কেমন জড়োসড়ো ভাব। এলো চুল উস্‌কো খুশ্‌কো। মুখ তুলে তাকিয়ে ফিক্‌ করে হাসল কিরণ। পূর্ণ অবাক। শরীর খারাপ, ওষুধ হয়েছে অথচ হাসছে। পূর্ণ বলে ওঠে—তোমার কি হয়েছে ভাই?

কিরণ হেসে মাথা নামায়—জানিনা।

ঘরের এক কোণে চারখানি ইঁট পেতে উনুন তৈরি হয়েছে। একটি পিতলের হাঁড়ি, হাতা, থালা আর ঘটি রাখা আছে। এককোণে কাঠকুটো। ছোট শিশিতে ঘি আর টুকিটাকি।

মা যা বলে পূর্ণ তাই করে। কিরণের মাদুরের বাইরে চার কোণে মাটির তাল রেখে তাতে ঐ তীরকাঠি বসিয়ে দেয়। তীরকাঠির চৌহদ্দির মধ্যে কিরণ বন্দী হল। এ যেন সেই প্রতিমাকে পুজোর আগে তাঁর প্রাণ বন্দী করার মতন কাণ্ড। পূর্ণ হাত থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে—চান করবে না?

কিরণ আবার মুখ তোলে। মুখখানা কেমন শুকনো লাগছে। চোখের কোণে

কালি, মাথা আতেলা। কিরণ বলে—তিনদিন চান করা মানা।

জমিদার গিন্নী দরোজা ঠেলে ঘরে ঢোকেন। হাতে সেই সিঁদুর ছোঁয়ানো ধামা আর কটি আলু কাঁচকলা উচ্ছে। সেগুলি উনুনের পাশে নামিয়ে রেখে তিনি বলেন—এগুলো এখেনে রইল মা। যখন রান্না করবি আমি এসে দেখিয়ে দোব।

কিরণ মাথা কাত করে।

—তোমাদের হল ?

নিভাননী মুখ তোলে—হ্যাঁ, মা, হল। তাহলে এই তিনদিন মেয়ে যেন বাইরে না যায়। দিনের বেলা হবিষ্যি করবে আর রাতে দুধ ফল সাবু এইসব। কেবল রাত পোয়ানোর আগে গোসল করতে বাইরে যেতে পারবে।

—বেশ। চান করবে কবে ?

—সেই চারদিনের দিন। সব বলে দোব মা। আপনার কোনো ভাবনা নেই।

পূর্ণর খুব ইচ্ছে করে কিরণের কাছে একটু বসে থাকে। কিন্তু কিরণও যেন কেমন আড়ষ্ট। কথা বলছে না। কেমন যেন দায় এড়ানো উত্তর দিচ্ছে। এ কেমন অচেনা জনের মতন ব্যবহার। মা উঠে দাঁড়ায়—চল্ পূণ্য। আজকের মতন কাজ শেষ। আবার তিনদিন পরে।

পূর্ণ চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। যদি কিরণ কিছু বলে। যদি সে দু-দণ্ড কাছে বসতে বলে। পূর্ণ একবার সমস্ত চোখ দিয়ে তার দিকে তাকায়। কিরণ কিন্তু মুখ তোলে না। নিভাননী পিছু ফিরে বলে—যন্তন্না কমেছে মা ?

কিরণ মুখ তুলে বলে—একটুকুন।

—ভয় নেই। কেরমে কেরমে কমে যাবে। তেমন হলে নুনের পুঁটলি গরম করে সেঁক কোরো।

জমিদার গিন্নী প্রথমে, তার পরে মা আব শেষে পূর্ণ। দরোজা ভেজাতে গিয়ে পূর্ণ দেখে কিরণ এক ঝলক মুখ তুলে জিভ ভেঙিয়ে আবার মাথা নিচু করেছে। বন্ধ দরোজার এপাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণ হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

তিনদিন পার হয়ে যায় ঠিকই। পূর্ণর কাছে যেন তিনযুগ। কতদিন যেন কিরণকে দেখেনি সে। কতকাল গল্প করা হয়নি, এক সঙ্গে পুকুরে নাওয়া হয়নি। বন্ধু তো না যেন পাপ। আর সেই জন্যেই এতো জ্বলন পোড়ন।

চারদিনের দিন সকালে পাড়ার এয়োরা এসে জোটে। পূর্ণ মায়ের সঙ্গে ছোট চুবড়ি কাঁখে করে অন্দরবাড়িতে যায়। তাতে রাখা আছে ঝামা, নরুন, আলতাপাতা আর এক টুকরো পরিষ্কার কাপড়। এয়োরা মিলে কিরণকে বাইরে নিয়ে আসে। এই কয়দিনে মুখখানা আরো শুকিয়ে গেছে, চোখের কোল বসা। মাথায় তেলজল না পড়ায় জট পড়েছে। সবাই মিলে কিরণকে পাশের

গোলাবাড়ির উঠোনে নিয়ে এল।

গোলাবাড়ির মাটির উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসে কিরণশশী। মা বলে—পূর্ণা।

—কি মা ?

—যা বলেছি সব মনে আছে তো ?

এয়োদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—ওমা সে কি ! এতোটুকু মেয়ে, পারবে তো ?

—আমি তো পাশেই আছি। ভয় কি।

পূর্ণর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মা বলে—নাপতেনী না ছুঁলে মেয়ে শুদ্ধু হবে না। ওষুধ কাটবে না। বুঝলি।

পূর্ণ হেঁট হয়ে চুবড়ি থেকে নরুন তুলে নিতে গিয়ে ভাবে সে ছুঁলেই কিরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কি আশ্চর্য ব্যাপার তাই না। মা আবার বলে—মনে রাখিস। এখন তুই সখীর গায়ে হাত দিচ্ছিস না। ও এখন তোর যজমান।

পূর্ণ কিরণের পায়েব আঙুলে কাঁপা হাতে নরুন ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে ফিসফিসিয়ে বলে—ভয় নেই। লাগবে না।

হাত পায়ের প্রতিটি নখে নরুনের আলতো আঁচড় দেয় পূর্ণ। কামানের এক প্রস্থ শেষ। এইবার কিরণের মাথায় তেল-হলুদ ছোঁয়ায় পূর্ণ। তেল গড়িয়ে যায় সখির চিবুক বেয়ে। এরপর এয়োরা উঠোনে কাদা করে ঘড়া ঘড়া জল ঢালে। তার সঙ্গে আলতাপাতা গুলে সকলে মিলে কিরণে মাখায়। হুটোপুটি কবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। হেসে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। সবাই হুল্লোড় করছে, কাদা মাখছে মাখাচ্ছে। জলে কাদায় রঙে যাকে বলে নৈনেক্কার কাণ্ড। তবে কেউ পূর্ণ বা তার মায়ের গায়ে কাদা জল দেয় না। তারা দুইজনে একধারে দাঁড়িয়ে সকলের আমোদ দেখে।

কাদা খেলা শেষ। এরপর ঘড়া করে জল ঢেলে কিরণশশীকে স্নান করানো হয়। কিরণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্নান শেষে কিরণ নতুন কাপড় পরে ভিতর দালানে আর একটি পিঁড়ি পেতে বসে। পা দুটি সামনে বাড়ানো। পূর্ণ হেঁট হয়ে তার পা জলে ভিজিয়ে ঝামা ঘষতে ঘষতে বলে—লাগে না তো ?

কিরণ কোনো উত্তর করে না। পূর্ণ ছোট ছোট হাত দিয়ে কিরণের পা মুছিয়ে দেয়। তারপর বাটির জলে আলতা পাতা চুবিয়ে সখীর পায়ে বেশ যত্ন করে আলতা টেনে দেয়। নিখুঁত করে গোড়ালি থেকে টেনে আনে, প্রতি আঙুলের খাঁজে তুলি দিয়ে বুলিয়ে দেয়। এইভাবে তিন প্রস্থ আলতা দেওয়া সারা হয়। পাশে থেকে মা বলে—এবার ?

মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি কিরণের টেনে নেওয়া পা ধরে ওপর পাতায় দুটি

করে ফোঁটা দেয়। আর দুই হাতের তেলোর নিচে কব্জিতে ঠিক অমনি দুটি ফোঁটা। চোখ তোলে পূর্ণ। দেখে কিরণ হাসছে ঝিকিমিকি। পাশে দাঁড়ানো মাও হাসছে। এয়োরা উলু দিয়ে ওঠে। সব শেষে জমিদারনী সকলের মধ্যে মিষ্টি বিলি করেন। পূর্ণ মুখে তুলতে গিয়ে দেখে সাদা রসোগোল্লা তার হাতের আলতার রঙে লাল হয়ে গেছে। নিঙড়োতে গেলে রসের বদলে রক্ত ঝরছে টপ টপ।

সেদিন রাতে শুয়ে মা মেয়েকে বিস্তর আদর করে। চুমো খায়। মাথায় হাত বুলোয়। পূর্ণ মায়ের বুকে মুখ লুকোয়।

তার কয়দিন পরেই নিভাননীকে ডেকে জমিদার গিন্নী বলেন আগামী পয়লা বৈশাখ শুভদিন। ঐ দিন সকালে কৃষ্ণরাইজীর মন্দিরে কিরণশশীর সঙ্গে পূর্ণশশীর সই পাতানো হবে।

পয়লা বৈশাখ। সকাল বেলা। মন্দিরের ভোগের ঘরে অনুষ্ঠান শুরু। জমিদারবাবু আর তাঁর পরিবার তো আছেনই। আর আছে কিছু পড়শি মেয়ে বউ। দুইজনে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে এসেছে। জমিদার বলেন—মনের 'মিল হলেই সই পাতানো সার্থক হয়।

জমিদার গিন্নী বলেন—সেদিনই আমি বুঝেছিলাম একে অপরের কি টান। আমার কিরণকে তিনদিন না দেখে পূণ্যর মুখ একেবারে কালি।

জমিদার হাসেন—তোমার মেয়ের হাতে আলতা পরে কিরণ আহ্লাদে আটখানা।

নিভাননী ঘোমটার আড়াল থেকে বলে—মেয়েকে তো যজমানি শিখতে হবে কত্তাবাবু। কি ভাগ্যি তার, রাজকন্যেকে দিয়ে কাজ শেখার পত্তন হল।

জমিদার বলে ওঠেন—রাজকন্যে নয়। আপনার জন, সই।

পূর্ণ নিয়ে এসেছে একখানি নতুন গামছা, নারকেলের মিষ্টি। মায়ের হাতে তৈরি। আর এনেছে এক ভাঁড় দই আর ছোট এক চুবড়ি খই। নিভাননীর সামর্থ্যে কাপড় কেনা কুলোয়নি।

প্রথমে কিরণ দখিন হাত পাতল, তলায় বাম হাত। পূর্ণ তার হাতে একটু দই আর খই তুলে দিল। এবার সে হাত পাতল ঐ একই ভাবে। তার হাতে জমিদার গিন্নী দইখই দিলেন। এখন দুইজনের দইখই সমেত চার হাত এক করা হল—ঠিক যেন বিয়ের সম্প্রদানের মত। চার হাত এক হল। এর পরে তো নিয়ম রক্ষা। না কোনো মন্ত্রতন্ত্র নেই, কেবল একটি শোলোক। মা বলেছিল আর তাই শুনে শুনে তারা তিনবার বলল—হাতে দিলাম দই খই, তুমি আমার জন্মের সই। শোলোক বলা হলে শাঁখ বাজলো, উলু পড়ল, এ ওর মুখে দইমাখা

খই তুলে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো। পূর্ণ কিরণকে নতুন গামছা আর মিষ্টি দিল আর কিরণ পাল্টে দিল কাপড় মিষ্টি। জন্মকালের জন্যে দুইজনে ভালবাসার বজ্র আঁটনে বাঁধা পড়ল।

সকলে আনন্দকরে মিষ্টি খেল। জমিদার বললেন—তোমরা মনে রেখো মা, ধর্ম সাক্ষী করে সই পাতালে এর মান যেন থাকে।

মন্দির থেকে ফেরার পথে মা বলে—মনে রাখিস্, সই মরলে তে রাত্তির ওষুধ হয়।

কিন্তু সইয়ের জন্যে ওষুধ পালন করবার সুযোগ হয়নি। হ্যাঁ, তা অনেকদিন হয়ে গেল সই স্বর্গে গেছে। বিয়ে হয়েছিল গুপ্তিপাড়ায় জমিদারদের ঘরে। পূর্ণ সইয়ের মরণের খবর পেয়েছে তিন বছর পরে। ততদিনে সইয়ের হয়তো আবাব নতুন করে মানব জনম হয়ে গেছে। পূর্ণ কি আর করে, মনে মনে কেষ্টরাইয়ের দরোজায় বলে এসেছে সই যেখানেই থাকুক না কেন যেন ভাল থাকে, শান্তিতে থাকে।

কাল থেকে তিনদিনের জন্যে মন্দিরের পালা সেবা শুরু। এই তিনদিন বড় আনন্দের। দেবসেবা কি আব মানুষ করতে পারে। সে ক্ষমতা কোথায়।' আসলে ঐ পাথর সেবার নাম করেই তো মানুষেরই পালা সেবা করা হয়। মা বলতো নাপতেনীর জন্ম ধারণ হল মানুষের যজমানির জন্যে। তার আব কোনো কাজ নেই। মানুষের বিপদ আপদ কিংবা আনন্দের দিনে সে এসে না দাঁড়ালে কোনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। সে এসে না ছুঁলে আনন্দ বা দুঃখ কোনটিরই ষোলকলা পূর্ণ হয় না। ঠাকুরবাড়ির পুরোহিত একদিন বলেছিলেন—নরের মধ্যে নাপিত হল শ্রেষ্ঠ। এ যেন সেই ছেঁড়া কাঁথায় বালাম চাল। তাই তো মরলেও নিশ্চিন্দি নেই। নাপিত না এলে পিতৃপুরুষের জল দানে নান্দীমুখ হবে না। সে এসে পা রাখবে আর অমনি বাপ-পিতামহ অন্নজলের জন্যে হাঁ কববেন।

কিরণশশীর সেই ঋতু দেখার অনুষ্ঠান দিয়ে যে হাতে খড়ি পড়েছিল সেই হাতে আজ কড়া পড়ে গেছে। যে হাত এক মেয়ের প্রথম মেয়েমানুষ হবার দায তুলে দিয়েছে সেই হাতই তাকে নিষ্ফলা হবার পাটে তুলে দিয়েছে শাখা সিঁদুব ভেঙে। প্রথম রক্ত ঝরার পালা থেকে শুরু করে আগুনের পাশে টেনে বসানোর ব্যবস্থা। সম্বল এক জোড়া হাত কেবল। আর তাই দিয়েই বলতে গেলে রাজ্য জয়।

আজ বিকেলে হরিণঘাটার সুবর্ণপুর থেকে অবিনাশ চাটুজ্যের লোক এসেছিল। প্রথমে পুরনো ডেরা সেই জমিদার বাড়ির পোড়োয় খোঁজ করতে গিয়েছিল। সেখানে না পেয়ে মন্দিরে। তারপর জিজ্ঞেসপাতি করে এই

আমতলায়। লোকটি বলে গেছে আগামী তেসরা মাঘ চাটুজ্যে মশাইয়ের ছোট মেয়ের বিয়ে। পূর্ণ যেন তিনদিন আগে থাকতেই সেখানে যায়। বিয়ের দিন হারাধনকে যেতে হবে। সেই মেয়েপক্ষের পরামাণিকের কাজ করবে। পূর্ণ বলে দিয়েছে সে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে। আর হারাধনের জন্যেও কোনো ভাবনা নেই। চাটুজ্যেরা হল পুরনো যজমান। পাওনা গণ্ডাও মন্দ হয় না।

চাটুজ্যের লোক চলে যেতে হারাধন কাজ থেকে ফিরল। হাসি মুখ।—দিমা আর ভাবনা নেই।

—কেন রে, কি হল ?

—কিছু টাকাব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—কোথেকে ?

—আমার কারখানাব এক দারোযান বলেছে পাঁচশো টাকা ধার দেবে। অবিশ্যি সুদ দিতে হবে।

—কিন্তু অতো টাকা শুধবি কি করে ?

—সে ঠিক হয়ে যাবে'খন। আগে তো মুলি বাঁশ দবমার একখানা ঘর তুলি। এভাবে কি আব বাস করা যায়।

—তা ঠিক। ছেলেপুলেগুলো যে ঠাণ্ডায় আউসে গেল।

দিনমণি কোথা থেকে একটা কুকুবছানা নিয়ে এল। সবে চোখ ফুটেছে। কুতকুত করে তাকায আব কুঁইকুঁই শব্দ কবে। কাজলী রাগ কবে বলে—একে মানুষেব ঠাঁই হয় না তাব মধ্যে এই জন্তু জানোযার ! দূর করে দে।

পুতি কুকুর ছানাটি বুকেব সঙ্গে সাপটে ধরে বলে—না। ও আমার কাছে শোবে।

হারাধন বলে—থাক না। পাতের দুটো ভাতটাত খাবে আবার পাহারাও দেবে।

—হ্যাঁ পাতে বোজ দুবেলা মুঠো মুঠো ভাত পড়ে থাকে।

কাজলী ঝাঁঝ মাবে। সে কথায কান না দিযে হাবাধন ছেলেকে ডেকে বলে—মাদী কুকুর নয় তো ?

নীলমণি ভাইয়ের হাত থেকে ছানাটা ছোঁ মেরে নিযে তাকে চিৎ কবে ধরে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—বাবা এটা ছেলে গো।

পূর্ণ ফিক্ করে হেসে সেখান থেকে সরে যায়।

রাত্রে তাঁবুর নিচে মানুষ পশু মিলে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম। পড়া মাত্র হারাধনের নাক ডেকে ওঠে। কত চিন্তা-ভাবনা মাথায় কিন্তু ঘুমোলে আর কোনো সাড় নেই। হারাধনের একপাশে ছোট ছেলেটা আর একপাশে কাজলী। কোলের

বাচ্চাটা অনেক রাত অবধি চকাস্ চকাস্ মাই টানে। এ পাশে আর দুই ছেলে আর একেবারে শেষকালে পূর্ণ। তার ঠিক পাশে শোয়া দিনমণির বুকে লেপ্টে থাকা কুকুরবাচ্চাটা কেবলই কাতরায়। মায়ের বুকের দুধের জন্যে কাঁদে। অনেক রাত অবধি কুঁতিয়ে কুকুরটা একসময় চুপ করে। ঠিক সেই ফাঁকে পূর্ণর একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘুম চটে যায় কি একটা শব্দে।! ভাল করে কান পেতে শোনে। হ্যাঁ, ঠিকই কাজলী আর হারাধন ফিসফিস করে কথা বলছে। হাঁসফাঁস নিঃশ্বাস পড়ছে দুইজনের। মাঝে মাঝে নাতি বউ খিক খিক হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। আর একটু পরে খুব সামলে বিচালি ঘসটানির শব্দ ওঠে। নাতি বউ গোঙায়, সঙ্গে কুকুর ছানাটাও কোঁত পাড়ে। কাজলী চাপা গলায় বলে—কুকুরটা শয়তান।

হারাধন জবাব দেয়—ঠিক আমার মত।

পূর্ণ কানে হাত চেপে পড়ে থাকে আর ভাবে এই তাঁবু যেন নতুন আশ্রয়দায়িনীর গর্ভ। তার মধ্যে স্থান পেয়েছে এই কটি মানুষ প্রাণী। বাইরে আকাশ হতে হিম ঝরে পড়ে ত্রিপলের মাথায়, মা জননীর জঠর ভিজে ওঠে। রসে টইটম্বুর হয়। যিনি গর্ভ ধারণ করে আছেন তাঁর অজান্তে এই অন্ধকারে চলেছে আর এক লীলা। যেচে আর একটি যন্ত্রণার নিমন্ত্রণ সারা হচ্ছে। গর্ভের মধ্যে আর এক গর্ভ ভরণের যোগাড় হচ্ছে। মেয়ের জাতটাই এমন। সে হাজার বার না হলেও কয়েকবার জানে যন্ত্রণার তাড়স কেমন। তবুও ভ্রমে পড়ে ডুবতে থাকে। ডুবতে ডুবতে ভাবে বাঁচব কেমন করে। কিন্তু তখন যে আর কিছু করবার থাকে না। আর শেষকালে যত জ্বালা যন্ত্রণা সব গিয়ে বর্তায় এই ধারণ করে থাকা মাটির। সকলে ঠেললেও তিনি তো আর সন্তানকে ফেলে দিতে পারেন না। অন্ধকার তাঁবুর নিচে সেই একই পালার গাওনা হচ্ছে।

ত্রিপল বেয়ে টুপটাপ হিম ঝরে পড়ে পূর্ণর কপালে। পূর্ণ কম্বলটি মাথা অবধি টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।

যে বৈশাখে দুই সখীতে সই পাতালো সেই বৈশাখেরই শেষের দিকে কিরণের বিয়ে হয়ে গেল। কথাবার্তা কবে যে শুরু আর কবে যে পাকা হল সেকথা পূর্ণ জানতেও পারেনি। কিরণও হয়তো জানতো না। জানলে কি আর তাকে না বলে থাকতো। কিন্তু যে সইয়ের সঙ্গে জীবনে মরণে এক থাকার বন্ধন সেই কিরণশশীর বিয়েতেই পূর্ণ মনে দাগা পেল। সে কথা মনে করলে আজও বুকটা

টনটন করে।

বিয়ের মাত্র সাতদিন আগে পূর্ণ জানতে পারল সইয়ের বিয়ে হচ্ছে। প্রথমে কথাটা মায়ের মুখে শোনে, পরে কিরণেব কাছে। কিরণ এমন করে খবরটা বলে যে পূর্ণ অবাক না হয়ে পারে না। যে বাড়িতে সে এতকাল মানুষ সে বাড়ি ছেড়ে যেতে যেন কোন দুঃখ নেই কিরণের। হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করে তার হবু শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। বরের একটু বয়েস বেশি কিন্তু দেখতে নাকি কন্দর্পকুমার। তার ওপর গুপ্তিপাড়ার জমিদার বংশ। মস্ত তালুক আর খাসমহলের মালিক। কিরণের বাবার মতন ছোট জমিদার নয়। পাইক, বরকন্দাজ, গোমস্ত' সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। দুটি হাতি আছে আর আছে দশ বারোটি ঘোড়া। ছেলে নাকি নৌকায চেপে এপার থেকে ওপারে হাতিতে গিয়ে উঠবে বউ নিয়ে। সঙ্গে বাজবে ইংলিশ বাজনা—আরো কতো কি! গ্যাসের আলোয় পথঘাট দিনের বেলা মনে হবে। বিয়ে না হতেই কিরণ শ্বশুরবাড়ির গর্বে একেবারে মট মট করে। পূর্ণ শোনে আর ভাবে কি করে সইয়ের মন আগে থাকতেই অমন বদলে যায়। মুখে যে আব কোনো কথা নেই। কেবল বিয়ে আর স্বামীব ঘরেব কথা। এমন আদেখলাপনা দেখে যে একটু রাগ হয়নি তা নয় কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনি পূর্ণ।

কিরণেব বিয়ের আগের দিন বিকেলে কাকা রামকৃষ্ণ এসে পড়ল। মা লোক মারফৎ খবর দিয়েছে। বাবার বদলে নাপিতের কাজ করবে কাকা আর নাপতেনির কাজ উদ্ধার করবে মা-মেয়ে। জমিদার বাড়ি লোকে জনে, আত্মীয়স্বজনে গম গম করছে। বাড়ির কলি ফেরানো হয়েছে, নতুন করে রঙ পড়েছে। মেয়েব কাকা, মামা, মাসী পিসীতে বাড়ি বোঝাই। গোলাবাড়ির কোণে ভিয়েন বসেছে। আজ তিনদিনধরে চন্দননগরের হালুইকর ঠাকুর তার লোকলস্কর নিয়ে এসে কাজে বসে পড়েছে। আটখানা ভাঁটার মতন উনুন নাগাড়ে জ্বলছে আর তাতে হাঁড়ি কড়া চেপেই আছে। সারা বাড়িতে আনন্দের কলসি উপুড়।

কিরণশশী বলেছে—আমার নাপতেনীর কাজ করবে পুণ্য।

নাপতেনী কথাটা সইয়ের মুখে এই প্রথম শুনল পূর্ণ। মুখে দইখইয়ের দাগ মিলিয়ে সইয়ের ঠোঁটে কি করে নাপতেনী কথাটি জেগে ওঠে পূর্ণ কিছুতে বুঝতে পারে না। তাহলেও পূর্ণ সে কথা নিয়ে মুখে কিছু বলেনি। কেবল মনে মনে একটি ঘোঁট গড়ে ওঠে। মায়ের সঙ্গে যজমান বাড়িতে গেলে নাপতেনী এয়েছে এই বাক্য তো আকছার শুনতে হয়। এ আর নতুন কি। কিন্তু কিরণের মুখে কথাটি কেমন বেমানান হয়ে বেজে ওঠে। রাতে শুয়ে মাকে বলে পূর্ণ—সই

আমাকে নাপতেনী কেন বললে মা ?

মা বলে—দুঃখ করিস না। গরু হারালে অমনধারা হয়।

সন্ধ্যা ঘনাবার আগে পূর্ণ মায়ের সঙ্গে বাগানে এল। কাল বিয়ে। তাই আজই সব যোগাড় করে রাখতে হবে। বিয়ের যোগাড় তো কম ঝক্কির না। বড় কূটকচালে কাজকর্ম। পান থেকে চুন খসলে অনর্থ। প্রথমে গুণে গুণে এগারোটি ধুতুরা ফল পাড়া হল। প্রতিটি ফল দুই খণ্ড করে কেটে তার বিচি ফেলে দিয়ে একুশটি প্রদীপ তৈরি করা হল। তারপর একটি নিমুখো গাছের আংটি করা হল। এটি বর আঙুলে পরবে। এ আংটি হল শুভ। যে পরে কেউ তার মন্দ করতে পারে না। এরপরে রাংচিতার বেড়া থেকে কেটে কেটে একুশটি চিতের কাঠি প্রস্তুত করা হল। এই চিতের কাঠিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে তেলে ভিজিয়ে এয়োরা বরের চারিদিকে ঘুরবে—বর বরণের সময়। বরণের সময় প্রথমে এয়োদের মাথায় কুলোয় চেপে যাবে ঐ একুশ ধুতুরার প্রদীপ। তার পিছনে চিতের কাঠি নিয়ে আর একদল আর শেষকালে যাবে কুলোয় সাজানো ছিরির বরণডালা। এই সমস্ত নিয়ে এয়োরা বরকে মাঝখানে রেখে সাতপাকে ঘুরবে। তারপর ঐ ধুতুরার কুলো বরের মাথা টপকে ওপাশে ফেলতে হবে আর সে পাশে দাঁড়িয়ে পরামাণিক সেটি ধরে নেবে। পরামাণিক অমনি কুলোর আগুন দূরে ফেলে দেবে। এই পর্যন্ত বরণের আসরে পরামাণিকের কাজ। তারপর আবার ছাদনা তলায়। পূর্ণ আর মা নিভাননী এই সমস্ত দ্রব্য ঠিক মতন গোছ করে রাখে।

রাত পোহালে কিরণশশীর বিয়ে। বার মহলে ঘরের মেঝেতে মায়ের পাশে শুয়েপূর্ণ উসখুশ করে। চারপাশে এতো শব্দে ঘুম আসতে চায় না। কাকার নাক বাজছে ওপাশে। মা-ও ঠাণ্ডা। পূর্ণ জেগে শোনে ভিতর মহলে ভিয়েনের তদবির হাঁকডাকা। মানুষজনের ব্যস্ত ছোটাছুটি। আনাগোনা। শামিয়ানা খাটানোর পর শেষবারের মতন তদারক চলছে। শিলনোড়ার ঘটঘটাং, পড় পড় করে কলার পাতা চেরার শব্দ। মা মেয়ে মিলে সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে। বস্তা উপুড় করে আলু ঢেলে কুটেছে, চুবড়ি চুবড়ি পান সেজেছে, বিয়ের দানের বাসনপত্র গোছ করে সাজিয়ে রেখেছে—এমনি কতো কাজ। আর এতো কাজের পরেও দুপুরে নিজের ঘরে এসে চাট্টি মুড়ি জল খেয়েছে। রাতে ভাত আর আলুসেদ্ধ।

সন্ধ্যার পর পূর্ণ একবার কিরণের ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। মেয়ের কাকীমা বলেছে সে এখন ঘুমোচ্ছে। কাল অনেক সকালে উঠতে হবে যে।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে পূর্ণ শোনে ও বাড়িতে শাঁখ বাজছে। উলু পড়ছে।

দধিমঙ্গল হচ্ছে কিরণের।

দিন এল। রাত হল আবার। কিরণশশীর বিয়ে হয়ে গেল। লোকজন হৈহৈ করে খেল। পূর্ণ আর তার মা প্রাণপাত খাটল। কিন্তু তারা ও বাড়িতে দাঁতে কাটল না কিছু। পূর্ণ বুঝতে পারেনি প্রথমে। মা ডেকে বলে—আমরা এখেনে খাবো না। ঘরে ভাত ফুটিয়ে নেবোখন।

—কেন মা ?

মা একটু চুপ করে থেকে বলে—আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি মা।

পূর্ণ বুঝতে পারল জমিদার বাড়ি থেকে কেউ তাদেব খেতে বলেনি। মায়ের মানের জ্ঞান বড় টনটনে। পেটে ভাত না থাকলেও কখনো হাত পাতে না। সত্যি তো, কিরণও তো একবার বলতে পারত। সেও তো কিছু বলেনি। সত্যি মেয়ের গরু হারিয়েছে। তাহলেও পূর্ণ মাকে বলেছিল একই তো বাড়ি, আলাদা করে না বললে আর কি দোষ আছে। মা বলে আর সকলের বেলায় যদি দোষ হয় তো তাদের কাছে একবার মুখ খুলে বলতে কি হয়। যে মানুষের নিজের মান জ্ঞান আছে,সে যে অপরের মানও দেখে। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ হয় না। কাকা রামকৃষ্ণ কাজকর্ম সেরে পাওনা বুঝে নিয়ে বাতেই ফিরে গেছে। যাবার সময মার হাতে একটি টাকা দিতে এসেছিল পাওনা হিসাবে। মা নেয়নি। বলেছে—ওরা ভাবতে পারে নাপিত বিদেয়। কিন্তু পূণ্য যে তার সইয়ের দায় তুলেছে। এখেনে টাকা পয়সা কোত্থেকে আসে ঠাকুরপো।

পরদিন সকাল হতে বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুববাড়ি। বাইবে ঘোড়াব গাড়ি প্রস্তুত। কচুয়ান গাড়োয়ানরা রওয়ানা হবার আগে সব দই মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বসেছে। এখান থেকে ত্রিবেণীর খেয়াঘাট। সেখান থেকে নৌকা। কিরণশশী স্বামীর সঙ্গে বাপের ঘর ছাড়বে।

পূর্ণ একলা একলা বাগানে বেড়ায় আর আপনমনে কাঁদে। পুকুরঘাটে চাতালে বসে সেই প্রথম দিনকার দুপুরের কথা মনে পড়ে যায়। কাঁইবিচি নিয়ে জোড-বিজোড় খেলা, কচুপাতা ভেঙে ফটাস্ খেলা, পুতুলের বিয়ে—সব মনে পড়ে। কিরণ কি এসব কথা একবারও ভাবছে, তার কি একবারও মনে পড়ছে তার কথা ভেবে একজন পুকুরঘাটে চোখ মুছছে আর মুছছে। সে তার জন্মের সই, ধর্ম সাক্ষী কবা সই। কোথায় গেল সেই ধর্মসাক্ষী করা শোলোক, সেই হাতে হাত পেতে জীবনের জন্যে ভালবাসার গাঁটছড়ার বাঁধন। আর একজনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেই কি আগেকার বাঁধন ভুল হয়ে যায়। পূর্ণর মনে পড়ে সই মরলে পরে তেরাত্তির অশৌচ হয়, সইয়ের মন্দ হলে নিজেরও মন্দ হয়। সইয়ের আনন্দে তারও আনন্দ। কিন্তু আজ যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। এত বড়

আনন্দের হাট বসলো, এতো বাজনা বাজলো, বাজি পুড়লো, মানুষজন হাত ডুবিয়ে খেল—আর এদিকে ঘরের কানাচে বসে ধর্মের সই তার মায়ের পাতে পেসাদ পেল প্রদীপের আলোয় বসে, কেউ একবারও দেখেও দেখে না। তাহলে আর কিসের এতো সই পাতানোর ঘটাপটা। কি জানি। আবার এও মনে হয় মাও কি একটু বেশি করল না। না বললেই বা। একটু নিজের মতন কি মনে করা যেত না। তাহলে কি আর দুঃখে মন পুড়ে খাক হতো। কে জানে। পূর্ণর হঠাৎ মনে পড়ে যায় মা বলে দিয়েছে কিরণ চলে যাবার আগে তার হাতে নতুন কাপড় মিষ্টি তুলে দিতে হবে। তাঁতিবাড়ি থেকে মা একখানি ডুরে শাড়ি এনে রেখেছে, সঙ্গে এক হাঁড়ি মিষ্টি। চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পূর্ণ।

পূর্ণকে দেখে কিরণশশী আঁচলে মুখ ঢাকলো। হাত দিয়ে মুখ চেপে মাথা হেঁট করে। বেনারসীতে মোড়া শরীরটা থরথর করছে। পাশে বসে বর, মিটি মিটি হাসছে। পূর্ণ এই ফাঁকে ভালো করে সইয়ের বরকে দেখে নিল। দশাসই চেহারা, মাথায় চকচকে টাক, গালের চামড়া থলথলে আর এই পাকানো গোঁফ। তবে গায়ের রঙটি ধবধবে। প্রায় পূর্ণর কাকার বয়সী হবে। জমিদারের ছেলের হয়তো অমন বাড়ন্ত চেহারা হয়। পাশ থেকে এক ঠানদি মস্করা করে বলে—ওরে তোরা শোন্। একটা কতা বলি।

মেয়েরা কি কি করে ওঠে।

ঠানদি বরের থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে—গুপ্তিপাড়ার মাটি বাঁদর গড়ে খাঁটি। ঠানদির কথা শেষ হতে না হতে বর বলে ওঠে—হ্যাঁ, আমিও জানি।

—কি জানো মানিক ?

—কেন, কাঙাল বাঙাল খদ্যে তিন নিয়ে নদ্যে।

আসরময় হাসির ধুম পড়ে যায়। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, কেউ আবার কিরণের পিঠে খোঁচা মারে। বরের হাত টেনে নিয়ে কিরণের কোলে চেপে ধরে। পূর্ণর কিন্তু হাসি আসে না। এ তো আমোদ মস্করা ছাপিয়ে তার বুকটা টন টন করে। চোখ ছাপিয়ে জল আসে যতই কিরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কান্নার জোয়ারে টেনে আসে সেই দিনকার সই পাতানেব হাসি, মিষ্টি মুখ। সেদিন সকালবেলাকার ঝকঝকে রোদ আর জমিদারবাবুর সেই কথা—ধর্মসাক্ষী করে সই পাতানোর মান যেন থাকে।

কিরণ আর একবারের জন্যেও মুখ তোলে না। পূর্ণ আঁচলের নিচ থেকে কাপড়খানা আর মিষ্টির ছোট হাঁড়িটি কিরণের সামনে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

কিরণশশী চলে গেল। গ্রামের পথে ইংলিশ বাজনা বাজতে বাজতে দূরে

মিলিয়ে গেল। সহিস কচুয়ানের হাঁক ডাক আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ সে বাজনার সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে গেল। গাড়ির পিছনে গ্রামের কুকুরের পাল অনেকদূর অবধি দৌড়ে গেল। সমস্ত জমিদার বাড়ি নতুন করে কান্নায় আছড়ে পড়ল।

গত রাত্রে যেখানে বিয়ে হয়েছিল সেই বাসি ছাদনাতলায় একা একা ঘুরে বেড়ায় পূর্ণ। মা বলে বিয়ে ফুরোলে ছাদনাতলায় লাথি। সত্যি তাই। চার কোণে চার কলা গাছ হেলে পড়েছে। পাতা নেতিয়ে গেছে। ঘটের ডাব মাটিতে গড়াগড়ি। চারপাশে চাল, ঘি, সিন্দুর, আর ফুলের পাপড়ি ছড়ানো। মাঝখানে কুসুমডিঙার নেভা হোমকুণ্ড। পোড়া ছাইকাঠের মধ্যে কালোবরণ আধপোড়া কলাটি চেয়ে আছে এখনো। আলপনার চিত্রবিচিত্র পায়ে পায়ে উঠে গেছে। চারধারে লাল পিঁপড়ে থিক থিক করছে। এদিকে এক ঝাঁক উড়ো চড়াই নেমে এসে ধান-চাল খুঁটছে আবার হুস করে উড়ে যাচ্ছে। এ সবের মাঝখানে একটু তফাতে কতো যত্নের তৈরি ধুতুরার একুশ প্রদীপ যেমন তেমন ছিটিয়ে পড়ে আছে। কাল যা মাথায় ছিল আজ তা মাটিতে। মাথায় নিতে যতক্ষণ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতেও ততক্ষণ। সমান করে কাটা চিতের কাঠির গোছা পোড়া মাথা নিয়ে এদিক সেদিক পড়ে আছে। কেবল নিমুখো গাছের আংটিখানি কোথাও পড়ে নেই। বরের হাতে আছে তো? থাক থাক বরের হাতেই থাক। কেউ ভাল-মন্দ করতে পারবে না। আর তাতেই সইয়ের ভাল হবে, সুখী হবে। সংসার আলো করে থাকবে চাঁদের মতন। কাঁচরাপাড়ার মাটির শশী গুপ্তিপাড়ার জমিদারবাড়ি আলোয় আটখানা করে ভাসিয়ে দেবে।

রাত থাকতে উঠে পড়ে পূর্ণ। ভোর বেলাতেই মন্দিরে যেতে হবে। তার আগে স্নান, শুচি হওয়া। ত্রিপল সরিয়ে বাইরে বেরোতে গিয়ে আড়চোখে দেখে হাবাধন আর নাতি বউয়ের মাঝখানে ছোট্ট মেয়েটার কোলের কাছে কুকুর ছানাটা উঠে গিয়ে শুয়েছে। সারা রাতের কৌতানি জুড়িয়েছে, এখন বেশ নিশ্চিন্ত আরাম। তিন পুতি একটি কম্বলে। আর একটিতে নাতি তার বউ, কোলেরটা, মেয়ে বাদলী আর ঐ ছানাটি। সে কেবল বাইরে। মাথার কাছে রাখা গামছাখানা টেনে নেয় পূর্ণ। একটু তেল পেলে হতো। অন্ধকারে হাতড়ে আর কি করবে। তাই নিতেলা স্নানই সই।

পুকুর-ধারে দাঁড়িয়ে ছাই দিয়ে মাড়ি আর দু-পাঁচটি নড়বড়ে দাঁত মাজতে মাজতে পূর্ণ তাকাল সামনে। ওপারে গাছপালা, লম্বা টানা লতার গুচ্ছ সবই কুয়াশার ভিতরে। পুকুর যেন ফুটছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশমুখো। ধোঁয়ার আণ্ডিল গিয়ে মিশছে ওপরের ঐ ভারি কুয়াশার রাজত্বে। একটু দূরে অস্পষ্ট

আকাশে গিঁথে রয়েছে মন্দির চূড়া, মাঝখানে গোলাকার চক্রের মতন আর দুই পাশে ধাতুর তৈরি স্থির পতাকা। আলো আঁধারে এখনকার ঐ মন্দির চূড়া রহস্যময়। দূর হতে অচেনাজন যেন, কি এক আশ্চর্য ধ্যানে ডুবে আছে। নিস্তব্ধ আকাশের নিচে যেখানে এখনো কোনো সোরগোলের দাগ লাগেনি। মন্দিরের পিছনে আকাশ সামান্য ফিকে হয়েছে। ঠিক আলো নয় যেন আলোর মতন। এই বুঝি চোখ মেলবার উদযোগ হবে সারারাত্রি নিদ্রার পর। দুই একটি করে পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে। ঘুমের আবুল্লি কাটাতে গাছপালা ডালপালা মটকে আড়মোড়া ভাঙছে। এ সময় সমস্ত পৃথিবী শান্ত অচঞ্চলা থাকেন। তাঁকে ঘিরে উত্যক্ত করবার কেউ নেই এখন। তাঁর মনটিও এখন গাঢ় থাকে, মনের ওজন থাকে। তাঁর কাছে এ সময় কোনো কথা রাখলে তা ফেলনা হয় না। পৃথিবী কান পেতে শোনেন মানুষের নিবেদন।

মুখ ধোয়া শেষ করে পূর্ণ জলে পা রাখল। মাথায় জলেব ছিটে দিয়ে বলল—গঙ্গা গঙ্গা।

মনে করলে যে কোনো জলই তো গঙ্গা। গঙ্গা মনে বনে সবখানে। মন টানলেই গঙ্গা উজিয়ে চলে আসেন যেখানেই থাকুন না কেন। তাই তো মনে মনে অনবরত চলে এই গঙ্গাস্নান। প্রার্থনা চলে—উদ্ধার করো, মঙ্গল করো, শান্তি দাও। যেন আনন্দে বাস কবতে পারি। মনের জ্বলন পোড়ন যেন দূর হয়ে যায়, কারো জন্যে যেন ভিতরে কোনো কাঁটা বিঁধে না থাকে। প্রার্থনা ভেসে চলে নদী বেয়ে সাগরে। আবার ঢেউয়ে ঢেউয়ে জোয়ারভাঁটায আব একটি নিবেদন ধেয়ে যায়। নদী কখনো প্রার্থনা ফেরত পাঠায় না। মানুষের দুঃখ তাপ বুক পেতে নিতে তার কোনো ওজর নেই। সে তো দেহ পেতেই রেখেছে, তোমাব ক্ষমতা থাকে বাসনা থাকে দাও। যতো পারো দাও, মনে কোনো খামতি রেখো না। কেননা দেবতার কাছে মানুষের প্রার্থনা পৌঁছয় কিনা তা তো আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নদীতে একটি ফুল ফেললে তার ভেসে যাওযা যে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় আমার নিবেদন কোন খাতে বইছে। ফুল ভেসে যায়, জীবন বহে যায়, কিন্তু নদীর কাছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা কখনো বিফলে ভেসে যায় না।

কুয়াশার সমুদ্র দুই হাতে সরিয়ে চোখের ভিতরে সেই প্রার্থনার নদী এঁকে অনন্ত ধোঁয়ার মধ্যে ডুব দেয় পূর্ণশশী।

পৌষ পার হয়ে মাঘের দুয়ারে হানা। যমের দক্ষিণ আগল বন্ধ হল। পূর্ণ মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান করে ভাবল এ বছরটা গেল। পা টেনে টেনে এ শীতটাও পার করা যাবে। কিন্তু দিন যেন আর কাটে না। বলতে গেলে শীতেব পাহাড় মাথায় করে পার করতে হল। বোঝা বড়ো কঠিন। কিছুতেই আর পথ ফুরোয় না। কিন্তু পথ তো আর অনন্ত না। এক সময় না এক সময় তো শেষ হবেই। তাই পৌষের মাঝ মাসে হারাধন টাকা যোগাড় করেছে। তাই দিয়ে দরমা, বাঁশ, তার এই সমস্ত কিনেছে। এমনকি দুটি মুনিষ লাগিয়ে একখানি মুলি বাঁশ আর দরমার ঘর তুলেছে। তার পাশ কামড়ে তিন হাত উঁচু রান্নাঘর গুঁড়ি মেরে সেঁধোতে হয়। বসে বসে রাঁধন বাড়ন। নীলমণি সামনের মাস থেকে বাগের মোড়ে একটি চায়ের দোকানে কাজ করবে বলে পাকা কথা হয়ে গেছে। সকাল-বিকেল চা জলখাবার আর মাস ফুরোলে তেইশ টাকা করে বেতন। আসছে, সুদিন আসছে। দুঃখের তো একটা সীমা আছে। পৃথিবীতে সব সময় কি, আর রাত্রি, একসময় না একসময় দিনমান তো আসে। তবে হ্যাঁ, এই এখনটিকে পরিষ্কার ফটফটে দিন বলা যায় না। সবে ভোব হল বললে বুঝি ঠিক বলা হল। আস্তে আস্তে দিন ফুটে উঠবে। ততদিনে হযতো পূর্ণব পাপড়ি ঝরে যাবার পালা শেষ।

তিনদিন আগে থাকতে পূর্ণ সুবর্ণপুরে অবিনাশ চাটুজ্যেব বাড়ি গিযে উঠেছে। কাল তেসরা মাঘ। গোধুলি লগ্নে মেয়ের বিয়ে। কাল বিকেলেই হারাধন এসে পড়বে। পূর্ণ এবারে একলা আসেনি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মেজোপুতি দিনমণিকে। সকলকে তো আব আনা যায না। চক্ষুলজ্জা বলে তো একটি ব্যাপার আছে। বিয়েবাড়ির লোকজন..আত্মীয়স্বজন যখন সকালে জলখাবার খেতে বসে পূর্ণ তখন পুতিকে এনে ঠিক সেই পংক্তিতে বসিয়ে দেয়। দিনমণি লুচি বোঁদে চেটেপুটে খায। দুপুরবেলা নিজের পাতের পাশে টেনে বসায়। আড চোখে দেখে বড়ো দাগা মাছটি ঠিক পড়ল কিনা তার পাতে। না পড়লে হেঁকে বলে—অ বাবা বড়ো খোকা, আমার এই পোঁটার পাতে আর একখানা দে না বাবা। বড়ো খোকা মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে না। আড়ালে গজ গজ করে। কখনো বা বলে—ওরে ও সোনা, আর এক চামচে দই দে না বাবা। এতে তোদের কমে যাবে না। বাড়বে, আরো বাড়বে। শত কাজের মধ্যে থাকলেও পূর্ণর একটি চোখ সব সময় দিনমণির দিকে। রাতে শুয়ে কাঁথার ভিতর থেকে চারটি আনন্দনাড়ু বার করে তার মুখে গুঁজে দেয়। ছেলে তখন

ঘুমিয়ে কাঠ। কিছুতেই হাঁ করে না। পূর্ণ তার গালে ঠেলা মেরে বলে—খেয়ে নে এই বেলা। কাল আর একটাও পাবিনি হুঁ। কাঁথার তলায় পুতির মুখে কট কট লাড়ু ভাঙে। পুতি বলে—তুমি খাবে না বড়ো মা ? মুখ পাকলে পাকলে নিরেট লাড়ু জব্দ করতে করতে পূর্ণ বলে—আমার কি আর তোর মত দাঁত আছে। সকালবেলায় মটরশুটির ডাঁই ছাড়াতে বসে এদিক সেদিক দেখে পুতির জামার কোঁচড়ে এক মুঠো ভরে দেয়। ছেলেটা পড়ে পড়ে তাই চিবোয়।

বিয়ে হচ্ছে নৈহাটিতে। একটু বেলায় গায়ে হলুদ এসে পৌঁছল। পূর্ণ আর সকলের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে মাছ মিষ্টি আর সব সামগ্রী ঘরে তুলে দিল। সন্দেশের থালায় প্রকাণ্ড রঙিন প্রজাপতি দেখে দিনমণি আঁচলে টান দেয়। পূর্ণ ধমক মারে—বড্ড নোলা তোর। মুখে বকলেও মনে মনে তাল করে রাখে সুযোগ মতন প্রজাপতির পাখনা থেকে একটু ভেঙে নেবেখন। মেয়ের মা আগে থেকেই বলে রেখেছেন পূর্ণকে—তোমাকে কিন্তু ফুলশয্যের তত্ব নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে অবিশ্যি আরো লোক যাবে। পূর্ণ জানে এ কাজে তারও ভাগ আছে। সে বাড়ি থেকেও কিছু পাওনা থোওনা হবে।

সই কিরণশশীর বিয়েতে প্রথম যে যোগাড় যন্তরের পাঠ শুরু আজও তা চলেছে সেই একই ভাবে। একুশ ধুতুরার প্রদীপ, চিতের কাঠি সব সাজাতে ভুল হয় না। সব কিছু সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে নাতির অপেক্ষায়। সকালবেলা মেয়ের বড় বোন আর ভগ্নীপতি মিলে শিলনোড়ায় হাই আমলা বাটল। পূর্ণ সেই সময় তাদের মাথায় ছাতা খুলে ঘোরাল। হাই আমলা বেটে একুশটি পানের মধ্যে একুশ ভাগ করে সাজা হল। তারপরে সেগুলি কুলোয় রাখা হল। সকাল বেলায় এই পর্যন্ত পূর্ণর পর্ব। আবার যা কিছু সন্ধ্যায়। করবে হারাধন ধরিয়ে দেবে সে।

সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে আরম্ভ। বর বরণের তোড় জোড় হচ্ছে। চিতের কাঠি ইত্যাদি সাত পাক ঘুরে গেল। বরের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কুলো বার করে নেওয়া হল। তারপর সেই কুলো বরের সামনে পেতে দেওয়া হল। তার ওপর পা রেখে কনের মা বরণ করবেন। বরণের আগে কুলো থেকে সেই হাই আমলা দেওয়া এককুড়ি এক পান কনের মা বরের মুখের সামনে একটি করে ধরে আর দুই পাশে ফেলে দেয়। পূর্ণ পিছনে দাঁড়িয়ে সমস্ত বলে দেয়। বিয়ের সময় যেমন পুরুত ঠাকুর তেমনি স্ত্রী আচারের পুরোহিত যে সে। সে না থাকলে সব যে অন্ধকার। আজকালকার মেয়ে বউরা এতো সব আচার-অনুষ্ঠান কি কিছু জানে। জানবে কি করে। ঈশ্বর গুপ্তর সেই পদটির কথা অমনি মনে পড়ে যায়। তিনি তখনকার মেয়েদের কথা বলছেন—এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে সাঁজ

সেঁজোতির ব্রত পাবে ?/সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে পিঁড়ি পেতে আর কিখাবে ?—সত্যি তাঁর চোখ ছিল।

বর বরণ আরম্ভ হল। একে একে জলের বরণ, পান-সুপারির বরণ, ছিরির বরণ, প্রদীপের উত্তাপের বরণ শেষ হল। এয়োরা উলু দিল, শঙ্খ বাজলো। যে পিঁড়িতে বর কনে বিয়ে করতে বসল সে দুটিতে পূর্ণরই কাঁপা হাতে আলপনা আঁকা। আজকালকার মতন দোকান থেকে রঙ করা পিঁড়ি নয়। সে থাকতে ভাবনা কি। বিয়ে শুরু হল।

হারাধন আজ আর জামা প্যান্ট পড়ে আসেনি। দিদিমার একখানি তোলা ধুতি ছিল তাই পরেছে। গায়ে জামা আর তার ওপর এণ্ডির চাদর। মিলে খাটা চটকলি বাবু মহাশয় না, এখন সে পুরোদস্তুর নরসুন্দর। কেবল যা নিজে দাড়ি কামায়নি। পূর্ণ কানে কানে বলে দিয়েছে—ভয় নেই। আমি তোর পেছুতেই আছি।

কনেকে নিয়ে আসা হল পিঁড়িতে বসিয়ে। মাথা হেঁট, বেনারসী আব চেলি মুকুট। গলায মালা। চারজনে মিলে বয়ে আনছে। দুই পাশে দুই ভগ্নীপতির কাঁধে হাত। পূর্ণ হাঁ হাঁ করে ওঠে। ওবে ওরে, মেয়েব চোখে পান কই ?

মেয়ে অমনি তাড়াতাড়ি দুই চোখে পান পাতা চাপা দেয। ভুল হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণ বলে—গোড়াতেই এতো ভেম হলে কি চলে মা ? এব পরে যে গোটা জীবন পড়ে আছে।

সাত পাক ঘোরানো শেষ। এবাব ববের মুখোমুখি কনে। মেয়ের মুখ হেঁট কিন্তু বর বাবাজী ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে। এ যেন সেই কাঙালের হয়েছে ঝারি, সাতে বাপ পোয়ে নেচে মরি। কে একজন ফুট কাটে—চোখ গেল, চোখ গেল।

বর মুচকি হেসে মাথা নামায়। পূর্ণ হেঁকে বলে—কই গো, বর কনেব মাথায় বস্তর দাও। শুভদৃষ্টি হবে যে।

নতুন কাপড পড়ল বর কনের মাথা বরাবর। পূর্ণ অমনি গুটি গুটি নাতির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর নাতিব কোমরে ছোট্ট একটু খোঁচা দিল। অমনি হারাধন গলা তুলে শির ফুলিয়ে ফুকরে উঠলো—

শুনুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন
কিঞ্চিৎ বিবাহের কথা করাবো শ্রবণ
দশরথ বরকর্তা কিবা শোভা পায়
কন্যাকর্তা সীতার পিতা যেন জনক রায়
বর লয়ে বরযাত্র অযোধ্যা নিবাসী

উপনীত হলেন সবে জনকালয়ে আসি
শুভদিনে শুভযোগে শুভকর্ম ধরে
মনের সাধে পুরোহিত ঠাকুর শুভকর্ম সারে
বিবাহ প্রায় হল সাঙ্গ শুনুন বিবরণ
হরিষ মনে উলুধ্বনি দিন সর্বজন
যতো আছেন এয়ো নারী, দাঁড়ান সবে সারি সারি
কিঞ্চিৎ তফাতে থাকবেন দোজ বেরে নারী
ছাউনি নাড়া মজার কথা, ছেড়ে দাও চালের বাতা
কে আছেন ভাল মন্দ লোক—সরে যান
নইলে শুনবেন পাঁচ কথা, খাবেন ভাতার পুতের মাথা
রাঁড়ের মতন হাত হবে, এক খুঁচি চাল ছয় মাস খাবে
দুই চক্ষুর মাথা খাবে, জোড়া ভাতারের মাথা খাবে
কল্লে পরের মন্দ, দুই চক্ষু হবে অন্ধ
ইতি হারাধন পরামানিক করে ব্যাঙ্গ
বিবাহ প্রায় হল সাঙ্গ
তাইরে নাইরে না, দুজনে একবার ভাল করে চেয়ে দেখো না ॥

শুভদৃষ্টি হল। সকলে মিলে হৈ হৈ করে উঠলো। ঘন ঘন শাঁখ বাজলো, উলু পড়ল। কে একজন বলল—সব তো বুঝলাম। তা এখানে চালের বাতা এল কোথা থেকে অ্যাঁ ?

হারাধন আমতা আমতা করে। কি বলি কি বলি ভাব। এবার বুঝি পরামাণিকের পো জব্দ। পূর্ণ তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে সামনে চলে আসে—আমি বলি শোনো। ঐ যে তোমরা সব বরকনের শুভদৃষ্টি দেখবে বলে মাথার ওপরে ফেলা বস্তর তুলে ধরে উঁকি দিচ্ছো। সেই বস্তরটি হল চালের বাতা বুঝলে।

এর পর বিবাহ। মন্ত্র পাঠ আর সব অং বং চং-এর ব্যাপার। এখানে এসে পূর্ণ খানিক দম নেবার যো পায়। একটু দোক্তা পান মুখে দেয়। হারাধনও দূরে বসে জিরোয়। আবার গাঁটছড়া বাঁধার সময় তার আগমন। কনেকে বরের ডান দিকের পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে বামে বসানো হল। ঠিক তখনি হারাধন দুইজনের মাঝখানে বসে বাঁধা গাঁটে হাত রেখে বলে ওঠে—আপনারা সব শুনুন গো। এবারে গৌরবচন বলি।

সকলে তাকালো। না জানি আবার কি গাল মন্দ হবে। পরামাণিকের মুখের গালাগালা যে বড়ো মিঠে। হারাধন বলে—

ডাইনে থেকে বাঁয়ে এল
শিব দুর্গার মিলন হল
গৌর গৌর গৌর।

রাত্রে হারাধন ফিরে গেল ছেলের হাত ধরে। হাতে ছোট হাঁড়িতে সামান্য কিছু মিষ্টি মাষ্টার ছাঁদা। আর থলিতে পাওনা-গণ্ডা। আর একটি ছোট ঠোঙায় সেই রঙিন প্রজাপতির আধখানা ডানা আর একটু শুঁড়। পূর্ণ বলে দেয় ছেলেপুলেদের যেন মিষ্টি ডানা শুঁড় ভাগ করে দেওয়া হয়।

অনেক রাত্রে বাসর ঘরে গান জমে। বাইরে শামিয়ানার নিচে বেঞ্চি জুড়ে হালুইকর ঠাকুর পড়ে পড়ে নাক ডাকায়। আর এক পাশে চেয়ার পেতে বসে মেয়ের বাবা চাটুজ্যেকর্তা। একা একা বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন। চোখ শূন্য, মুখে নিশ্চিন্ত ছায়া। জেনারেটর ভট ভট করে। মাইকের গান জুড়িয়ে যায়। বারান্দার এক ধারে মাদুর পেতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে পূর্ণ ভাবে একটা পর্ব মিটল। কিন্তু নিজের পর্ব তো মেটে না। এ যেন সেই মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব জুড়ে রয়েছে গৃহবাস, বনবাস, রাজ্যবাসের মতন এক একটি নতুন অধ্যায়। কেবল মহাপ্রস্থানে গমনের কথাটি এখনো তোলা আছে। সেটি যে কবে লেখা হবে কে জানে।

বৈশাখে সই কিরণশশী‹ বিয়ে হল। আর তারপরেই যেন জমিদার বাড়ি অন্ধকার। এক মেয়ের কিরণে দুইমহলা বাড়িটি আলো হয়েছিল। সে চলে গেল আলোটুকু সঙ্গে করে, পড়ে রইল রাজ্যের আঁধার। তারই মধ্যে জমিদার আর গিন্নী টিমটিমে প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকেন। হাসি নেই, হুল্লোড় নেই। সে সবের পাট যেন বিদায় নিয়েছে। কিরণের সঙ্গে এ সবই চলে গেছে। নিঝুম পুরী বুকে পাষাণ চেপে পড়ে রয়েছে। আত্মীয় কুটুম্ব তো আর রোজ আসে না। কালে ভদ্রে আসে আবার চলে যায়। কেউ এলে কর্তা গিন্নী সহজে যেতে দিতে চান না। কটা দিন থেকে যাবার জন্যে সাধ্য সাধনা চলে। কলকাতা থেকে ছেলে ললিত দুই তিন মাস অন্তর আসে। কিন্তু জমিদার বাড়ি আর ভাই বোনের খুনসুটিতে কল কল করে না। এদিকে গুপ্তিপাড়ার জমিদারদের আইন কানুন বড়ো কড়া। তাঁরা সহজে কিরণকে বাপের বাড়ি পাঠাতে চান না। তাই কিরণের বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই কথা উঠতে লাগল এখানকার পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় ছেলের সঙ্গে গিয়ে থাকবেন কর্তা-গিন্নী। পাইকপাড়ায় নাকি একটি বাড়ি কেনার তোড়জোড় চলছে। জমিদার কথা পেড়েছেন নিভাননী এই বাড়ি বাগান আগলে থাকবে। বাগানের ফল-ফুলুরি সেই বিক্রিবাটা করবে, ভোগ

করবে। সে যেমন বার মহলে আছে তেমনি থাকবে। কেবল ভিতর মহলে তালা পড়বে। নায়েব গোমস্তার ওপর সেই মহলটি দেখা শোনার ভার। নিভাননী এছাড়া মাসে পাঁচ টাকা করে জলপানি পাবে গোমস্তার হাত থেকে।

পূর্ণ কিছুদিন মনমরা হয়েছিল। এখন আবার একটি সখী যোগাড় হয়েছে। গাঙ্গুলীদের বাড়ির ছোট মেয়ে উমা, চোদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে পরিচয় মন্দিরে একদিন আরতির সময়। সেই উমাই এখন পূর্ণর মনের সই, খেলার সাথী। না, তার সঙ্গে আচার করে সই পাতানো হয়নি। কিন্তু তাতে কি। উমার সঙ্গে মনের মিল হতে সময় লাগল না। তার মনটি বড়ো সুন্দর। এই বয়সেই যেন কতোখানি বয়স্ পেয়েছে। কোনো জিনিসে লোভ নেই। পূর্ণর চেয়ে কিছু বড়ো বলেই সব সময় আগলে আগলে রাখে। পূর্ণর মন খারাপ লাগে একাদশীর দিন উমাকে নির্জলা উপবাস করতে দেখে। সারাটি দিন শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। গরমের দিনে তেষ্টায় ছটফট করে আর বার বার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয়। পূর্ণ একদিন উমাকে বলেছিল—জল খেলে কি দোষ হয়।

উমা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছে—বলতে নেই। আমার পাপ হবে।

কিন্তু উমার সঙ্গে আর বেশীদিন থাকা হল না। যে বৈশাখে কিরণের বিয়ে হল ঠিক তার পরের অগ্রহায়ণে পূর্ণর বিয়ের ফুল ফুটলো। কথায় বলে লাখ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না। কিন্তু এ বিয়ে যেন একটি কথাতেই হয়ে গেল। কথা পাড়া হল মাসের গোড়ায় আর তার নিষ্পত্তি হল মাস শেষ না হতে। ঠিক যেন সেই—ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

একদিন সকালবেলা উমা আর পূর্ণ মন্দির চাতালে বসে আছে। উমা যাঁতি দিয়ে হরতুকি কেটে কেটে একটি কৌটোয় রাখছে। ভাত খেয়ে মুখ শুদ্ধি করে এই দিয়ে। যাঁতি চলবার ফাঁকে ফাঁকে ছাতার মাথা নানা কথা হচ্ছে আবার রোদও পোহানো হচ্ছে। সামনের পথ দিয়ে মাঝে মধ্যে হাঁড়ি-পাতিল বোঝাই গরুর গাড়ি যায়। আবার কখনো সদ্য কাটা ধান বোঝাই গাড়ি। কনকনে উত্তুরে হাওয়ার মন্দিরের ছড়ানো উঠোনে শুকনো পাতা ওড়ে। ভোগের ঘরে বামুনঠাকুরের খুন্তি নাড়ার ঘটঘটাং শব্দ শোনা যায়। যিনি বামুন তিনিই পুরোহিত। পূজা পাঠ, ভোগ রান্না সব তিনিই করেন। কেবল পালা মোতাবেক সঙ্গে একজন করে যোগানদার পান। পূর্ণ আর উমা কথা বলছে এমন সময় নহবৎতলায় এসে দাঁড়ালো মা। তারপর কপালে হাত রেখে বলল—উমা।

পূর্ণ তাকালো। দেখলো মা একটি পরিষ্কার থান পরেছে। কোথাও যাবে

নাকি। উমা সিঁড়ি বেয়ে মূল ফটকের তলা দিয়ে নহবৎখানার নিচে মার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্ণ এখান থেকে বুঝতে পারছে না মা কি বলছে উমাকে। তবে দেখতে পাচ্ছে মা হাত নেড়ে নেড়ে কি বলছে আর উমা ঘন ঘন মাথা কাত করছে। মা চলে গেল। উমা হাওয়ার মুখে পড়া শুকনো পাতার মতন বলতে গেলে উড়ে এল নহবৎতলা থেকে মূল ফটক তারপর উঠোন ফেলে একেবারে পূর্ণর সামনে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে উমা। চোখের পাতা পড়ছে উঠছে আর নিঃশ্বাস পড়ছে লম্বা লম্বা।—কি রে, কি হয়েছে?

উমা তার হাত দুটি টেনে ধরে বলে—তাড়াতাড়ি চল্। তোকে দেখতে এয়েছে।

পূর্ণ স্থির হয়ে যায়। এক মুহূর্তে মনে পড়ে যায় কিরণশশীর বিয়ের কথা আর তার সামনে দাঁড়ানো উমার কথা। মনে হয় বিয়ে মানেই চলে যাওয়া, পরের হয়ে যাওয়া। এতো বড়ো খাঁ খাঁ বাড়িতে একলা মা জননী, সন্ধ্যা প্রদীপ দিচ্ছে, ঝাঁট পাট করছে। কেননা ততদিনে জমিদাররা পাইকপাড়ায় উঠে গেছেন। দুপুর বেলা মা একলা একলা বাগানে নারকেল কুড়াচ্ছে, নারকেল পাতা চেঁচে বাঁশের কাঠি তৈরি করছে, না কাটতে চাওয়া দিন পার কবছে কোনমতে। এতোগুলি কথা মনে করতে যে সময় লাগে তার পরে পরেই উমা তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে—তোর কাকা সঙ্গে করে নিয়ে এয়েছে। ছেলের বড়দাদা এয়েছে।

পরিষ্কার সেমিজ একখানি তোলা ছিল। তার ওপর কাপড় উঠলো। উমা চুল আঁচড়ে খোঁপা তুলে থাবড়ে বেঁধে দিল। কোঁকড়া চুলের থোকা খোঁপার বাঁধন চমৎকার বাহার খুলল।

ছেলের বড়ভাই কলকাতায় এসেছিলেন বিয়ের যজমানি করতে। সেখানে কাকাও গিয়েছিল। কথায় কথায় আলাপ পরিচয় তারপর এ পর্যন্ত মেয়ে দেখতে চলে আসা। বাড়ি এই নদীয়া জেলারই চাকদহে। ছেলের বাপ নেই, তবে মা আছেন। বেশ গোছানো সংসার। জোত-জমা আছে আর তার সঙ্গে জাতিব্যবসার দরুন যজমানঘরও অনেকগুলি। তাছাড়া বাজারে মণিহারি দোকান আছে। ছেলের বয়স তেইশ। নাম কার্তিককুমার আর চেহারাও মানানসই। ছেলের আবার গান বাজনারও সখ আছে। যাত্রাদলের নামকরা এস্রাজ বাজিয়ে। এতো সব সমাচার পাত্রের দাদা উপযাচক হয়েই পূর্ণর মাকে জানালেন। নিভাননী হাতে বেলপাতা নিয়ে শিবের মাহাত্ম্য শোনার মতন ছেলে পক্ষের কথকতা পলকহীন চোখে শুনছে। চোখে মুখে কৃতার্থ হবার ভাব। যেচে ভাগ্য ঘরে এলে কি মানুষ কৃতার্থ না হয়ে পারে।

জলপান হল। মুখে পান দেওয়া হল। আর তার পরেই মেয়ে দেখা। মেয়ের হাঁটন চলন অতো কিছু দেখবার দরকার নেই। ছেলের দাদা হোন আর যাই হোন আসলে তো তিনি সেয়ানা পরামাণিক। তাঁর হাত দিয়ে ঘটকালি হয়ে কতো মেয়ে বৈতরণী পার হয়েছে। বিয়ের আসরে যজমানি করে আর কনে নাড়াচাড়া করে তিনি হদ্দ। কোন মেয়ের কি গুণ আর কোনটি বে-গুণ তা তিনি এক নজরে বলে দিতে পারেন। তাই পূর্ণকে দেখেই তাঁর প্রথম কথা—মেয়ে তো সুলক্ষণা কিন্তু একটু যেন ট্যারা।

বাক্যি শুনে তো মা-কাকার চিত্ত অস্থির। বলেন কি দাদা মহাশয়। তবে কি তরী না ভাসতেই ডুবে গেল। পূর্ণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মা অধোমুখে হাত কচলায় আর কাকা আমতা আমতা করে। দাদা আবার বলেন—হ্যাঁ, এমনিতে বোঝা যায় না। তবে মেয়ে একটু আনমনা হয়ে চাইলেই দু চোখের মণি ইদিক উদিক।

কাকা বলে—আজ্ঞে মেয়ে আমাদের বড়ো গুণের।

—সেই জন্যেই তো বলছি। ওতে কোনো দোষ নেই। মেয়ে আমার লক্ষ্মী-ট্যারা।

আর কোনো কথা নয়। এক কথায় মেয়ে পছন্দ, দুই কথায় পাকা কথা আর শেষ কথায় দিন স্থির। না, কোনো দাবীদাওয়া নেই। কি আর দেবে অবলা বিধবা। অঢেল আছে, অনেক আছে। তো নেহাৎ যদি কিছু দিতে মন চায় তাহলে যেন একটি রুপোর জলে ডোবানো গড়গড়া দেন। ছেলের আবার একটু ভাল তামাকু সেবনের অভ্যাস আছে। গাওনা-বাজনার মানুষ তো, একটু শৌখিন না হলে কি মানায়। কাকা আর কি করে। যতোখানি সম্ভব মাথা কাত করে। মায়ের চোখে ছায়া ঠেলে ওঠে নীল আকাশ কোণে হঠাৎ মাথাচাডা দেওয়া অকাল মেঘের মতন। তারপরেই দুই এক ফোঁটা জল—হয়তো বা বুকখালি হয়ে যাওয়া আনন্দের। মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরের কাছে গিয়ে পাঁজি দেখে দিন ধার্য হল। চাকদহ গ্রামের কার্তিককুমার পরামাণিকের সঙ্গে গ্রাম কাঁচরাপাড়া নিবাসিনী পূর্ণশশীর শুভ বিবাহ, আগামী সাতাশে অগ্রহায়ণ, সোমবার, সন্ধ্যালগ্নে।

সাতাশে অগ্রহায়ণ এসে পড়ল বড়ো বড়ো চরণে দশ-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে। বিকেলবেলা পূর্ণ মামাতো বোন নমির সঙ্গে পথের ধারে কচুপাতা ভেঙে উল্টে দিয়ে ফটাস্ খেলছে। এদিকে বাড়িতে কোনমতে বিয়ের যোগাড় সারা হচ্ছে। কাকা, পিসী, মামা, যে পেরেছে এসেছে। সকলে কিছু কিছু সাহায্য করলেও কাকা রামকৃষ্ণ আসল জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে। নমি কচুপাতা ভেঙে

আনছে আর পূর্ণ ভাঙছে। দুইজনে হেসে উঠছে ফটাস্ শব্দে। এমন সময় দূর থেকে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ। দুই ঘোড়া টেনে আনছে কালো ঢাকা গাড়ি যার দরোজার কানায় শোলার টোপর উঁকি দিচ্ছে। পূর্ণ আর দাঁড়ায় না। হলুদমাখা কোরা শাড়িটি কোমরে বেঁধে দৌড় দেয়। ফটাস্ খেসার কচু পাতার আণ্ডিল পড়ে রইল পথের ধুলোয়। পূর্ণ ছুটে গিয়ে মাকে বলে—ও মা বর আসছে, বর আসছে।

মা হেসে বলে—যাও মা ঘরে গিয়ে বোসো।

কাকী বলে—কাপড়চোপড় পরতে হবে না। এমন দিনে কি ধুলো মাখলে চলে।

কাকা বলে—পাগলী মেয়ে।

বর বসল সামনের এক বাড়ির বাইরের ঘরে। সেখানেই বরণ করে নামানো হল। বরযাত্রীরা পাড়া বেড়াতে বেরোল। এদিকে পূর্ণকে সাজাচ্ছে মেয়েরা। তদারক করছে কাকীমা। ছোট কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটার মালা আর মাঝখানে একটি রক্ত টিপ। টেপা নাকে রুপোর নথ, গলায় ফুলের মালা। এমনি সমযে দরোজায় এসে দাঁড়ায় উমা। মুখখানি শুকনো, গায়ে একটি কালো র‍্যাপাব। পূর্ণ হাত নেড়ে ডাকে—আয় না।

কাকীমা আস্তে বলে—ও আবার এখেনে কেন?

পূর্ব আবার বলে—কি হল, আসবি না?

আড়ষ্ট চরণে উমা এসে দাঁড়ায় পূর্ণর পাশে। কোনো কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে চাদরেব খুঁট পাকায় আর মাঝে মাঝে পূর্ণর মুখের দিকে দেখে। পূর্ণ হাসল—কি রে?

—বর খুব সুন্দব হয়েছে রে পূণ্য।

—সত্যি।

—হ্যাঁ, আমি দেখে এলাম যে।

পূর্ণ বলে—তুই আমার সঙ্গে থাকবি বুঝলি। নইলে আমার ভয় করবে। উমা মাথা হেঁট করে বলে—না রে।

—কেন, না কেন?

—এই তো, তোর সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

—কেন থাকবি না। আমি কি করেছি তোর অ্যাঁ।

পূর্ণর চোখ ছল ছল করে। মনে পড়ে সই কিরণশশীর বিয়ের দিনটি। সেই একা একা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ানোর কথা। সইয়ের বদলে যাওয়ার কথা। সব শেষে সইয়ের চলে যাওয়ার কালে কান্নার কথাটি বুকে ঢেউ তোলে। উমা

হাত বাড়িয়ে পূর্ণর হাঁটু ছুঁয়ে বলে—বিধবাদের বিয়েতে থাকতে নেই রে। অমঙ্গল হয়।

উমা চলে যায়। পূর্ণ ভাবে ভালবাসার মানুষ কাছে থাকলে কি করে অকল্যাণ হয়। বাবার চলে যাওয়ার জেরে টান পড়ে। এখনো বুঝতে পারে না পূর্ণ বাবা মরে কি এমন দোষ পেয়েছিল যাতে করে তাদের মন্দ হতে পারে। উমা চলে গেলেও অনেক সময় পর্যন্ত হাঁটুর যেখানটি সে ছুঁয়েছিল শির শির করে। বুকটা মুচড়ে ওঠে। কিন্তু কাউকে বলতে পারে না সে কথা।

বিয়ে মিটল অনেক রাতে। তারপর কড়ি খেলা, স্ত্রী আচার। সে সবও সারা হল। বর একসময় বাসর ছেড়ে উঠে গেল দালানে বরযাত্রী বন্ধুদের নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতে। এই ফাঁকে জমিদারবাবু একটি আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। গিন্নী মা কপালে চুমু খেলেন। বললেন—বেঁচে থাকো। জন্ম এয়োস্ত্রী হও। বর উঠে যেতে পূর্ণ বাসর ফেলে উঠে গেল।

ভিতর দালানের এক কোণে একটি উনুন পাতা হয়েছে। কাকা কড়াইয়ে লুচি ভাজছে। কে একজন বেলে দিচ্ছিল, উঠে গেছে চাকি-বেলুন ফেলে। বার দালানে বরযাত্রীরা হৈ হৈ করে খাচ্ছে। এদের খাওয়া মিটলে সামান্য কিছ প্রতিবেশী আর কুটুম্বস্বজন বসে পড়বে। পূর্ণ কাকার কাছে ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায়। কাকা মুখ তোলে। আগুন তাতে মুখ টকটক করছে। ঘিয়ের ভাপ লেগে নাক-মুখ তেলতেলা।—কি মা, তুই উঠে এলি যে।

পূর্ণ ধপাস্ করে বসে পড়ে—আমি তোমায় লুচি বেলে দোব।

কাকা হেসে ওঠে—ওরে পাগলী, তুই না এখন বউ। লোকে দেখলে কি বলবে বল্ দিকিনি।

—বলুক গে।

চাকি বেলুন টেনে নিয়ে পূর্ণ ময়দার লেছিতে তেলমাখায়। তারপর ট্যাঁপা হাতে ছোট ছোট করে সতেরোটি লুচি বেলে। কাকা ভাজে আর কড়াইতে ছ্যাঁক-ছোঁক জল পড়ে। পূর্ণর হাত ভেরে যেতে উঠে দাঁড়ায়—কাকা, এ লুচি বরকে দিও না যেন। তুমি আর মা খাবে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখে বাসরে গান জমেছে। বরের বন্ধুরা যাত্রার বাজনা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সেই সমস্ত বাজিয়ে জোর গান হচ্ছে—আহা ইন্দুমুখী ফুলবালা হাসিয়া বদনে চায়, ঢল ঢল কাঁচা সোনা অঙ্গেতে যে চমকায়।

কে একজন গাইছে কানে হাত চেপে, তার পকেটে চেন-ঘড়ি যেমন কিনা কিরণের দাদা ললিত পরে। সে গাইছে আর সকলে দোহার দিচ্ছে। বর কাঁধে

এস্রাজ ফেলে ছড় টানছে। পূর্ণ ঘুম থেকে চমকে উঠে বসে। আর তখনি মনে পড়ে মায়ের কথা। মা কোথায় মা। কি করছে, কোথায় আছে। চারপাশে নতুন মানুষের ভিড়ে কেমন দম আটকে আসে। পূর্ণ আস্তে আস্তে বাসরঘর ছেড়ে ভিতরে চলে আসে। বারান্দায় কাকা, কাকী, পিসি সকলে সার দিয়ে শুয়ে। কিন্তু মা এখানে নেই। কোথায় গেল মা। খুঁজতে খুঁজতে উত্তর দরোজার কাছে গিয়ে দেখে একপাশে মাদুর পেতে কাঁথা চাপা দিয়ে মা শুয়ে আছে চুপটি করে। হেঁট হয়ে বসে গায়ে হাত দেয় পূর্ণ। অমনি মা চোখ খোলে। তারপর দুই হাত বাড়িয়ে পূর্ণকে কাছে টেনে নেয়। মার বুকে মাথা রেখে পূর্ণ এই প্রথম কেঁদে ওঠে। অনেক দিনের অনেক সুখদুঃখের জমে থাকা জল এক নিমেষে পাড় ভেঙে ভাসিয়ে দেয়। মাও কাঁদে। চোখের জলে মেয়ের কপালের চন্দন ধুয়ে যায়। মুখেচোখে মার নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকে মাথা রেখে বুঝতে পারছে পূর্ণ ভিতরটা কাঁপছে থর থর করে। পূর্ণর এই প্রথম মনে হয় কি যেন একটা হয়ে গেল তার। আজ সকালে পথেব পাশে কচুপাতা ভাঙা খেলার সময় তো এমন মনে হয়নি। উমা এসে দাঁড়াতে ভাবনায় আসেনি এ সময়টির কথা। এমনকি বাসরঘরে শুয়েও না। এখন এই মাব বুকে মাথা রেখে আছড়ে পড়তে এক নিমেষে ভিতরটা খাঁ খাঁ করে উঠলো। মার বুকের ঐ থরো থরো কাঁপন তার সারা অঙ্গে বিদ্যুৎ হানে। মেঘ-ডাকের গর্জনে দুলে ওঠে। আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভেসে যায়। সত্যি বুঝি কি একটা হয়েছে তার। যে কান্না এতো সময় বার হবার পথ পায়নি মায়ের এই টেনে নেওয়ায় তা যেন শতমুখে নেমে এল। মা কেবল একটিবার বলল—আজ থেকে তুই ভিন্ন গোত্র হয়ে গেলি মা।

কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে সকাল নটার ট্রেন। দুটি ঘোড়ার গাড়ি বর-কনে আর বরযাত্রী নিয়ে রওনা হল সকাল সকাল। যাবার আগে মা সঙ্গে করে মন্দিরে নিয়ে গেল। পুরোহিত আশীর্বাদী পুষ্প দুইজনের হাতে দিলেন। কচুয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকড়ালো। অগ্রহায়ণের সকাল বেলাকার আকাশ আর পথের ধুলায় সে চাবুক বুঝি শপাং বাজলো। মন্দিরের নহবৎখানার নিচে দাঁড়িয়ে মা। চোখ দুটি বোজা আর হাত বুকের কাছে গোট করা। ধুলো উড়ছে, শুকনো পাতা লাট খাচ্ছে হাওয়ার মুখে। ছেলের পাল গাড়ির পিছনে দৌড়ে চলে। কাকা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। একবার কেবল হাত তোলে। দূর পথের বাঁকে একজোড়া জল চলতি বউ থমকে দাঁড়ায়। ঘোমটা সরিয়ে দেখে মেয়ের পতিগৃহে যাত্রা। উমাকে কিন্তু একটি বারের জন্যও দেখা যায় না।

জোড়া ঘোড়ার গাড়ি বাগের চৌমাথায় পৌঁছে বামে বাঁক নিল। পিছনে দূরে পড়ে রইল পূর্ণশশীর সোনার দেশ, অচিন বন।

ভুলি ভুলি মনে করি, বংশীরবে রইতে নারি

দেখতে দেখতে হাওয়া উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে ঘুরে গেল। হিমালয়ের সদরে খিল পড়ল। হাওয়া ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বিপরীতে। ঠাণ্ডার জমাট ভাব গলে গিয়ে তার বদলে কিঞ্চিৎ তাপ এল।

দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে ফাগুন পড়তে না পড়তে। এখন আর সারাদিন রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে মন চায় না। সকাল থেকে আমতলার পাশে একটু রোদের জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয় না। হারাধন ধার কর্জ করে যে চালা তুলেছে সেই ঘরেই কটি প্রাণ বেঁচেছে। কঠিন জাড়ের কোপ মাথায় নিলেও ধড়-মুন্ড আলাদা হয়নি। কোলের ছেলেটা আস্তে আস্তে গড়ন পাচ্ছে। মুখ দেখে আন্দাজ হয় ছেলে মা মুখো। ছেলের বাপ হারাধনেরও তো মায়ের মুখ কেটে বসানো। কিন্তু তাতে করে কি তার জীবনে সুখের একেবারে ঢেল খেল। কে যে এ আইন করেছিল। বলিহারি।

সকালবেলা চাটাই পেতে তেল মাখিয়ে ছেলেকে রোদে ভাজতে দেওয়া হয়। আশেপাশে লম্ফঝম্ফ করে সেই কুকুরছানা খেলে বেড়ায়। চাটাইয়ের কোনা দাঁত দিয়ে ছেঁড়বার চেষ্টা করে। কাজলী আর পূর্ণ হযতো বসে বসে চাল থেকে খুদ আলাদা করে, আলু কোটে। ওদিকে বাদলী ধুলোয় দাপাদাপি করে সারা গায়ে-মুখে শিকনি মেখে ভূত হয়ে বসে থাকে। দিনমণি আর অমরনাথ হয়তো ডাঙ্গুলি নিয়ে পড়েছে। নীলমণি ভোর থাকতে যায় চায়ের দোকানে কাজ করতে, ফেরে রাতের বেলা। দুপুরটা ঐ জলখাবারের ওপর দিয়ে পার করে দেয়, ভাত খেতে আসে না। হারাধনও ওঠ-বোস কাজ করে যখন তখন আর দিনমানে খেতে আসে না।

এ মাসের তিনদিন বাদ দিয়ে আবার মন্দিরের পালা পড়েছে। ভোর থাকতে যেতে হয়। প্রথমে মন্দিরের দালান, ঠাকুরঘর, ভোগেরঘর ঝাঁট-মোছ। বাসি ফুল একজায়গায় করে তুলে রাখা। পরে সেগুলি জলে দিতে হবে। তারপর পূর্ণ ফুল তুলতে যায় বাগানে। পুরোহিত ঠাকুর ততক্ষণে এসে পড়েন। ফুল তুলে, তুলসীপাতা এনে চন্দন বাটতে বসে পূর্ণ। পূজা চলে। এই ফাঁকে পূর্ণ ভোগের ঘরে গিয়ে কুটনো-বাটনা করতে বসে। টিনের থেকে চাল বার করে বেছে রাখে। এদিকে ভারি এসে গঙ্গাজল দিয়ে যায়। পূজা শেষ করে পুরোহিত রাঁধতে বসেন। পূর্ণ উনুনে আগে থাকতে আঁচ দিয়ে রাখে। নির্জন দুপুরে জনমানব নেই মন্দিরের বিশাল চত্বরে, চওড়া দেয়ালে হাতা-খুন্তী পড়ার ঘটাংঘট শব্দ বাজে। বাগানে পাখি ডাকে। কলকে ফুলের সরু পাতায় বাতাসের

ঝিরঝিরানি ঝর্ণা। নহবৎখানার নিচে ছেলেরা কেরামের খেলায় মেতে ওঠে। মাঝে মাঝে তারই শোর কানে আসে। ক্বচিৎ কখনো কেউ পূজো দিতে আসে। তার হাত থেকে ডালি নিয়ে ঠাকুরের সামনে ধরে দেয় পূর্ণ।

দুপুরে খানিকক্ষণের জন্যে ছুটি। পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের শয়ন দিয়ে নিজে খেতে বসেন। পূর্ণ থালায় করে আতপ চালের অন্নভোগ, সঙ্গে একটা ভাজা, সুক্তোনি, তরকারি আর যা হোক একটা অম্বল কলাপাতা চাপা দিয়ে মন্দিরের পাঁচিল বরাবর ঘরে ফেরে। ঘরে যা রান্না হয় তা বাদে এই অন্নভোগ সকলে মিলে ভাগ করে খায়। হারাধন আর নীলমণিব জন্যে একটু তোলা থাকে।

রোদ পড়বার আগেই আবার মন্দিরে। বাসনকোশন মেজে আর একবার ঘরদুয়ারে ঝাঁট পড়ে। সন্ধ্যার মুখে শীতল ভোগ। কোনদিন লুচি, হালুয়া আর বেশির ভাগ দিনই কুচো নৈবেদ্য। আজকাল আর আরতির সময় বড়ো একটা মানুষজন আসে না। নিরিবিলি মন্দিরে আলো জ্বলে। কষ্টিপাথর আর অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণের মুখের সামনে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য ঠাকুরের হাতে ধরা পঞ্চপ্রদীপ ঘোরে। পাথরের বিগ্রহের কপাল চকচক করে। আয়ত চোখের সন্ধ্যার ছায়া নামে, করুণা কেঁপে ওঠে। সেই টান টান চেয়ে থাকায় বুঝি কখনো পলক পড়ে না। পূর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাথার ওপর ঝুলন্ত ঘণ্টা টানে। প্রদীপের আলোয় বিগ্রহের প্রকাণ্ড ছায়া মন্দির দেয়ালে দুলে ওঠে, রুপোর বাঁশরী ঝিকমিক করে। পূর্ণ ঘণ্টা টানে আর ভাবে বাঁশী কি কখনো বাজে। না কি যখন এই মন্দিরে তালা পড়ে। নহবৎখানায় গোলা পায়রার ঝাঁক অন্ধকারে বকবকম শুরু করে তখন বন্ধ দরোজার ওপারে বাঁশী বেজে ওঠে। বাঁশী বাজে গম্ভীর খাদে, নূপুর নাচে। হয়তো আকাশ হতে সঙ্গীরা নেমে আসেন ফুলমালা হাতে, করতাল বাজে, বাজে মৃদঙ্গ আর বাজে শত সহচরীর কণ্ঠ। বন্ধঘরের ভিতরে সামান্য প্রদীপের আলোর পাশে অমনি চাঁদেব হাট বসে যায। কষ্টিপাথর পুরুষ হন আর অষ্টধাতু হন নারী। নেমে আসেন যুগলে সিংহাসন ছেড়ে, দাঁড়ান হাতে হাত ধরে সখীদের মাঝখানে। তারপর সেই নারী শোনে চিরকালের পুরুষের বংশী। আর কেউ শোনে কি না শোনে তাতে কিছু যায় আসে না। যার জন্যে বাজানো সে শুনলেই হল। তার মরমে গিয়ে বিঁধলেই তো বাজনা সার্থক।

ফুলশয্যার রাতে কার্তিককুমার পূর্ণশশীকে এস্রাজ বাজিয়ে শুনিয়েছিল। পূর্ণ কোনো কথা বলেনি। একপাশে অধোবদনে বসে চোখেব জল ফেলে আর ভাবে এখান থেকে মা কতো দূরে। তার গ্রাম কতো দূরে। তার চারদিকে এতো ফুল, লেপ-তোষকের বিছানা আর মা শুয়ে আছে কাঁথার শয্যায় একলা একলা।

মায়ের চোখে কি ঘুম আছে। কি করে থাকবে। তার চোখজোড়া যে পূর্ণশশীর দুলদুলে মুখখানি, কাঁপছে থরো থরো, নাকের নথে জল দুলছে টলটল। এস্রাজ বাজে, তারের ওপর ছড়ের টান পড়ে কিন্তু সুরটি যে কি বলছে পূর্ণ বুঝতে পারে না।

বাইরে অগ্রহায়ণের মধ্যরাত্রি। বাতাসে হিমের ভার। বাঁশ বনে শেয়াল ডাকে, চৌকিদার হেঁকে যায় পিছনের পথ দিয়ে। বাড়ির মানুষজন সব ঘুমে চেতন নেই। এস্রাজ বাজতে বাজতে এক সময় থেমে যায়। বাজনদার একটি নিঃশ্বাস ফেলে বাজনা পাশে নামিয়ে রেখে বলে—কি গো, কথা বলবে না নাকি ?

পূর্ণ চুপ। কি বলবে। বন্ধ ঘরে একই বিছানায় বসা ঐ পুরুষটি কেমন আপনজনের মতন কথা কইছে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, পরিষ্কার রঙ আর নাকের নিচে বাহারে গোঁফ। আড় নয়নে অনেকবারই দেখা হয়ে গেছে মানুষটিকে। দেখে মনে হয় মানুষ মন্দ না। হাসিটি বেশ পরিষ্কার ছেলেমানুষের মতন। পাশে পড়ে থাকা এস্রাজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাবার কথা মনে হয়। ঐ গানবাজনা করেইতো মানুষটা পাগল ছিল। সেই করতে করতেই কি এমন করে হঠাৎ—।

—কি গানটা বাজাচ্ছিলাম বলতো ?

আবার কথা। পূর্ণ চোখ তোলে। মুখে পান মচমচ করছে আর গোঁফের নিচে টুকটুকে ঠোঁট জোড়া মিটিমিটি হাসছে। একটি হাত খাটের বাজুতে আর একটি কোলের কাছে।—কি, বলতে পারলে না তো।

মাথা নাড়ে পূর্ণ। কার্তিককুমার হেসে বলে—চাঁদবদনী ধনী আমার মৃগনয়নী, ফুলশয্যার রাতে কেন কথা কবেনি।

আরো অনেক রাতে পূর্ণকে সে আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মায়ের আদরের সঙ্গে এই আদরের কেমন যেন তফাৎ। মা কোলে টানলে চোখে জল আসতো, বাবার কথা মনে পড়তো। আর এখন শরীরের মধ্যে কেমন শিরশির করে, শীত জাপটে ধরে। একসময় সে পূর্ণকে কোলের ওপর বসিয়ে চুল আঁচড়ে দেয়। বলে—তোমার জন্যে বাসওয়ালা তেল রাখা আছে ঐ কোলঙ্গায়। রোজ মাখবে। তা না হলে এমন কোঁকড়া চুলে জট পড়ে যাবে।

পূর্ণ এই প্রথম কথা বলে। বলে—আচ্ছা।

—বাঃ। এই তো বেশ কথা বললে। তবে যে এতক্ষণ—

—আমি কবে বাড়ি যাবো ?

—সে কি। এই তো বাড়ি।

—মার কাছে যাবো।

—তুমি বিচুলি কাটতে জানো ?

পূর্ণর কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় কার্তিক। না বিচালি কাটবার তো কখনো দরকার হয়নি। কি করে জানবে। বাড়িতে তো কখনো গরুবাছুর ছিল না। সে মাথা নেড়ে বলে—না তো।

—শিখে নেবে। আমার বোন আছে—লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মীর বিয়ে হয়নি বুঝি ?

—হুঁ।

—তবে বরের ঘরে যায় না কেন ?

কার্তিক একটু চুপ করে থেকে বলে—ওর বর ওকে নেয় না। থাক্ গে সে সব। দেখো, আমার একটা ঘোড়া আছে, তার নাম সোনা।

—ঘোড়া !

—না ঘুড়ি ! মেয়েমানুষ। ওর পিঠে চেপেই আমি যজমান বাড়ি যাই। তারপরে মদনপুরে জমি জায়গা দেখতে যাই।

—ওমা !

—তাইতো লোকে আমায় বলে ঘোড়া নাপিত।

পূর্ণ খিল খিল করে হেসে ওঠে—ওমা সে কি কথা !

কার্তিককুমার মুখখানা গম্ভীর করে বলে—তা বলে তুমি যেন কখখোনো বোলো না।

—না না, সেকি।

হেসে ফেলে কার্তিক—আমার কানে কানে বোলো।

—ধুর। —শোনো, তোমায় সোনার জন্যে রোজ বিচুলি কাটতে হবে। ওকে যেন অছেদ্দা কোর না।

পরদিন সকাল হতে কার্তিককুমার ঘোড়ায় চেপে মদনপুরে গেল জমি দেখতে। ধানকাটা হচ্ছে। তারই দেখশোন করতে গেল। দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দেখলো ময়ূর ছাড়া কার্তিক কেমন ঘোড়ায় চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল। ননদ লক্ষ্মী এসে হাত ধরে পুকুরঘাটে নিয়ে গেল। পূর্ণ বলল—দিদি, আমায় বিচুলি কাটা শিখিয়ে দেবে ?

লক্ষ্মী হেসে মরে—ওমা দিদি কি লা। তুই তো আমার বউদি। সম্পর্কে বড়ো।

—তাহলে কি বলবো ?

—কি আবার ঠাকুরঝি। তা হঠাৎ বিচুলি কাটার কথা কেন রে ?

—এমনি।

—বুঝিচি। দাদা বলেছে বুঝি। ঐ ঘোড়া ঘোড়া করেই পাগল। ঘোড়া বিয়ে করলেই পারতো।

পূর্ণ হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে মুখ লাল হয়ে যায়। বসে পড়ে খাটের ধারে। লক্ষ্মী চোখ পাকিয়ে বলে—ওমা। বলি হল কি তোর ?

পূর্ণ হাসির দমকে বলে ফেলে—ঘোড়া নাপিত।

লক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে যায়। সরল মুখ কঠিন হয়ে খাঁদা নাকের পাটা ফুলে ওঠে। পূর্ণ দেখতে পায় লক্ষ্মীর নাকের নিচে রোঁয়াগুলি তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। আর একটু ঘন হলে বেশ একজোড়া গোঁফ হতো। কোমরে দুই হাত রেখে লক্ষ্মী বলে—ছিঃ। তোর সোয়ামী না।

মাঝখানে উঠোন। তিন দিকে ঘর মোট চারখানা। সামনে টানা দাওয়া। মাটির ঘর খড়ের চাল আর ইটের ওপর মাটি লেপা সিঁড়ি। মাঝখানে তুলসী মঞ্চে আর একপাশে ছোট এক মরাই। যার যতো বড়ো মরাই তার জমিও তত বেশী। উঠোনের সামনে একটু ছোট ফুলবাগান, কুমড়োর মাচা আর তারপর ঘোড়াঘর। কার্তিককুমারের ঘোড়াশালা। খোড়ো চালের উঁচু ঘর, পাশে জাব দেওয়ার ডাবা মাটিতে গর্ত করে বসানো। এদিকে পশ্চিমের ঘরে থাকেন শাশুড়ি আর ননদ। তার পাশের ঘরে এমনি একটি তক্তপোশ পাতা। যজমান বা অতিথি স্বজন এলে ঐ ঘরেই বসা হয়। রাতে সে ঘরে দুই ভাসুর-পো শোয়। মাঝের ঘরে থাকেন ভাসুর নবনীধর আর তাঁর পরিবার যমুনা। একেবারে পুবের ঘরটি বরাদ্দ কার্তিককুমারের জন্যে। উঠোনের দক্ষিণে রান্নাঘর আর তার পাশেই ঢেঁকিশাল। পূর্ণ লক্ষ্মীর কাছ থেকে শিখে নেয় গড়গড়ায় জল বদলে দেবার কায়দা। নলটি ঠিক মতন ভাঁজ করে রাখবার নিয়ম।

দুই তিন দিন পর লক্ষ্মী পূর্ণকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল গ্রামের কয়েক ঘর যজমান বাড়ি। তাঁরা বউ দেখতে আসবেন না। যেচে গিয়ে দেখা দিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে বেশ কয়েক ঘর বামুন আর বাদ বাকি কায়স্থ। আর আছে তিলি আর এক ঘর গোয়ালা।

গোরপাড়ার ঘোষেদের বাড়ি গিয়ে পূর্ণ বসেছে। কথা বলছেন ঘোষগিন্নী। থালায় করে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ ছোয়নি। মিষ্টি দেখলে বমি আসছে। গিন্নী বলেন—ও কটা খাও বাছা।

—আমার গা পাক দিচ্ছে।

পাশের দরোজা থেকে কে যেন খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে—এই ক' রাত্তিরেই

গা পাক !

পূর্ণ চমকে দেখে দরোজাব ও-পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে সে লক্ষ্মীরই বয়সী হবে। দোহারা গড়ন, আঁটো চেহারা আর রঙ একটু চাপা। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু চোখের ভাব বড়ো চঞ্চল। লক্ষ্মীকে দেখে সে চোখ টেপে। লক্ষ্মী বলে—তুই বোস্। আমি পারুলের সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।

গিন্নী বলেন—পারুল কি বলছে রে লক্ষ্মী ?

উঠে যেতে যেতে লক্ষ্মী বলে—পান খেতে ডাকছে জ্যেঠাইমা।

—পারুল কে ? পূর্ণ গিন্নীর দিকে তাকায়।

—আমার শনি।

—অ্যাঁ !

—আমার সতীন মেয়ে। আবাগী মবে গিয়ে আমায় মেরে রেখে গেছে।।

—ওর বুঝি বিয়ে হয়নি ?

—হবে না কেন। তোমার ঐ লক্ষ্মীদাসীব মত কপাল। দেখছো না দুটিতে কি পিরীত। সোযামী নাতি মেবে বাব করে দিয়েছে।

তারপব গলা নামিয়ে ঘোষগিন্নী বলেন—তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। ও হল নষ্ট মাগী। তোমাদেব ঘবেও মাঝে মধ্যে বেড়াতে যায়। দেখো বাপু, সোয়ামীটিকে একটু আঁচলে গেরো দিয়ে বেখো।

বাইরে ঘোষ মহাশয়ের গলা কাঁকাবি। পূর্ণ তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়।

ফিরতি পথে সদরে দেখা হয় পারুলের সঙ্গে। লক্ষ্মীকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিযে কি সব ফুসুর ফুসুর করে। তাবপব তার হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দেয়। লক্ষ্মী এদিক ওদিক দেখে সেটি সেমিজেব মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। পারুল পূর্ণব সামনে এসে বলে—হুঁ। এখনো যে মেয়ের প্যাখম ওঠেনি। বলি কাত্তিক ঠাকুব চড়বে কিসে।

পূর্ণ হাঁ করে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন যেন হেঁয়ালির মতন কথা বলে। কিছুই যে বোঝা যায না। থেকে থেকে শরীর কাঁপিযে হেসে ওঠে। লক্ষ্মী ঠেলা মেবে বলে—তুই আব ওকে জ্বালাসনে বাপু।

পারুল পূর্ণর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে—কাত্তিকদাদা ঠিক গড়ে পিঠে বাজিয়ে নেবেখন। ওস্তাদ বাজনদার তো।

যে পথ দিয়ে লক্ষ্মী নিয়ে এসেছিল সে দিক দিয়ে ফেরে না। একটা বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু পথ ধরে অনেক কাঁটা ঝোপ টপকে যেতে হয়। যেতে যেতে লক্ষ্মী বলে—কি রে, কোলে নেবো নাকি ?

—না না।

—আমার কাছে লজ্জা করিস্‌নে। বল্‌ পা ব্যথা করছে?

পূর্ণ মাথা নাড়ে।

—তবে দাঁড়া একটু। ঘোমটা দে, ঘোমটা দে।

পূর্ণ কিছু বলবার আগেই লক্ষ্মী তার গলা অবধি ঘোমটা টেনে দেয়। তারপর এগিয়ে যায় ডানদিকের নিচু পথ ধরে। ঘোমটার আড়াল থেকে পূর্ণ দেখে লক্ষ্মী ঐদিকের পুকুর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর চারপাশে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। পূর্ণর একলা এখানে দাঁড়িয়ে একটু ভয় ভয় করে। ঘন আমগাছের ছায়ার আওতায় এখানটি বড়ো ঠাণ্ডা। মাটিতে ডেঁয়ো পিঁপড়ের সার চলেছে আস্তে আস্তে। জংলা গাছে ফড়িং নাচে, একটা লাল মাকড়ি পোকা গায়ে কালো ফোঁটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমগাছে উঠছে। একটা বেজি এ বন থেকে ও বনে সড়াৎ করে চলে গেল।

একটু পরে পুকুর ধারের বন বাদাড় ফুঁড়ে একটি মাথা জেগে ওঠে। একজন মানুষ আঁকশি হাতে উঠে আসে। হাতে তার একগোছা কাঁচা সুপুরি। ফর্সা চেহারা, রোগা পাতলা গড়ন, গায়ে চাদর আর মালকোঁচা মাবা ধুতি পরনে। লোকটি হেসে হেসে লক্ষ্মীকে কি যে বলে এখান থেকে বোঝা যায় না। লক্ষ্মীও মাথা আর হাত নেড়ে কি বলে যায় সমানে। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে সেই চিরকুটখানা বার করে তার হাতে দেয়। সেও লক্ষ্মীর হাতে কি একটা গুঁজে দেয়। বাস আর তাকে দেখা যায় না। আবাব ডুব দেয় বনের মধ্যে। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে পূর্ণর হাত ধরে বলে—চল চল্‌। অনেক বেলা হল।

পূর্ণ বলে—ঐ লোকটা কে ঠাকুরঝি?

লক্ষ্মী আড় চোখে তাকায়—কলির কেষ্ট।

—সে আবাব কে?

—হুঁ। রাধারানীর চিঠি পৌঁছে দিলুম।

—ও মা সে কি গো!

—চুপ। কাউকে বললে নাকে ঝামা ঘষে দেবো। যা দেখলি যেন পেটের মধ্যে থাকে।

—আচ্ছা।

—আমার কাজ যজমানি করা। তাই করলুম। বলি বেন্দাদূতীর নাম শুনিছিস?

পূর্ণ কখনো এমন ধারা যজমানি দেখেনি। মায়ের কাছে শোনেওনি। কে

জানে, হয়তো আরো কতো রকম আছে। আস্তে আস্তে সব জানা হবে।

লক্ষ্মী হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই দুম করে পূর্ণকে কোলে তুলে নেয়। পূর্ণ হাত পা ছুঁড়তে থাকে। কাপড় আলগা হয়ে আঁচল মাটিতে লুটোয়। ও মা কি লজ্জা, ঘরের বউ কি কোলে ওঠে। লক্ষ্মী তার গালে চকাস্ করে একটি চুমো খেয়ে বলে—নে, আর ঢং করতে হবে না। দাদার কোলে উঠতে বুঝি লজ্জা করে না। ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকবি, বুঝলি।

পূর্ণ কি আর করে। ননদিনীর গলা এক হাতে বেড় দিয়ে ধরে শক্ত করে বসে। মাথায় ঘোমটা নাকে নথ আর পায়ে আলতা। পথ চলার ঝাঁকুনিতে পায়ের মল বাজছে ছম ছম, নাকের নথ দুলছে টলমল। লুটিয়ে পড়া আঁচল টেনে তুলে গোছ করা হয়েছে আর অমনি নজরে পড়েছে সেখানে রাজ্যের চোরকাঁটা বিঁধে আছে। পূর্ণ কোলে বসেই একটি একটি করে চোরকাটা উৎখাত করে আর মনে ভাবে যে লোকটাকে এইমাত্র দেখলো সে যেন কেমন চেনা চেনা। কোথায় যেন দেখেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে কি?

আলো অন্ধকার মন্দির চত্বরে জনমানুষ নেই। আজ সূর্য ওঠবার আগেই পূর্ণ এসে পৌঁছেছে। আর কয়দিন পরেই তো দোল উৎসব। ফালগুন মাসেই তো শ্রীকৃষ্ণ দোল লীলায় মাতেন। আকাশে ফাগ ওড়ে, ওড়ে আবির গুলাব কুঙ্কুম। আর ওড়ে রাধিকার নীল বসন। সখীরাও সে লীলার সামিল হয়। সকলের হাতে হাতে ঝারি, পিচকারি আর অঙ্গে ফুলের গন্ধ মধু। একজন পুরুষকে ঘিরে শত নারীর উন্মাদ নৃত্য, গান আর রঙ রস। কে যে কাকে রঙ মাখায়, কার রঙ যে কে মাখে তার কি বাছবিচার আছে। পুরুষ আজ সকল প্রকৃতির কাছেই প্রাণনাথ, সকলের রঙই আজ তাঁর অঙ্গরাগ। তবে হ্যাঁ, বাছাবাছি কেবল ঐ একটি জায়গায়। সেখানে একটু ভেদ আছে। কুসুমে প্রভেদ হইলেও কি হে মধুপে প্রভেদ হয়? হ্যাঁ, হয় বৈকি। সারাদিনের মাতামাতির পর যখন রাত্রি আসে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকট হয়ে সমস্ত বিশ্বসংসার যখন হেসে ওঠে তখনই প্রভেদ ঘটে। রঙ দোলের কাদাকুঙ্কুম মাখা পথে পায়ের আঙুল চেপে চুপি চুপি রাধা আসেন কুঞ্জবনে। সেখানে তখন বাঁশী বাজে। বাজে তাঁরই পথ চেয়ে। দামাল হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় সে বাঁশীর সুর। আর শোনে কেবল একজনই।

দূরে ভাঙাচোরা দোলমঞ্চ। গাছপালা বোঝাই, সিঁড়ি জীর্ণ। ওখানেই দেব দোল হবে। আর ঐ মঞ্চেই হয়তো দোলপূর্ণিমার রাতে তাঁরা দোলায় দুলবেন।

ফুলশয্যার সেই কথা না কওয়া রাতটির কথা মনে পড়ে রাত্রির এই শেষ যামে এসে দাঁড়িয়ে। মনে হয় হয়তো সব পুরুষই একজন—একটি মাত্র ভ্রমরা। কেবল নারী ভিন্ন, কুসুম নানা জাতের।

মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে পূর্ণ শুনতে পায় বাঁশী বাজছে।

অবাক করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে।

চর সরাটি গ্রামে যেতে হলে পায়ে হেঁটে ছাড়া উপায় নেই। গঙ্গার ধার ঘেঁষে যাবারও কোনো সহজ পথ নেই। যা আছে সেখান দিয়ে যেতে হলে শরীরে অনেক ক্ষমতা দরকার। কৃষ্ণদেব বাটি মৌজার সীমানা পার হয়ে উত্তর দিকে বরাবর যেতে হবে। সেখান থেকে আবার পশ্চিমে। এই সরাটি গ্রামের সঙ্গে হুগলী জেলার চর নওসরাইয়ের বুঝি যোগ ছিল। নওসরাইয়ের লাল বালির সুখ্যাতির কথা কে না জানে। গঙ্গার পথ অদল বদলে মৌজার সীমানা চৌহদ্দিরও অনেক পালটাপালটি হয়েছে। নদী কারো মর্জি মেনে চলে না, তার ইচ্ছেতেই জগতের সকলকে চলতে হয়। এই তো সেদিনকার কথা—শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজা চিরকাল নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল, হঠাৎ গঙ্গার খেয়াল উঠলো গিয়ে হুগলী জেলার খাতায়। অথচ কি আশ্চর্য, কিছুকাল পরে নদী আবার সরে গেলেন সেই আগেকার জায়গায়। মধ্যিখানে চর জুড়িয়ে সব পড়ে আবার এই নদে জেলার সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপুরের নামেব পাশে আর লাল ঢেঁড়া পড়ল না। খাতা তেমনি রইল। আজকাল একটি উড়ো খবব শোনা যায় মৌজায় সেটেলমেন্ট নামার পর থেকে। আবার নাকি শ্রীকৃষ্ণপুব নদে জেলায় এসে পড়বে।

সকাল বেলা রওনায়ানা হয়ে প্রায় দুপুর ছুঁই ছুঁই তক পূর্ণ এসে পৌঁছলো সরাটি গ্রামের তারক পালিতের বাড়ি। চর বলতে আর কিছু নেই, এখন সবই গ্রামের সঙ্গে জুড়ে থাকা গ্রাম, মহাল। এতক্ষণ আকাশ পরিষ্কার খটখটে ছিল, কোথাও মেঘের নামমাত্র নেই। পথ হেঁটে মাথার চাঁদি ফাগুনের মিঠে কড়া রোদে তেতে উঠেছে, মাথার ঘোমটায় নামমাত্র আড়াল হয়। পালিতদের উঠোনে পা দেওয়ার মুখে আকাশ দপ করে নিবে গেল, টানা জালের মতন মেঘ উঠলো সারা আকাশ ছেয়ে আর দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে জল নেমে এল। পালিত বাড়িতে অমনি দাপাদাপি পড়ে গেল। মেয়ে বউরা হুটোপাটা করে উঠোনে শুকোতে দেওয়া বড়ি, চটে বিছিয়ে রাখা কলাই, ছোলা, মটর সব চাব হাতে করে তুলতে লাগল ঘরে। যে যেমন পারে টেনে হিঁচড়ে সব তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করল। কিছু বাঁচল কিছু বাঁচল না। পূর্ণ পালিতদেব পাকা কোঠার দালানে উঠে পড়েছিল বলে জল থেকে বাঁচল। গায়ে জলের কুটো লাগল না। সবাই ধাতস্থ হলে পূর্ণকে চা দিল বড়ো বউ। পূর্ণ চা মুখে তুলেছে

অমনি ছোট বউমা যে নাকি গ্রামের ছোট ইস্কুলে মাস্টারনী ফস্ করে বলে বসল—তুমি কিন্তু অপয়া।

পূর্ণর মুখের পেয়ালা মাটিতে নামে—কেন মা, একথা বললে কেন ?

বউ এক গাল হেসে বলে—এতক্ষণ আকাশ পরিষ্কার ছিল। তুমি এলে আর অমনি বৃষ্টি এসে পড়ল।

পূর্ণর মুখে সামান্যক্ষণের জন্যে এক চিলতে মেঘ দেখা দিল। ভ্রু একটু বা ভাঙলো। বাইরে চেয়ে দেখলো বৃষ্টি ধরে এসেছে। আর একটু পরেই থেমে যাবে।

জোড়ে মায়ের কাছ থেকে ফিরে আসার আগেই জেনে এলো জমিদার আর তাঁব পরিবার অগ্রহায়ণ শেষ হবার আগেই এখানকার পাট তুলে কলকাতায় চলে যাবেন। বার বাড়িতে নিভাননী থাকবে যেমন ছিল। জমিদার তো আগেই বলে বেখেছিল বাগানের ফল পাকড় সবই মা ভোগ করবে আর কথা মতন গোমস্তা মারফৎ মাসে পাঁচটি টাকা মিলবে। তার বদলে ভিটেতে যেন নিত্য ঝাঁট পাট পড়ে আর চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখানো হয়। নায়েব গোমস্তা মাঝে মধ্যে এসে তালা খুলে অন্দরমহল দেখে যাবে। তবে হ্যাঁ, জমিদারবাবু সপরিবারে দোল, দুর্গোৎসবের সময় বাড়িতে আসবেন। পূর্ণ স্বামীব সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি ফিবে আসবার সময় মা কেঁদে বলে—তোর বিয়ে হল আর আমিও একেবারে একলা হয়ে গেলাম। তুই আমার পয়মন্ত লক্ষ্মী ছিলি মা।

শ্বশুর - ঘরে ফিরে পূর্ণ শুনলো সে যেদিন এখান থেকে মায়ের ঘরে যায় সেদিনই সবে-ধন নীলমণি একটিমাত্র গাভীন গরু বনে বাদাড়ে চরতে গিয়ে বিষলতা খেয়ে ধড়ফড়িয়ে মবে গেছে। কোনো টোটকা কাজে লাগে নি। পূর্ণ দেখলো শাশুড়ির মুখ তোলা আর লক্ষ্মীর নাক মোটা। হাওয়া বুঝতে বুঝতে লক্ষ্মীই ফড়াম্ করে বলে উঠলো—দাদা, তুমি রাগ করো আর ঝাল করো একটা কথা না বলে পারছি না।

—কি ? কার্তিক জিজ্ঞাসা করে।

লক্ষ্মী চোখের কোণে পূর্ণকে দেখে নিয়ে বলে—তোমার বউ বাপু অপয়া।

কার্তিক বোনের মুখের ওপরে কিছু বলেনি। স্বামী ত্যাগ করা মেয়ে বলে কথা, ওর কথায় কথা পড়লেই সংসারে অনর্থ বাধবে। ওর অভিমানের ভার বেশী। কার্তিক কিছু না বললেও পূর্ণর চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুখ নিচু করে ভাবে মাকে ছেড়ে এলে মা একলা হয়ে যায়, মায়ের কাছে সে পয়মন্ত লক্ষ্মী। আর এ সংসার ঠিক তার বিপরীত। পূর্ণর মনের এই ভাব কাউকে বলতে পারেনি। এমন কি স্বামীকেও না। কিন্তু এই কথার জ্বালা থেকে

কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। দুপুর বেলা একলা ঘরে পুতুল খেলতে খেলতে মেয়ে পুতুলটিকে যত্ন করে বিয়ের সাজ পরায় আর চোখের জল মুছিয়ে দেয় বার বার—আহা মরে যাই, মরে যাই ! মেয়ের জন্যে যে প্রাণ বেরিয়ে যায়। মেয়ে চলে গেলে কি মা থাকতে পারে।

সকাল বেলা উঠে বাসি কাপড় বদলে কাজে লাগতে হয়। ছেলেমানুষ বলে এখনো তেমন দায় পড়েনি কাঁধে। তবে শ্বাশুড়ি ঠাকরুন প্রায়ই তাকে ঠারে ঠোরে বলেন—জোয়াল কাঁধে পড়লে আপনিই সব করবে। আমার তো বাপু ন' বছর বয়েসে হেঁসেলে নাক ঘষতে হয়েছিল।

সোনার জন্যে ডগার বিচালি ছোট ছোট করে কাটে পূর্ণ। ঝুড়ি বোঝাই করে রাখে। মাঠ থেকে রোদ পড়বার মুখে মুনিষরা যখন ঘরে ফিরে আসে পূর্ণ বুঝতে পারে এবার দ্বিতীয় প্রস্থ জাব দিতে হবে। কেঁড়ে বোঝাই ভূষি, পাতলা গুড়, আর ভাঙা ছোলা ঘরে মজুদ থাকে। সব দিয়ে বেশ জুত করে মেখে সোনাকে জাব দিতে হয়। এই গেল ঘোড়া সেবা। এছাড়া সারাদিন চলে মানুষের খিদমত। এ জন্যে মনে কোনো ব্যাজ রাখলে চলে না। কেননা মা বলে দিয়েছে এই করতেই তো মেয়েমানুষের সংসারে জন্ম। কিন্তু গোল বাধে কাঁচা বয়সের বুদ্ধির জন্যে। উঠোনে ধান ছড়া দিতে দিতে মনে পড়ে যায় মেয়েকে এখনো দুধ খাওয়ানো হয়নি। ব্যাস্ পড়ে রইল ধান-পান। ঘরে গিয়ে চৌকির তলা থেকে মেয়েকে বার করে তাকে দুধ খাওয়াতে বসে। নেকড়ার চুল টেনে বেঁধে দেয়। মনে ভাবে এই মেয়েরও একদিন বিয়ে হবে। ঘরে জামাই আসবে। তখন কি হবে ? ঘরে জামাই আসবে। মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে। তখন না হয় একটি মনের মতন মেয়ে যোগাড় করে নিলে হবে। কিন্তু মা কি করবে। মা তো আর ঠিক এমনি করে তার বদলে আর একটি মেয়ে যোগাড় করে নিতে পারে না। এক মেয়ের বিয়ে হলে নতুন করে মেয়ে গড়ে নিতে পারে না। রাত হলে পরে জমিদারের বাগানে নারকেল সুপারি গাছে হাওয়া ওঠে। রাতচরা পাখি ডাক দিয়ে ফেরে বাগানের এ কোণ থেকে সে কোণ। চণ্ডীমণ্ডপের কানাচে দুর্গা প্রতিমার কাঠামোর সামনে প্রদীপ জ্বলে। মা চৌকাঠে গালে হাত ভেরে বসে বসে কতো কি না ভেবে মরে। সে ভাবনার সাক্ষী থাকে কেবল ঐ ছোট প্রদীপটি, আর কেউ না।

আজ সকাল হতে না হতে ডোমপাড়া থেকে জনা চার পাঁচ মানুষ এসে উপস্থিত। শুধু এল না একেবারে হুড়তে পুড়তে এল। সঙ্গে একজন মানুষ, তার হাত দুটি আর সব মানুষদের হাতের বজ্র বাঁধনে বাঁধা। পূর্ণ তখন স্বামীর গড়গড়ায় জল পালটে নতুন করে জল বদলে দেবে বলে ঘটি আনতে হেঁসেলে

গেছে। কার্তিককুমার দুই হাঁটুর ফাঁকে আয়না রেখে মুখে ক্ষুর টানতে ব্যস্ত। এমন সময় শোরগোল মাথায় করে তারা হাজির। যাকে ধরে আনা হল মুখ চোখ দেখে মনে হয় লোকটা ধাতে নেই। মাথার বাবরি চুল কপালে এসে পড়েছে, চোখ দুটি ঘুরছে গোলার মতন আর কেবলি হাত-পা খিচছে। চার পাঁচ জন ষণ্ডামার্কা জোয়ানমর্দ তাকে ধরে রাখতে পারছে না। কাণ্ড দেখে পূর্ণর চক্ষুস্থির। ভাসুর নবনীধর সবে মাত্র পুকুর ধার থেকে গোশল করে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে গামছা, হাতে গাড়ু। তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—কত্তা, বড়ো বিপদ।

নবনী ধীরে সুস্থে দাওয়ার নিচে গাড়ুটি নামিয়ে রাখলেন, তারপর বাঁশের আড়ায় পাট করা ধুতিটি টেনে নিয়ে সেটি পরতে পরতে বলেন—কি হয়েছে ?

—আজ্ঞা বংশীর ভয় লেগেছে।

—ভয় নেগেছে ?

—যে আজ্ঞা কাল থেকে।

—কি করে বুঝলি ?

—বেশ ভাল মানুষ ছেল। বাবুদেব আখ কলে নিয়ে যাবে বলে পান্তা খেতে বসেছিল। বাস, আর খাওয়া হলনি। কি যে হল কি জানি মোশায়। সেই থেকে খালি চমকে চমক উঠছে। ওর চোখ দেকুন না কত্তা। কেমন পাক মারছে দেকুন।

ভাসুর কাপড় পড়ে ধাতিস্থ হয়ে বংশীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। লোকটা প্রায় ছুটে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। চোখ ঠিকরে বার হয়ে আসছে, পরণের ট্যানা কাপড়টি আর কোমরে থাকতে চায় না। পায়ের নখ দিয়ে উঠোনের মাটি চষে ফেলছে। পূর্ণর হাত থেকে ঘটি নামে না। মাথার ঘোমটা পড়ে গিয়ে আব্রু ঘুচে গেছে। হেঁসেলের দরোজায় ঠেসান দিয়ে এই কাণ্ডকারখানা দেখছে। পিছন থেকে একটি কড়া হাত এসে তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলে দেয় আর গজগজানি হয়—বউ মানুষের এতো হুঁশ তাল কম হলে হয়। পূর্ণ সে হাতের ছোঁয়ায় আগেই বুঝতে পেরেছিল শাশুড়ি ঠাকরুন। নবনী কোমরে দুই হাত রেখে তটস্থ বংশীর সামনে দাঁড়িয়ে তার উলুক শুলুক চোখের দিকে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, হুঁ, বড়ো জবর ভয় নেগেছে।

পাশ থেকে আর একজন বলে—আজ্ঞা ওর বউটা কেঁদে কেটে একসা। ধরতে গিয়েছিল, তা অমনি দাঁত বার করে কামড়াতে গেচে।

—হুঁ, আবার ভয়ও দেখাচ্ছে। এ যে দেখছি জোড়া রোগ।

—যা বলেন আজ্ঞা।

—একজোড়া নতুন গামছা, একজোড়া শাড়ি কাপড় আর চার আনা পয়সা।

—আজ্ঞা!

—তা না হলে যে ভয় ছাড়বে না। একে যে কঠিন ভয় ধরেছে। অনেক ক্ষ্যামতা তার।

লোকটা কাকুতি মিনতি করে—গরীব মানুষ আজ্ঞা। অতো জিনিস—

—রোগটা তো বাপু গরীব নয়।

লোকগুলি নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তারপর যে কথা বলছিল সেই বলে—জোড়া না করে একখানি করে ধরে দিন কত্তা।

দাওয়া থেকে কার্তিক বলে—দাদা, ওতেই সেরে দাও।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল নবনী—বলছিস?

—হ্যাঁ।

—বেশ তবে ধর বেটাকে চেপে। শক্ত করে ধর।

সবাই মিলে গায়ের জোরে বংশীকে চেপে ধরে। দুইজন কোমর থেকে হাত শুদ্ধ জাপটে ধরে আর দুইজন উবু হয়ে বসে হাত পা চেপে ধরে। সে চাপনের চোটে বংশীর চোখ প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড়। মাথা ঝাঁকাবার উপায় নেই, হাত পা খেলাবার যো নেই। নবনী বলেন—ভয় নেগেছে নয়, ভয় নেগেছে।

বংশী তাকায় নবনীর চোখে।

—তা ভয় কি করে নাগে বাপধন? আমি জানি কোন ডাইন তোকে মন্দ করেছে।

বংশী গোঁ গোঁ করে।

—আমি জানি। ঐ নিকিরি পাড়ার বাঁজা বউটার নাম কি যেন?

বংশী ফোঁসফোঁস করে। নাক দিয়ে সর্দির মতন জল গড়ায়। জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলতে গিয়েও পারে না।

—পটলী না? সে মাগী তো পরশুদিন গলায় দড়ি দিয়েছে। রোজ রাতে তার ঘরে না গেলে পেটের ভাত হজম হতো না কি বল?

একজন বলে ওঠে—কি বলছেন কত্তা?

—চোপ। আবার কতার মাঝে কতা। সে মাগী মরে তোর ঘাড়ে চেপেছে। বড়ো শোক নেগেছে নয়। বড়ো প্রাণ পুড়েছে। শালা বেজন্মার বাচ্ছা।

—বংশী গোঁ গোঁ করে—হুঁউউ।

নবনী হঠাৎ হাত থেকে কাঁসি পড়বার মতন ঝনঝনিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—পোড়াচ্ছি। প্রাণ পোড়াচ্ছি।

সকলের চোখের সামনে বংশীর এগালে ওগালে ঠাস ঠাস করে চড় কষাতে থাকেন নবনী একের পর এক। এক একটি চড় পড়ে আর পূর্ণ চোখ বন্ধ করে। নবনী হুঙ্কার পাড়েন শালার ঘরের শালা। ভয় ছাড়াচ্ছি তোর।

কেটো হাতের চড়ের দাপটে লোকটার মাথা একবার এদিক আর একবার ওদিক ঘোরে। মুখ দিয়ে গেঁজলা উগরে আসে। তবুও চড় বন্ধ হয় না। মারতে মারতে নবনীও হাঁপিয়ে পড়েছেন আর তার দাপটে পাশের লোকগুলিও এলে পড়েছে। এক সময় বংশীর গোলা ঘোরা চোখ সরল হয়, নিবে আসে আগুনগোলা তারপর চোখ বুঁজে দেহ এলিয়ে দেয়। নবনী বলেন—দে, শালাকে শুইয়ে দে। বউমা, এক ঘড়া জল আনো দেখি।

পূর্ণ তাড়াতাড়ি হেঁসেলে রাখা বড়ো জল ভর্তি ঘড়াটি এনে একপাশে নামিয়ে রাখে।

—ঢাল মাথায় ঢাল তোরা।

মাটিতে শয়ান বংশীর মাথায় ঘড়া উপুড় করে জল ঢালা হয়। মাথার চুল জলে কাদায় মাখামাখি। বংশী চুপ করে পড়ে থাকে। নবনী দাওয়ায় রাখা ঘটি থেকে জল নিয়ে হাত ধুতে ধুতে বলেন,—ভয়ের গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়েছি। আর ভয় নেই।

একটু পরে বংশী তাকায় সহজ সরল চোখে। উঠে বসে। হাত দিয়ে মাথার জল ঝাড়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জায় হেঁট মুখে চলে যায়। যাবার সময় লোকগুলি কড়ার করে যায় পাওনাগণ্ডা এক হপ্তার মধ্যে মিটিয়ে দেবে। কেবল নগদ দক্ষিণাটি হাতে হাতে দেয়। পূর্ণ দম ফেলে বাঁচে।

লক্ষ্মী বলে—দেখলি দাদার হাতে গুণ। একে বলে খালিপদ ডাক্তার। পায়ে জুতো নেই কিন্তু মাথায় কেরামতি আছে বুঝলি।

—তাইতো।

—একে বলে ভয় দিয়ে ভয় ছাড়ানো। এও যজমানি।

—এর কি মন্তর আছে ঠাকুরঝি ?

লক্ষ্মী হেসে বলে—ওমা তাও জানিস না বুঝি। মানুষের মধ্যে নাপতে ধূর্ত্ত পাখির মধ্যে কাওয়া, আর দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত্ত যার নেই ধরা পাওয়া।

বাইরে থেকে ভাসুরের গলা শোনা যায়—আমি কাজে বেরোচ্ছি। ফিরতে বেলা হবে।

লক্ষ্মী সাড়া দেয়—আজ কোন দিকে চললে দাদা ?

—সিলিন্দা, তারপরে বেলে বাজার। কত্তারা অনেক তলব করেছেন। দু হপ্তা ক্ষৌরি হয়নি। শুনলাম সব দেড় হাত করে দাড়ি গজিয়ে গেছে।

রাতে ঘরে শুতে এসে পূর্ণ দেখে কর্তা আড় হয়ে সটকা টানছে। দুই খিলি পান হাতে করে পূর্ণ সামনে এসে দাঁড়ালো। কার্তিক মুখ থেকে নল নামিয়ে বলে—কিগো আজ হঠাৎ পান আনলে? রোজ তো মা সেজে দেয়।

পূর্ণর মুখ নিচু। কার্তিক হাত বাড়িয়ে পানশুদ্ধ ধরা হাতটি টেনে এনে পূর্ণকে বিছানায় বসিয়ে দেয়। তারপর এক হাত দিয়ে তার গলা বেড় দিয়ে চিবুকে আলগোছে একটি চুমো খায়—কি,বললে না পান কেন আনলে!

—তোমার বোন বললে যে।

—কি বললে?

—বললে রাতে সোয়ামীকে নিজে হাতে পান সেজে দিতে হয়।

জোড়া পান এক সঙ্গে মুখে পুরে পূর্ণর হাতে ছোট একটি কামড় দিয়ে ছেড়ে দেয় কার্তিক। পূর্ণ অস্ফুটে উঃ করে সরে বসে। মচর মচর পান চিবোতে চিবোতে কার্তিক বলে—বাঃ বাঃ।

—কি?

—তোমার হাতের পান।

পূর্ণ চোখ তোলে—এর চেয়েও ভাল সাজতে পারি। তোমাদের বাড়িতে তো জর্দা নেই। থাকলে দেখতে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সইয়ের মাকে কতো সেজে দিয়েছি। জমিদার গিন্নী তো। তাই জর্দা খান।

—দরকার নেই। বিনি জর্দাতেই বলিহারি।

পূর্ণ লজ্জা পায়। কার্তিক তার মাথাটি টেনে এনে নিজের বুকে রেখে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—আমি জানি আমার বউকে কানবালা পরলে কেমন দেখাবে। কিন্তু কি দরকার। সামান্য মার্কড়ি আর নাকের নথেই যে আমার মন মজে গেছে।

পূর্ণ বুকে ঠোঁট চেপে বলে—তাই বলে আমায় কানবালা দেবে না?

কার্তিক মুখ নামিয়ে এনে বলে—না দোব না। তাহলে যে আমার চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।

—তাহলে বলি শোনো ছোট বউমা। একটা গপ্পো।

তিনজন মানুষ এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যাচ্ছে। বোশেখ মাসের ভর দুপুর বেলা। কি রোদ গো। মাটি যেন রেগে একসা হয়ে তেতে আছেন। পারেন তো চড়চড় করে নিজের বুকখানা চিরে ফেলেন। রোদে মাথা ঝাঁ ঝাঁ

করছে। তেষ্টায় শরীর উস্তম পুস্তম করছে। যেতে যেতে একখানা প্রকাণ্ড মাঠ পড়লো। তেপান্তর। জনমনিষ্যি নেই। যেই না তারা মাঠে পা রেখেছে অমনি আকাশে মেঘ উঠলো। তারপর বাতাস। আর দেখতে দেখতে দুদ্দাড় করে জল এসে পড়লো। দূরে একখানি আখ মাড়াইয়ের ছোট চালা করা ছিল। তারা তো কোনমতে সেইখানে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে জলের ধার খানিক কমল কিন্তু চড়াম চড়াম করে বাজ পড়তে আরম্ভ করেছে। ওঃ কি শব্দ গো। যাকে বলে চোখে আলা কানে তালা। তখন একজন বললে দেখো ভাই, আমাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ একজন অপয়া। বেশ আসছিলাম। খটখটে আকাশ। হঠাৎ এমনধারা রসাতল। এ কি করে হয়।

আব একজন বলে—তা কি করে বুঝবো কে সেই অপয়া।

—ঐ দেখো দূবে একটি তালগাছ।

—বেশ।

—একজন একজন করে যেয়ে ঐ তালগাছ ছুঁয়ে আসতে হবে। যে অপয়া তার মাথাতেই বাজ পড়বে।

সেই যুক্তি পাকা হল। প্রথমজন গেল। কোনমতে গাছ ছুঁয়ে চলে এল। বেঁচে গেল। দ্বিতীয়জনও গিয়ে ফিরে এল। এবারে শেষজনের পালা। সে চেয়ে দেখলো আকাশ আলোয় আলো হয়ে উঠছে আর চড়চড়াত করে বাজ হাঁকছে। সে বললে—ভাই, আমার আর যেয়ে কি হবে। প্রমাণ তো হয়ে গেল আমি অপয়া।

আর দুজন অমনি মাথা নেড়ে বলে—উঁহুঁ, তা হবে না। কথা যখন হয়েছে তখন যেতেই হবে।

কি আর করে। দুগ্গা বলে সে তো মাঠে নামল। এগোয় আর ভাবে এই বুঝি পোলো। গাছের কাছে পৌঁছে যেই'না সামনে হাত বাড়িয়েছে অমনি—আকাশ জ্বলে উঠলো উনুনে ঘি পড়ার মত। মাথার ওপর দিয়ে গুড়গুড়িয়ে দশ ঘোড়ার রথ ছুটে এল আর সে কোনমতে চোখ বুঁজে ইষ্টনাম জপ করতে করতে গাছে হাত ছোঁয়াল। ঠিক তখনি আকাশ উজোড় করে শব্দ হল, পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল, চোখ ঝলসে গেল।

একটু পড়ে—শব্দ জুড়িয়ে আসতে আবার সব জল। বুকটা গুর গুর করছে। চোখ খুলল সে। হ্যাঁ, বেঁচে আছে। বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়নি। কিন্তু একি! পেছনে চেয়ে দেখলো সেই চালাটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাজ পড়েছে সেই পয়া দুজনের মাথায়।

মাস্টারনী ছোট বউ হাঁ করে পূর্ণর কথা শুনছিল। বড়ো বউয়েরও গালে

হাত। পালিত গিন্নী নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—যে পয়া সেই বাঁচল।
ছোট বউ দম ফেলে—সে ছিল বলেই এতক্ষণ আর দুজন মরেনি।
বড়ো বউ চোখ বড়ো করে বলে—সত্যি তুমি অবাক করলে।
পূর্ণ হেসে মাথা হেঁট করে থলি গোছাতে গোছাতে বলে—কি জানি বাপু।

তোমায় বড় ভালবাসি, তাই সব থাকতে আঙ্গিনা চষি।

ফাগুন মাস শেষ হবার মুখে দোল এসে পড়ল। আবার চলেও গেল। আগেকার মতন আর খাটবার ক্ষমতা নেই পূর্ণর। আজ কয় বছর ধরেই ভাবছে এইবার শেষ, আর নয়। কিন্তু প্রতিবারই দেহকে টেনে নিয়ে যায় মন। দোলের আগের দিন রাত্রে চাঁচর থেকে শুরু করে পরদিন সকালে দেবদোল অবধি সমানে সেবা যোগান দিয়ে যায় মন্দিরে। বিকেলে শরীর পাটিয়ে পড়লেও রেহাই নেই। পুতি, তাদের মা সকলকে নিয়ে যেতে হয় ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায়। পাঁপড় আর মণ্ডা কিনে চিবোতে চিবোতে ফেরা হয় অন্ধকার ঘনালে।

বিকেলের দিকে দিনমণির হাত ধরে সেই সেন শিবানন্দর ভিটের দিকে গোবর কুড়োতে গিয়েছিল পূর্ণ। গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সামনের মাঠে ছেলেরা বল খেলছে। তারপরে একটু ঝোপ জঙ্গল, খানাখন্দ আর তার ওপারে উঁচু জমি। ওখানেই শিবানন্দের ভিটে ছিল। আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। পূর্ণ আগে এখানে ভাঙা পাঁচিল দেখেছে, ফটক দেখেছে। এখন টিনে চালা দেওয়া খানকয়েক পাকা কোঠা ভিটের উত্তর অংশে দাঁড়িয়ে আছে। গরু বাঁধা আছে, পাশে জাবনা। আর রয়েছে দুই মাথায় দুটি স্তম্ভ যার গায়ে শাদা পাথরের ফলক। কাঁচরাপাড়ার কোন ভক্ত এ দুটি করে দিয়েছেন। তাদের সারা অঙ্গে গোবর নেদি দেওয়া। বুকের লেখা গোবরের নিচে অনেকখানি ঢেকে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে পূর্ণর মনটা কেমন করে ওঠে। ঝুড়ি নামিয়ে এক দণ্ড বসে। এইখানে এক কার্তিক কৃষ্ণাচতুর্দশীতে খোল করতাল বেজে উঠেছিল ; সোনার বরণ গোরাচাঁদ এই মাটিতে পা রেখেছিলেন। আর আজ সেখানে— ! আর গোবর কুড়ানো হয় না। ফিরে আসতে আসতে মন ভোলানোর জন্যেই বুঝি ঈশ্বরগুপ্তকে মনে পড়ে—সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা, সুবর্ণেই রয়, শ্বেত, শ্যাম, নীল, আদি, বিবর্ণ না হয়।

আসলে মনই তো সব। মন যদি সোনা হয় তো সবই সোনা। কোথাও গোবর নেই, পাঁক নেই। মনে যদি কেউ খাদ মিশিয়ে দেয় তো মহা অনর্থ। তখন আর আগেকার মতন জ্বল জ্বল করে না। ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়।

সেদিন অন্ধকার থাকতে একটি মানুষ এসে হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে।

তখনো সকলের ঘুম ভাঙেনি। কার্তিককুমার উঠে দোর খুলল। কি ব্যাপার, না লোকটি বুঝি আর যন্ত্রণা সইতে পারছেন না। কি হয়েছে না বগলের নিচে ফোড়া। কে তাকে বলেছে পরামাণিকের কাছে যাও, অস্তর করে দেবে। তাই এসেছে। পূর্ণ শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল কর্তার তড়পানি। এখানে হবে না। তোদের নাপিত আলাদা।

—আমি যে প্রাণে ম'লাম বাবা। একটু নরুন বুলিয়ে দাও।

—আমার নরুনের জাত আছে বুঝলি। সে যাকে তাকে কামায় না। বাড়ি গিয়ে ময়না ফল বেটে লাগা। সেরে যাবে।

সে আরো কি বলছিল। সে কথায় কান না দিয়ে কার্তিক দোর দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। পূর্ণ শুনতে পেল মানুষটা কোঁতাতে কোঁতাতে ফিরে যাচ্ছে। পূর্ণ আর থাকতে না পেরে বলল লোকটাকে সেরে দিলে কি ক্ষেতি হতো?

—তুমি ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকো।

—ওর যে বড়ো যন্তন্না।

কার্তিক ঝাপটে ওঠে—তাতে তোমার গব্বো যন্ত্রণা কেন। আমাদেরও তো কুল বলে একটা কথা আছে। বামুন, বদ্যি, কায়েত, গোয়ালা, তিলি এমনি সব উঁচু ঘর নিয়ে আমাদের কারবার।

বেলা হতে ভাসুর বাক্সো হাতে যজমানিতে বেরিয়ে যান। কর্তা কার্তিককুমার বাজারে মণিহর্ন্দি দোকান সামাল দিতে যায়। যাবার আগে লক্ষ্মীকে বলে যায় ঝাল দিয়ে ছোট মাছ রান্না করে রাখতে।

উঠোনের মাঝখানে বড়ো উনুনে ধান সিদ্ধ করবার কড়াই চেপেছে। ধানের মধ্যে গুটি কতক আলু দেওয়া হয়েছে। সেগুলি সিদ্ধ হলে কলাপাতায় তেল নুন আর কাঁচা লংকা চটকে খাওয়া হবে ননদ ভাজে মিলে। কাজের ফাঁকে এই অকাজ বেশ লাগে।

আলু সিদ্ধ হয়। তাবপর লক্ষ্মী কলাপাতা পেতে সেই আলু-চটকাতে বসেছে এমন সময় পারুল এসে দাঁড়ায়। পূর্ণর ঘোমটা এখন সিঁথি ছোঁয়া। সে দেখলো পারুলের মুখ কেমন শুকনো। সেই তেলা ভাব মুছে গিয়ে খড়ি উঠছে। লক্ষ্মী আলু মাখতে মাখতে বলে—এতে একটু তেঁতুল গোলা জল পড়লে বেশ হতো। কি বল পারুল।

পারুল সে কথার কোনো উত্তর করে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুল কচলাতে থাকে। লক্ষ্মী বলে—বলি হল কি তোর?

পারুল আস্তে আস্তে তার পাসে বসে পড়ে বলে—শরীর ব্যাজার।

—কার?

—আমার।

—অ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি—

পারুলের মুখে একটুকরো হাসি এক ঝলক মুখ দেখিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। হাত দিয়ে নিজের মুখের কপট ধুলো ঝেড়ে পিছনে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে—সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

পূর্ণ উঠে দাঁড়ায় রান্নাঘরে যাবে বলে। পারুল অমনি তার হাত ধরে টেনে বলে—কি ভাই, আমি এলাম আর অমনি তোমার উঠবার তাড়া পড়ল।

পূর্ণ আড়ষ্ট গলায় বলে—না এমনি।

—একটু বসো না।

লক্ষ্মী মুখ ঝামটা দেয়—আহা কি আমার কম্মিষ্টি রে। রান্নাঘরে যেন ওনার কতো কাজ।

—আহা ওকে বকিস্ না। ছেলেমানুষ।

এই ছেলেমানুষ কথাটি যে পূর্ণ কতোবার কতোভাবে শুনেছে। বিয়ে হওয়ার পর তো ছেলেমানুষ বউ মানুষ হয়। তখন তার কতো নিয়মকানুন। কতো কাজ। লক্ষ্মী বলে—এক মাগির সাত কাম, ধান কোটে আর চোষে আম। সেই কথার মানে পেটে না নামলেও এখন সত্যিই তাব অনেক কাজ। ধান কোটা, গড়গড়া সাজা, পান সাজা, চৌপর দিন একগলা ঘোমটা টেনে থাকা। দিনমানে কলাবউ, স্বামীর সঙ্গে নিকথা—এসব কি ছেলেমানুষের জন্যে। না হয় সে পুতুল খেলে, এখনো মাঝেসাঝে ননদের কোলে ওঠে, দুপুরবেলা নিরিবিলিতে কাঁইবিচি নিয়ে খেলতে বসে কিন্তু তাই বলে সে কি আর বড়ো হতে পারে না। লক্ষ্মী বাঁকা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বলে—কে বললে ও ছেলেমানুষ। আমার দাদাটিকে যে একেবারে কবজা করে রেখেছে।

পারুল পূর্ণর কাঁধে হাত রেখে একটি নিঃশ্বাস ফেলে—যে মেয়েমানুষ সোয়ামীকে না বশ করতে পারে তার যে নারী জন্মই বৃথা।

লক্ষ্মী অমনি খর খর করে ওঠে—হ্যাঁ, তাই বলে সোয়ামীব নাতি ঝেঁটা খেয়েও তার পদসেবা করতে হবে কি বল্। সে মদভাঙ খাবে, ভেন্ন মাগির কোলে গিয়ে শোবে তবুও তার চরণ ধরে পড়ে থাকতে হবে। তা সেই করলেই তো পারতিস্, মরতে ফিরে এলি কেন অ্যাঁ?

পারুল লক্ষ্মীর দিকে ফিরে তাকায়—দেখ লক্ষ্মী অমন করে বলিস্ না। নিজের গায়েও থুতু লাগবে।

পারুলের এই কথার পিঠে লক্ষ্মীর মুখে যেন থাবা পড়ে। সে গজগজ করতে করতে বলে আচ্ছা, বেন্দাদূতীও সময়ে সময়ে জটিলে কুটিলে হয়। দেখবো

বাঁকা শ্যাম বেন্দ্রাবনে যায় কিনা।

পারুলের চোখ যেন অমনি জ্বলে ওঠে। এলো চুলে ঝাপট মেরে পিঠের ওপর আছড়ে বলে—সে মুখপোড়াব মুখে আখার ছাই।

—ওমা, এ যে দেখি দিবসে স্বপন। বলি সে নাগর গেল কোথায় ?

—মরেছে।

—মানে ?

—একটি বাঁধা মাগ ধরতে বসেছে।

—বিয়ে ?

—হুঁ। পাকা দেখা হয়ে গেছে। বড়লোকের জামাই—কেনা কুত্তা হবে বলে গলা বাড়িয়ে বসে আছে।

—তা ভাল। নিকেব জমি আর ঠিকের মাগ দুই বড়ো পয়জার। কিন্তু আমার যে পাওনাগণ্ডার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়ে গেল। এখন আমি কি করবো। আমার এমন পাকা যজমানি কিনা—

—পারুল হাসে—তোব যজমানি কেন যাবে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমারও হবে—আবাব তোরও।

হেঁসেল থেকে শাশুড়ি কলসি কাঁখে বাইরে এসে এদিকে একবার কটাক্ষ ছোঁড়ে—লক্ষ্মী !

—কি মা ?

—আমি নাইতে চললাম। বলি সকালবেলা গজালি করলেই হবে।

শাশুড়ি গজ গজ করতে করতে খিড়কিব পথ ধবে। পারুলের মুখ সামান্য সময়ের জন্যে কালো হয়। সে হেসে বলে—তোর মার বড়ো চিন্তা কচি বউকে নষ্ট করছি ভেবে। আমি কিন্তু ওকে বড়ো ভালবাসি। প্রথমদিন থেকেই আমি ওর প্রেমে মজেছি।

পারুল দুই হাত দিয়ে পর্ণর গলা জাপটে ধরে চুমো খায়। পূর্ণ অস্বস্তিতে পড়ে। এই মেয়েটির চুমোয় যেন কেমন ঝাঁজ। মোটা পান খেলে যেমন মুখ জ্বলে যায় এও ঠিক তেমনি। পূর্ণ থেবড়ে বসে পড়ে পারুলের ভালবাসার চাপে। পারুল বলে চলে—এমন মেয়েকে কি কেউ ভাল না বেসে পারে। কাত্তিক দাদা তো পুরুষ, আমি মেয়েমানুষ হয়েই পাগল হয়ে গেছি। এখন কি হবে বল্ দিকিনি ?

লক্ষ্মী একটু আলুসিদ্ধ চটকানো মুখে দিয়ে বলে—তোর নীলে বোঝা দায়।

পূর্ণ বলে—ছাড়ো আমার লাগছে।

—ভালবাসায় যে একটু লাগে ভাই। তাহলে আর ভাললাগা বলেছে কেন।

লক্ষ্মী বলে—তা আমার যজমানির কি ব্যবস্থা হল শুনি।

পারুল চোখ টেপে—তারই তো মহড়া হচ্ছে। বলি ও আমার ভালবাসা।

ভালবাসা! পূর্ণ এ কথার কোনো আগাপাছা পায় না। পারুল আবার বলে—তুমি আজ থেকে আমার ভালবাসা কেমন?

পূর্ণ কোনমতে মাথা হেলায়। পারুল বলে—আমার যে বড়ো কষ্ট ভাই।

—কি কষ্ট?

পারুল টেনে একটি নিঃশ্বাস ফেলে—বড়ো ব্যথা।

—কোথায়?

নিজের বুকে হাত দেয় পারুল—এখানে। হুঁ, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, দিনে কোথাও একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারি না। কি করি বলতো।

—তাই তো। তা ওষুধপত্তর খেলে হয় না।

—ধুর—এ যে বিষফোঁড়া, অস্তর না করলে সারবে না।

লক্ষ্মী বলে ওঠে—ওকে কি সব যা তা বলছিস্। কাঁচা মাথা চিবুতে ভাল লাগে নয়।

—থাম্ দিকিনি। তোর যজমানির উপায় করছি। বিষফোঁড়ায় অস্তর না করলে কি পুঁজ রক্ত বেরোয়।

পূর্ণ একবার এর মুখে আর একবার ওর মুখে তাকায়। যেন আকাশে আকাশে কথা হচ্ছে। কথা মাটিতে আর নামছে না। পারুল পূর্ণর মুখের কাছে মুখ এনে বলে—ও ভাই ভালবাসা, তুমি আমার উপায় করে দাও না। —কি?

—বেশী কিছু না। কেবল একটু অস্তর করবার ব্যবস্থা।

—তা আমি কি করবো?

—তোমার হাতেই তো সব।

পূর্ণর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আজ সকালবেলা কর্তা সেই লোকটিকে একটি বিধান দিয়েছিল বটে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ময়না ফল বেটে লাগাও সেরে যাবে।

লক্ষ্মী আবার বলে—তোর কথা কিন্তু আমার ভাল লাগছে না পারুল। কেন মেয়েটার মনে বিষ ঢালছিস্।

পারুল হঠাৎ ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। রাগে মাদী বিড়ালের মতন গরগর করতে থাকে। নাকের ছিদ্র ফুলে ওঠে, গরম নিঃশ্বাস পড়তে থাকে আর হাতের নখ দিয়ে নিজের পায়ের চামড়ায় আঁচড় টেনে দেয়। অমনি সেখান থেকে রক্ত দানার মুখ ফোটে বিন্দু বিন্দু। পারুল বলে—দেখলি বিষের রঙ। তোর মধ্যেও

আছে আবার এর মধ্যেও। আমারটা দেখা যায় আর তোদেরটা চামড়ার মধ্যে লুকোনো থাকে।

—কি বলতে চাস্ তুই। লক্ষ্মী ফোঁস করে ওঠে।

—বলছি তোর যজমানিটা এবার থেকে ঘরে ঘরেই হোক না কেন। তোকে না হয় পাওনাগণ্ডা ডবল করে দোবো। তোকে খালি একটু পথ করে দিতে হবে।

—মানে ?

—আহা ন্যাকা। নাপতেনীর মেয়েকে আবার নতুন করে বিদ্যে বোঝাতে হবে।

পূর্ণ একটু সরে বসে। পারুল নিজের বুকে হাত রেখে বলে—কাত্তিক ঠাকুরের হাতের নরুন তো কথা কয়। কতো দেশ থেকে মানুষ আসে অস্তর করাতে। আর আমি তোর সই হয়ে পড়ে পড়ে যাতনা পাব। ঘরের কাছের মানুষ বলে কথা।

লক্ষ্মী সটান দাঁড়িয়ে ওঠে—কি বলছিস্ তুই!

'পারুল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বলে—তোর পায়ে পড়ি। একটু বলে দে না ভাই। একটিবার নরুন ছোঁয়ালে বিষ শেকড় শুদ্ধ উপড়ে যাবে। ও ভাই ভালবাসা, তুমি কিছু বললে না তো।

পূর্ণ আরো একটু সরে যায়। পারুল হাসে—সরে গেলেই বা। ভালো যখন বেসেছি তখন বিষও যে নিতে হবে। আমি কেন একা একা জ্বলে মরবো বলতে পারিস্। কি করেছি আমি। আমায় কি শ্যাল কুকুরে জন্ম দিয়েছে বল্। বল্না আমি তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি। আমি কেন এমন করি ভাই। তোর সুখ দেখলে কেন আমার যন্ত্রনা হয় বল্ বল্—

পারুল মুখে হাত চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। পিঠের এলোচুল মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে মাটিতে পড়ে। শরীরটা থর থর করে কাঁপতে থাকে। পূর্ণ থ হয়ে বসে বসে দেখে লক্ষ্মীও আঁচলে মুখ ঢেকেছে। দুইজনেই কাঁদছে। একটু আগেই যে মেয়ে রাগঝাল দেখাচ্ছিল, ভালবাসার কথা বলছিল সেই এখন কেঁদে গঙ্গা। সত্যি এদের লীলা বোঝা দায়। একটু আগে এরা পূর্ণকে ছেলেমানুষ বলছিল। আর এখন যে তারা ছেলেমানুষীর হদ্দ করে ছাড়ছে। এর বেলা বুঝি কোনো দোষ হয় না। এখন কে সামাল দেবে। পূর্ণ হেঁসেলে উঠে যায়।

একটু পরে উঁকি মেরে দেখে পারুল চলে গেছে। আর লক্ষ্মী ঠিক তেমনি মাথা হেঁট করে বসে আছে মাথার ওপর রোদ নিয়ে। কড়াইতে ধানের জল

শুকিয়ে এসেছে। চিমসে ধোঁয়া উঠছে আর চড়চড় শব্দ হচ্ছে। পাশে রাখা কলার পাতায় আলু চটকানো পড়ে আছে। তাতে লাল পিঁপড়ে উঠছে সার দিয়ে। কোনো খেয়াল নেই।

পূর্ণ ছুটে এসে কড়াইতে এক কলসি জল ঢেলে দেয়।

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। কেবলি এ পাশ ও পাশ করে। কার্তিককুমার ঘুমিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণর উশখুশুনিতে তারও ঘুম চটে যায়। পাশ ফিরে বলে—কি হল, ঘুমোও নি যে?

পূর্ণ স্থির হয়ে যায়। মনে পড়ে সকালবেলাকার সেই দুই ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের কথা, বিষফোড়ার যাতনার কথা আর সেই ভালবাসার কথা। অমনি মন কেমন করে। মনে পড়ে একলা মা জননীর চোখ দুটি, চিতা শয্যায় শয়ান বাবার হাঁ করা মুখের আগায় পিণ্ড লেগে থাকার ছবি। আরো মনে পড়ে আকাশ ঢাকা গাছগাছালির ছায়ায় রোদের কাটা ছেঁড়া আলপনা আঁকা পথের পাশে পড়ে থাকা সেই মাণিকটির কথা। ফেলে রেখে এসেছে পিছনে। অনেক দূরে। পূর্ণর চোখে ঝেঁপে জল আসে। তার সঙ্গে বাতাসের ফোঁসফোঁসানি। কার্তিক তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে—একি! কাঁদছো কেন?

পূর্ণ কথা বলতে পারে না। কাঁদলে কি কথা আসে। কার্তিক তার মুখটি সামনে ঘুরিয়ে এনে বলে—কি হয়েছে গো। আমায় বলো। মার জন্যে মন কেমন করছে?

পূর্ণ ফোঁপায়—যন্তন্না করছে।

—কোথায়?

শাঁখা পরা ছোট হাতটি নিজের সদ্য ফুটি ফুটি বুকের ওপর রেখে পূর্ণ বলে—এখেনে।

কার্তিক হেসে মুখ নামিয়ে আনে পূর্ণশীর যন্ত্রণার স্থানে।

নাও ঘোড়া নারী, যে চড়ে তারি।

যে বৃক্ষের আশ্রয়ে কেবলমাত্র আকাশ সম্বল করে ওঠা হয়েছিল তার দেহে যখন ফলের গোটা জমতে শুরু করে তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না। চোখের সামনে একটি দুটি করে মুকুল ধরে, সেই ফুলের পাখনা গুঁড়ো হয়ে কতো না ঝরে যায় অকালে। যারা টিকে যায় তারাই বেঁচেবর্তে থাকতে চায় শেষ দিন অবধি। সকলে শেষ দেখে না। শেষের কি আর কোনো সীমা আছে। এমন কি কোনো আইন আছে যে এইখানে এসে একটি দাঁড়ি পড়বে। তবুও

পড়ে। কেননা এইটাই যে জগতে একমাত্র সত্যিকথা। এই সত্যের কখনো অপলাপ হয় না। জগতে যে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের। তবুও মানুষ কাঁদে, ভেবে ভেবে সারা হয় আমি গেলে এদের কি হবে। কে এদের ভার বইবে। কিন্তু কারো ভার কেউ যে বয়না একথা কে আর বোঝে। নিজেকে নিজের ভার বইতে হয় সারাজীবন। বইতে বইতে মনে কড়া পড়ে যায়, জায়গাটা একদিন ঝিঝি লেগে অসাড় হয়ে যায়। অবোধা মানুষ তবুও বোঝে না, সব কিছু টেনে হিঁচড়ে জেবড়ে বসে থাকে। এইখানে ঘর হবে, ঐ খানে বাগবাগিচা। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতেই নিজের অজান্তেই প্রদীপে তেল ফুরিয়ে আসে। তারপর এক সময় বড়ো এজলাসের শমন বেঁধে নিতে আসে, প্রদীপ নিবে যায়, শেষ দাঁড়ির দাগ পড়ে। কাঁচা খাতা থেকে পাকা খাতায় নাম ওঠে, পাশে লাল ইলেক পড়ে যায়।

এরই মধ্যে কেউ আবার গুটিতে ঝরে, কাঁচায় খসে যায়। কাউকে বা ইঁদুরে বাঁদরে খায়। কেউ বা বর্ষায় তাপে দরকচা মেরে যায়। আর অনেকেই টুকটুকে পাকা ফলটি হয়ে বোঁটা কামড়ে দুলতে থাকে মাটির দিকে চেয়ে। কখন বুঝি মাটি ডাক দিয়ে টেনে নেয়। পূর্ণশশীর অবস্থা ঠিক ঐ পাকা ফলটির মতন। চৈত্র মাসের আকাশে মাথা তোলা ঐ আশ্রয়দাতার ডাল পাতা ঝাঁপিয়ে আমের গুটি ধরেছে। এখনো পিছনের ফুল খসেনি সকলের। ফুল খসলে তো নাড়ি কাটা হবে। পূর্ণ মনে ভেবে রেখেছে আমবারুণীতে মা গঙ্গাকে প্রথম ফল দান করে তারপর নিজের ভোগে দেবে।

চৈত্র মাসের রোদে ছোট ছেলেটাকে পেতে দিয়ে কাজলী গেছে বাগের মোড়ে ছেলের কাছে। আজ বেতনের দিন। হারাধন দুই হপ্তা হল বসে আছে। আবার কবে ডাক পড়বে কে জানে। সকালে উঠে অভ্যাস মতন সাইকেল নিয়ে বার হয়। কোথায় যায় কোন ধান্ধা করে কে জানে। ফেরে দুপুরে। কাজলী গেছে ছেলের কাছে যদি সকালেই টাকাটা দিয়ে দেয় এই আশায়। বাদলী কুকুর ছানাটির সঙ্গে খেলছে পাশের পথে। মেয়ে ডাগর যত না হয় তার চেয়ে বেশী ডাগর হয় ঐ কুকুরের ছা। শীতের বাঁধন কাটতে না কাটতে গায়ের রোঁয়া মোটা হয়েছে, নেতানো কান আস্তে সিধে হচ্ছে আর পায়ের গোছ ভারি হয়ে সেখানে বল এসেছে। লোকে বলে পাতেরটা কুকুরকে দিলে তাতেই তার পেট ভরে। কিন্তু হায়, পাতে যে কিছুই থাকতে চায় না। যা দিতে হয়, জোর করে, সকলের পেট মেরে। মানুষের কুঁড়োর ভাগীদার ঐ অনাথ পশু। হারাধন রাগ করে, সকলের ওপরে। কিন্তু হায়, পাতে যে কিছুই থাকতে চায় না। হারাধন একদিন রাগ করে বলেছিল—মানুষেরই ভাত জোটে না, তার ওপর এই উটকো

জানোয়ার।

পূর্ণ বলে—তোর ছেলে খাবার জন্যে কাঁদবে কিন্তু ও উত্যক্ত করবে না। ওকে খেদাস নে। ও যে আমাদের রক্ষে করে।

সানকিতে চাল বাছতে বাছতে রোদে পড়া নাতি পাহারা দিতে দিতে পূর্ণ ভাবে—চৈতের রোদ পুতকে আর ভাদরের রোদ ভূতকে। ভালমন্দ পথ্যি বা দুধ না জোটে একটু রোদ তো থাক নররাক্ষস। এতে তো আর ট্যাস্‌কো লাগবে না। এই রোদ জলই যে গরীবের সহায়। যে মানুষ জন্মেই মাথায় আকাশ তার জন্যে তো পৃথিবীর জল মাটিই একমাত্র সম্বল। সকলের সঙ্গে তাই ভাগ যোগ করে নিতে হয়, বিবাদ করতে নেই। কেবল যা কলহ বাধে ঐ মাটি নিয়ে। সে ভাবনা না হয় এখনকার মতন তোলা থাক।

স্বামীর ঘর যখন পর হল সে তো আরো পরের কথা। সেই পরেই শোনা হয়েছিল ফেলে আসা দিনগুলির জন্যে বরাদ্দ অনেক কথা। হিসাব করতে বসলে মিলে যায় আর তখনি অবাক বনে যেতে হয়। যেমন কিনা উকিল-মা বলতেন যতোদিন এই জগৎ ঠিক ততোদিনই মানুষে মানুষে বিবাদ দখল নিয়ে। সে দখলের মূল বিষয় হল মাটি আর মেয়েমানুষ। কে দখল করবে, কে ভোগ করবে, বুকে চেপে বসবে এই নিয়েই যতো তুলকালাম কাণ্ড। কিন্তু মাটি না থাকলে সৃষ্টি হয় না আবার নারী না হলেও না। আবার থাকলেও অনাসৃষ্টি।

লক্ষ্মী বড়ো মুখরা। সোজা কথায় যাকে বলে বউ কাঁটকি ননদিনী। প্রতি কথাতেই একটি করে ছুতো খুঁজে নেয়। কিছু বলবার নেই। শোকাতপা মেয়ে, স্বামীর আদর কি তা জানে না। তাই বাপের বাড়ির আদরে কমতি হওয়া চলবে না। এ বাড়িতে সকলেই তাকে সমঝে চলে। এমনকি ভাসুর নবনীধরও। পূর্ণ কিন্তু মনে মনে লক্ষ্মীকে ভয় করে না মুখে যাই বলুক না। সেদিন সকালে পারুলের সঙ্গে বসে কাঁদতে দেখার পর থেকেই তার মন ঘুরে গিয়েছিল। বাইরে মেয়ে মুখরা, কড়া কিন্তু শুকনো বালির ভিতরেও যে জল বয়। লক্ষ্মীর চোখের জলের বহরে কতোখানি তলাতল আছে তা ভাবনার মন এখনো তৈরি না হলেও পূর্ণ এইটুকু বুঝেছিল আসলে ননদিনী মানুষ মন্দ না। পূর্ণকে মুখে যাই বলুক না কেন সেই তো তাকে কোলে করে বেড়ায়, চুল বেঁধে দেয়, পুতুলের জামাকাপড় তৈরি করে দেয়।

এ সংসারে আর একজন নিরিবিলি মানুষ আছে। সে হল বড়ো জা। একটা মানুষ যে এ বাড়িতে রয়েছে তা বোঝা যায় না। সারাদিন মুখ বুজে সংসারের ঘানি ঠেলে চলেছে কিন্তু মুখে রা টি নেই। সকাল থেকে উঠে রাত অবধি তার

চার হাত পায়ের কোনো বিরাম নেই। চলছে, সব সময় চলছে। লক্ষ্মী তাকে ঠোকরাতেও ছাড়ে না। সময় সুযোগের ধার ধারে না। সে যে এমন স্বভাবের একথা তার নিজেরও অজানা নয়। একদিন লক্ষ্মী পূর্ণকে বলে—কোঁদল না করলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না।

—ওমা সে কি কথা। এ তো দেখছি ব্যামো।

—হ্যাঁ, তা একরকম বই কি।

—কিন্তু কিছু না পেলে কি করে কোঁদল করবে।

—ওমা জানিস্ না বুঝি। তবে শোন বলি। এক গাঁয়ে একজন নামকরা জাঁহাবেজে মেয়েছেলে ছিল। পাড়াপড়শি, গেরামবাসী এমনকি কাক শালিকও জানতো তার মুখের কথা। ঝগড়া না করলে তার দিন খারাপ যেতো, রাতে ঘুম হতো না, প্রাণ আইঢাই করতো। কিন্তু রোজ রোজ কি আর ঝগড়ার যোগান হয়। এক একটা দিন নির্জলা উপোস। এমনি একদিনে সারাদিন ঝগড়া না করে তার মন বড়ো ব্যাজার। কি করি কি করি ভাব। কোথায় ছুতো পাই এই ভাবনা। হঠাৎ দেখলো ঝাঁটাখানা সদর দরোজার পাশে দাঁড় করানো আছে। বস্ আর যায় কোথায়। কোমরে না আঁচল বেঁধে, মাথার খোঁপা এই টঙে তুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—ওরে মড়াখেগো মুড়ো ঝাঁটা, বলি থাকবার আর জায়গা পেলিনে। বেছে বেছে ঠিক এই দরজার পাশটিতে। মুখে আগুন, নিব্বংশ হ, গঙ্গাভরা। মর মর, ভোঁতলার গাবায় যা।

পূর্ণ হেসে মরে। লক্ষ্মী অমনি চেঁচিয়ে ওঠে—বলি এতো হাসির কি হল লা। ঘরের বউ কিনা হাসবে বাজারে মেয়েছেলের মতন।

অমনি হাসি মিলিয়ে যায় পূর্ণর মুখ থেকে। চোখের পাতা ভিজে আসে। তার বেশী না। যদি দৈবাৎ জল পড়ে তাহলে আবার অন্য কাণ্ড। হয় গলা আরো চড়বে—ওমা দেখে যাওগো তোমার ক্ষীরের পুতুল বউকে। আহা, একেবারে ননীর তৈরি মন গা। যাও বাছা, ববের কোঁচার তলায় গিয়ে বসে থাকোগে। আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না। চিৎকার অনর্থ করে লক্ষ্মী উঠে চলে যায়। তিন চারদিন কথা বলে না, মুখের দিকে তাকায় না। এমনকি পূর্ণর সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায় না। সে এলে পাতে জল ঢেলে উঠে যায়। পূর্ণ একলা একলা কলাই শুকোতে দেয়, সোনার জন্যে বিচালি কাটে, পুতুল খেলে। তারপর হঠাৎ একদিন পিছন থেকে এসে জাপটে ধরে লক্ষ্মী।—বলি মান বড়ো না মন বড়ো রাই।

পূর্ণ আড়ষ্ট। কোনো কথা বলতে পারে না। লক্ষ্মী দুম করে কোলে তুলে নেয় পূর্ণকে। পূর্ণ হাত পা ছোঁড়ে, বলে—না না আমায় নামিয়ে দাও।

লক্ষ্মী চোখ পাকিয়ে বলে—নেহাৎ তুই আমার সম্মানে বড়ো। না হলে দুগালে ঠাস্ ঠাস্ করে—

জা রান্নাঘরের পাশ থেকে দেখে আর মুখ টিপে হাসে।

ঘোড়ার অসুখ করেছে আজ তিন চারদিন। খায় না, দায় না। পা পেতে দাঁড়াতে পারে না। কেউ কাছে গেলে কামড়াতে আসে। কেবল কার্তিক গেলে, মাথা হেঁট করে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে। সোনা যেন সত্যিই কর্তার কানের সোনা। তার ব্যামো হয়ে অবধি কর্তার মন ভাল নেই। দোকানে যায় না। যজমান এলে দাদাকে দেখিয়ে দেয়। সারাদিন সোনার কাছে বসে থাকে। আর সময় নেই অসময় নেই হুটহাট বেরিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে—বেদে খুঁজতে যাচ্ছি। ওর চিকিৎসা করতে হবে না। নানা মুনি নানা বিধান দেয়। কে একজন বলল বেশ চপচপে করে ঘি দিয়ে হালুয়া রেঁধে খাওযাও। হ্যাঁ, যেন কাঠের জ্বাল না দেওয়া হয়, কেবল নারকেল পাতা। বাস্ আর দেখে কে, কর্তা ঘোড়া-ঘরের পাশে মেটে উনুন পেতে তাতে নারকেল পাতার জ্বাল দিয়ে এই প্রকাণ্ড এক কড়ায় হালুয়া রাঁধতে বসল। ঘটি উপুড় করে ঘি ঢেলে দিলো। ভাসুর কটাক্ষ করে বলেন—ওরে, তোরও যে দেখি ঘোড়া রোগ ধরেছে।

দাদার মুখের ওপর কথা বলে না কর্তা। কেবল একবার কটমটিয়ে তাকায় আর নারকেল পাতার গোছা ঠেসে ধরে উনুনে। কিন্তু এতো করেও ঘোড়া ধাতে আসে না। শেষে কোথা থেকে এক গো-বেদে ধরে নিয়ে এল। সে এসে বেশ ভাল করে দেখে বলল ওর পায়ে নাকি এঁশো লেগেছে। কি সমস্ত গাছ-গাছড়ার রস করে পায়ে লাগিয়ে লোহার নাল পরিয়ে দিলো। তার পরদিনই ঘোড়া আবার নেচে উঠলো আগের মতন। কার্তিক ঘোড়ায় চেপে এক অশৌচ বাড়ির কামান সারতে গেল।

সেদিন রাতে গড়গড়া টানতে টানতে কার্তিক বলে—সোনার রোগ আসলে মনে।

পূর্ণ কর্তার আনমনা চাউনি দেখে বোঝে ঘোড়ার চিন্তা এখনো তার মাথা থেকে নামেনি। সে আস্তে করে বলে—ঘোড়ার মনের কথা কি করে জানলে গা ?

মুখ থেকে সটকা সরিয়ে কার্তিক বলে—যেমন করে তোমারটি জানি।

—ওমা সে কি কথা। ঘোড়া আর আমি কি সমান।

—হ্যাঁ, দুজনেই যে মেয়েমানুষ। আর দুজনেরই দখলদার যে আমি।

কার্তিক মিটি মিটি হাসতে থাকে। ঠারে ঠোরে বললেও কর্তার কথাটি কতক কতক আঁচ করে পূর্ণ। সে মুখ নিচু করে বলে—তোমার মুখ ভাল না।

কার্তিক ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে—বাঃ বাঃ। কে বলে আমার বউ ন্যাকা হাবা। হুঁ হুঁ, বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে। তাই তো বলি বড়ো বাড বেড়েছে তোমার।

—পাশেব ঘরে লোক রয়েছে না।

—এবারে বুঝলে তো কেন সোনাব আব তোমার মন বুঝি। তাই তো বলছিলাম ওর রোগ বাপু মনে।

—কি রোগ?

—এ রোগ বিয়েব আগে আমাবও হয়েছিল।

—সে কি কথা।

—হ্যাঁ। লক্ষ্মীকে দেখছো না। ওবও তো এক রোগ।

সত্যি মানুষটার মুখে কিছু আটকায় না। শেষকালে নিজের বোনকেও টেনে আনল। কাউকেই কি ছেড়ে দেয় না। পূর্ণ কি আব বলবে। মাথা নামিয়ে নখ খোঁটে। কার্তিক হাসে—না না। এতে লজ্জা পাবাব কিছু নেইকো। আসলে সোনার এখন যৈবনকাল। এ বয়েসে কি মেযেমানুষের পুরুষ ছাড়া চলে। তাই ভাবছি এবাব একটু ওব যজমানি কববো। ওব একটি পাত্তর দেখবো।

—কি বলছো!

—হ্যাঁ। ওব জন্যে একটা ঘোড়া কিনবো।

কর্তাব এই বাক্যটি শোনার পর পূর্ণ পাশ ফিবে শোয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজোড়া পানসে মুখ। একটি লক্ষ্মীদাসীব আব অপবটি পারুলের। এতো কোন্দল বিবাদ কিংবা হাসি মসকবা দিয়ে সে মুখ চাপা থাকে না। চোখের নয়ানজুলিব কালি সারা মুখে চারিয়ে যায়। এক এক দিন সকালে লক্ষ্মীর মুখ দেখলে মনে হয় কে যেন ভুষো লেপে দিয়েছে। মচব মচর পানে ঠোঁট বাঙালেও পারুলের শুকনো ঠোঁট ভেজে না। হাজাব হাসি বাজলেও তার পিছনে কান্না ওৎ পেতে বসে থাকে। সত্যি কর্তা ঠিক বলেছে। এ ঘোড়া রোগ কোনো ওষুধে সারে না। কোনো ঝাড়ন উচাটনে কাজ হয় না। পারুলের যেমন তেমন একটি পুরুষ ছিল সেই ঠিকেব জমিব মতন। লক্ষ্মী তাদেব মাঝখানের সাঁকো। কিন্তু এখন যে পাখি উড়ে গেছে। আব তাই দুজনের বুকের বিষফোড়াব ব্যথা প্রবল। কর্তা কাঁচা মাথায় এ সব কি যাতা ভাবনা গুঁজে দিলো। পূর্ণ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কার্তিক বলে—কি হল? অমন চমকে উঠলে যে?

—একজনার কথা মনে পড়ল।

—কার কথা?

পূর্ণ দম নেয় একটু থেকে।—পারুল।

—ঘোষেদের ঐ নষ্ট মেয়েটা ?

—কেন ? নষ্ট কেন ?

—যে মেয়ে পর পুরুষে মজে সে কি সতী সাবিত্রী।

—পারুলের আবার বিয়ে হয় না ?

—কে ওকে বিয়ে করবে। মেয়েছেলে একবার এঁটো হয়ে গেলে তাকে কি আর ভদ্দরলোকে নেয়।

—এঁটো।

—হ্যাঁ। তাই বলে তুমি নও। তোমার বাঁধা পুরুষ আছে ধম্ম সাক্ষী করা। আচ্ছা তোমার মাথায় এই সব কুচিন্তা কে ঢোকাচ্ছে বলতো। লক্ষ্মী নয় ?

—না না। সে ভাল, ভাল।

—পারুলও তো এ বাড়ি আসে।

—মাঝে মধ্যে।

—ওর সঙ্গে বেশী কথা কোয়ো না। মেয়েটা বদ।

একটু পরেই কার্তিকের নাক বেজে ওঠে। সারাদিনেব খাটনির পর মানুষটা তলিয়ে গেছে রসাতলে। পূর্ণর কিন্তু ঘুম আসে না। ছেলেমানুষীর কাল যে এতো তাড়াতাড়ি ফুরোতে বসবে তা কি সে জানতো। এখনো যে মেয়ে পুতুল সাজায় তার মাথায় কি এতো ভাবনা মানায়। কিন্তু সে তো আর ভাবনা যেচে মাথায় নেয় না, এ যে বানের জলের মত হুড়মুড় করে মাথায় সেঁধিয়ে যায়। ছেলেমানুষের কাঁচা মাথায় একসময় পাকা চিন্তার ফল দরকচা মেরে যায়। তাই ভাবনা এক জায়গায় এসে ঠেক খায়, আর এগোতে পথ পায় না। এখন কর্তার কথার খেই ধরে মনের মধ্যে কেবল একটি কথাই মাথা কোটে। যে মেয়েব বেটাছেলে নেই তার যৈবনকাল বৃথা। কেউ তার দখলদার নেই। সে হল ছাড়া মাদী ঘোড়া। যেমন তেমন চরে বেড়ায়, যা পায় তাই খায়। তাই বুঝি তার পায়ে এঁশো লাগে, বুকে বিষ ব্যথা ধরে। পূর্ণর তপ্ত বুক থেকে একটি ভারি নিঃশ্বাস উঠে হাঁপ ছাড়বার পথ খোঁজে। বুক ভার লাগে বুঝতে না পারা দুঃখের শিল চাপায়।

পরদিন সকালে পূর্ণ ঢেঁকি-ঘরে ধান এগিয়ে দিচ্ছে আর লক্ষ্মী পাড় দিচ্ছে। এমন সময় উঠোনে এসে দাঁড়ায় সেই পুকুর পাড়ে দেখা লোকটি। পারুলের কেষ্ট ঠাকুর আর লক্ষ্মীর উড়ো যজমান। পূর্ণ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়।

লক্ষ্মী চাপা গলায় বলে—হারামজাদা।

—কাত্তিক আছিস্‌রে কাত্তিক।

লোকটি ডাক দেয়। ভিতর থেকে কার্তিক বেরিয়ে আসে। হাতে থলি। তাতে দোকানের মালপত্র।—কিরে। কি খবর?

—তুই বেরোবি নাকি?

—হ্যাঁ। না বেরোলে কি আর চলে। তোর মত ঘরে বসে খাবার কপাল তো করিনি রে শাদা নন্দ।

তাহলে লোকটির নাম নন্দ। কিন্তু শাদা কেন। পূর্ণ আস্তে বলে—ঠাকুরঝি ও শাদা নন্দ কেন?

—এ গাঁয়ে আর একজন কালো নন্দ আছে। ওর রঙ ধলা বলে লোকে ঐ বলে ডাকে।

—ওমা!

—হ্যাঁ। কিন্তু ঐ হারামজাদার নামই কালো হওয়া উচিত।

নন্দ বলে—তোকে বলতে এলাম। পরশু আমার বিয়ের বরযাত্তর যেতে হবে। সব তো শুনেছিস্।

—তা না হয় যাবো। কিন্তু আমার পাওনা-গণ্ডা?

—সে জন্যে তোর ভাবনা নেই। পরামাণিকের কাজ তো তোর বাঁধা। না হলে কি আমার ঘাড়ে মাথা থাকবে।

—হুঁ, আমাকে বাদ দিলে তোর বউ পাগল হয়ে যাবে।

লক্ষ্মী হিসহিস করে—তোর বউ এমনিতেই পাগল হয়ে যাবে। যা গুণের কানাই। পারুলের অভিশাপ কোথায় যাবে।

—কি বলছো ঠাকুরঝি। শুনতে পেলে?

—থাক গে। হোক না বিয়ে। ওর ঘরে গিয়ে আমিই ভাঙ্চি দোবো। ওর বউয়ের মন বিষ করে দোবো। আমিও নাপতের ঝাড়ের বাঁশ।

পূর্ণ ঘোমটার ভিতর থেকে দেখে লক্ষ্মীর চোখে আগুন জ্বলছে। সেদিকে তাকালে বুঝি নজর পুড়ে যায়। ওদিকে নন্দ বলে—আর শোন্, সঙ্গে করে তোর বাজনাটা নিয়ে যাবি। না হলে বাসরে গান জমবে না।

কার্তিক নন্দর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। পূর্ণ ঘোমটা তুলে দেয়। দেখে দূরে খোঁটায় বাঁধা ঘুড়ি শূন্য চোখে তার সওয়ারির চলে যাওয়া দেখছে। আজ আর কর্তা তাকে নিল না। সোনার সামনে জাবনা পড়ে আছে সে দিকে মন নেই তার। মুখ তুলে হাওয়া শুঁখছে, লেজের ঝাপটা মারছে নিজের দেহে। চোখের ভাবখানা এমন যে—বলা যায় না হয়তো আবার ফিরেও আসতে পারে সে।

পূর্ণ ধানের কাঁড়ি এগিয়ে দেয় আর ভাবে পুরুষ মানুষ কি কখনো এঁটো হয় না। সে কি কোনদিনও নষ্ট হয়ে যায় না। সত্যি কি সোনার আংটি বেঁকা হলেও

ফেলনা হয় না। কে জানে।

মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক।

আজ আষাঢ় মাসের ছয় তারিখ। কাল সাতুই। এর মধ্যে ছটি মাস এই নতুন মাটিতে বাস করা হল। এই ফাঁকে সূর্যদেব আধখানা পথ চলে এসেছেন। পিছনে ফেলে রেখে এসেছেন দিন-রাত্রি আর তিনটি ভিন্ন তন্ত্রের ঋতু। এক একজনের মর্জি আলাদা। সেই ধারা মোতাবেক রোদের ঝাল কমে বাড়ে, আকাশে মেঘ জমে আবার ছানা কাটে, বাতাসের সোয়াদ বদলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটিরও রঙ পালটায়। পৃথিবী হলেন এক রঙবেরঙা বহুরূপী—গিরগিটি। সব কিছু মানিয়ে নিতে জানেন তিনি। যার যেমন তার তেমন, কারো সঙ্গে বিবাদ কলহ নেই। বিবাদ হলেই ভূমিকম্প, বান, মহাপ্রলয় ঘটে।

দোলের সময় জমিদারবাবুর ছেলে ললিত আর তার পরিবার এসেছিলেন। সে সময় তাঁরা জেনে গেছেন নতুন বাস্তু পত্তনের সমাচার। ফলে বারমহল এখন শূন্য। ললিত বলে গেছেন যেন দুর্গোৎসবের দিন থেকে পূর্ণ সেখানে গিয়ে থাকে। সে না হলে পূজা উঠবে না। কেন না এখনো বাড়ির মেয়ে বউ এমনকি গিন্নীও আচার-বিচার যোগাড় কিছুই জানে না। জানবার ইচ্ছেও নেই। পূর্ণ রেহাই চেয়েছে। কিন্তু সে কথার কোনো উত্তর মেলেনি।

বৈশাখ মাসের গোড়ায় হারাধন কার কাছ থেকে যেন একটি ছাগলছানা চেয়ে এনেছে। তার বাড়-বৃদ্ধি হলে ছেলেপুলে আর বুড়ি দিদিমা দুধ খাবে। বাড়িতে এখন দুটি পশু। কুকুর ছানা ছাগল মিলে ছয়লাপ। কুকুরটির নাম রেখেছে হারাধন মটর। তাহলে কি ছাগলের নাম হবে ছোলা। দিনমণি আমতলার দখিন কোণে ঝড়তি পড়তি বাঁশ আর চট দিয়ে ছাগলের জন্যে ছোট ঘর তুলে দিয়েছে। মটর বাইরেই থাকে। সারারাত ভুক ভুক করে ডাকে। যৌবনকাল এলেই ডাক গম্ভীর হবে।

আজ বাদ কাল সাতুই আষাঢ়। আর কালই অম্বুবাচী শুরু। মন্দিরের পুরোহিত পাঁজি দেখে বলে দিয়েছেন অম্বুবাচীর ধরা ছাড়ার সময়। কিন্তু পূর্ণ অতো ঘণ্টা মিনিট বোঝে না। বিধবা হয়ে অবধি জানা আছে—'জানি না পাঁজি পুঁথি সাতুই হবে অম্বুবাচী।' আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচীর দিন।

আষাঢ়ে রথ। তার আগে শাশুড়ির অম্বুবাচী পারণ দেখলো পূর্ণ। আর দেখলো লক্ষ্মীও মায়ের সঙ্গে ফলফুলুরির ভাগ বসায়। শাশুড়ি পূর্ণর হাতেও

সাবুমাখা ডেলা তুলে দেন। পূর্ণ খায় আর মার কথা মনে করে।

রথের কদিন আগে থাকতে তোড়জোড় পড়ে গেল। কার্তিককুমার নৌকায় করে মণিহারি জিনিসপত্র নিয়ে যাবে গুপ্তিপাড়ার রথের মেলায়। ওখানে দোকান দেবে। সঙ্গে যাবে বড়ো ভাসুর-পো নিমাই। রথের কথায় মনে পড়ে গ্রাম কাঁচরাপাড়ার রথের মেলার ছবি। কৃষ্ণদেবরাইয়ের রথেব ধুমের কথা সাতগ্রামের মানুষ জানে। কতো দেশ বিদেশের মানুষ আসে। প্রকাণ্ড লোহার রথ সারা বছর বাইরে পড়ে রোদ-জল খায়, জং ধরে। রথের আগে ঝাড় পোছ্ হয়, রঙ পড়ে। রথের উৎসবে মায়ের সঙ্গে সেও ঠাকুরবাড়িতে পালা যোগান দিয়ে এসেছে। এখন সেই রথ থেকে পূর্ণ কতো দূরে।

কার্তিককুমারের যাত্রা করবার আগের দিন রাতে পূর্ণ বলে—হ্যাঁ গা, গুপ্তিপাড়ার রথে না গিয়ে কাঁচরাপাড়ায় গেলে হয় না।

কার্তিক চোখে কপালে তুলে দেয়—সে কি ! আমি না সে দেশের জামাই। শ্বশুরবাড়িব দেশে কি জামাই ব্যবসা করতে যায়।

—কেন ? তাতে কি ক্ষেতি ?

—কোনো লাভ নেই। জামাই গেলে লোকে অমনিই ঠকিয়ে নেবে খন। আর তাছাডা কোথায় গুপ্তিপাড়ার বেন্দাবনচন্দ্রের রথ আর কোথায় কাঁচরাপাডাব। সে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কার্তিক বলে। পূর্ণ অবাক হয়ে শোনে বৃন্দাবনচন্দ্রের কথা।

শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় এ মন্দিরটি করেছিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা। এপারে শান্তিপুর আর ওপারে গুপ্তিপাডা। শান্তিপুরের এক গৃহস্থের বাডিতে বৃন্দাবনচন্দ্র ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে এনে গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণবাটির অজাগর বনে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যদেব নামে এক ভক্ত। জায়গাটি এতো মনোরম যে দেখে চোখ ফেরানো যায় না। নিধুবনের মতন এর শোভা। তাই এর নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। সত্যদেবের শিষ্য রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ঠাকুরের নামে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দিয়ে যান। এখন পুরনো মন্দিরটি নেই, তার জায়গায় নতুন মন্দির হয়েছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে রথযাত্রা শুরু। এতো বড়ো আর উঁচু রথ এই বাংলাদেশে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এখানকার ভাণ্ডার লুটের উৎসব। উল্টো রথের আগের দিন দেবতাকে ভোগ নিবেদনের পর পুরোহিত মন্দিরের দরোজা খুলে দেন। অমনি সেখানকার গোয়ালারা হুড়মুড় করে মন্দিরে ঢুকে পড়ে, পিছনে আর সব মানুষ। সবাই মিলে সেই ভোগ পরমানন্দে লুঠ করে, কাড়াকাড়ি করে, বিলিয়ে দেয় সকলের মধ্যে।

কার্তিক বলে—তোমার জন্যে ভাণ্ডার লুটের ভোগ প্রসাদ নিয়ে আসবো।

—আর কি আনবে ?

—তুমি বলো।

—পূর্ণ বলে—একটা বাঁদর বাচ্চা।

—সে কি ! গন্ধ তেল গেল, ফিতে গেল, শেষকালে কিনা বাঁদর ছানা !

—হ্যাঁ, আমি মানুষ করবো।

—তোমাকে কে বললে সেখানে বাঁদর পাওয়া যায়।

পূর্ণ হেসে বলে—সই কিরণের বিয়ের দিন ঠানদি বলেছিল সেখানকার মাটি দিয়ে নাকি সুন্দর সুন্দর বাঁদর তৈরি হয়।

কার্তিক হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে মুখ টক টকে—তবু ভাল। সেখানকার চোপা আনতে বলেনি।

—চোপা !

—হ্যাঁ, ঠানদি বুঝি বলেনি নদের মেয়ের খোঁপা আর গুপ্তিপাড়ার চোপা। থাক সে কথা। তবে বাঁদর আনতে হবে না। বাঁদর বাঁদরী তুমি সময় হলেই পাবে, ঘরে বসে।

—আচ্ছা, তুমি এতো জানলে কি করে গা। আমার মাও যে অমনি কতো কথাই না জানে।

—পরামাণিকের এই জানা বিদ্যেটাই যে বড়ো বিদ্যে।

পূর্ণের মুখে অমনি ঝলসে ওঠে মার কাছে শোনা সেই বাক্যটি—নাপিতের হল ষোল চোঙা বুদ্ধি।

কার্তিক আবার হেসে ওঠে—কে বলে আমার নাপতেনী বোকা হাবা।

পূর্ণ মুখ নামায়—সবাই তো বলে আমি ছেলেমানুষ।

—তাই নাকি। তা একটু ছেলেমানুষ হওয়া ভাল। তাই তো তোমার জন্যে গুপ্তিপাড়ার খাসা মণ্ডা আনবো।

—বাড়ি আসবে কবে ?

—ন'দিনের মাথায়। উল্টোরথের দিন বিকেলে। সেদিন একটু সেজেগুজে আমার জন্যে বসে থেকো কেমন।

পরদিন সকালবেলা সাজো সাজো রব। কার্তিকুমার যাবে রথের মেলায় বাণিজ্য করতে। নৌকা ছাড়বে চাকদহের রানীনগর ঘাট থেকে জোয়ারের মুখে। ভাসুর সময় বলে দিয়েছেন গুনে গেঁথে। ভাসুর-পোরা থলিতে বড়ো বড়ো চুবড়িতে মনিহারি দ্রব্য সাজিয়ে দেয়। কর্তার ভালবাসার ঝাল দেওয়া মাছ, কলাইয়ের ডাল আর পোস্তবাটা রান্না হয়। মাছ রাঁধে পূর্ণ। মুনিষের মাথায়

করে মালপত্র ঘাটে রওয়ানা হয়ে যায়। লক্ষ্মী বলে—একখানা পিঁড়ি পেতে সামনে ঘট রেখে তাতে আমের পল্লব দে। দাদা যাত্রা করবে।

কর্তা খাওয়া শেষে পান মুখে সেই পিঁড়েয় বসে ঘটকে দণ্ডবৎ করে মাকে প্রণাম করে পথে নেমে পড়ে। যাবার সময় আর কথা বলবার যো নেই। কেননা চারদিকে ফটফটে দিনের আলো। কাঁধে পুঁটুলিতে একখানি সতরঞ্চ। নৌকায় বিচালি আছে। রাতে সেখানেই শোয়া হবে। রান্না করবে মাঝি আর তার ছেলে।

পূর্ণ রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলো কর্তা রানীনগর মুখো পথে হনহনিয়ে চলে যাচ্ছে। একটিবারও ফিরে তাকাচ্ছে না।

কর্তা যেদিন মেলায় গেল সে রাতটি বড়ো যাতনার। অন্য সময় মাঝে মধ্যে যজমানিতে বা যাত্রাগানে গেলে এমন হয় না। আজ গেলে কাল কিংবা বড়জোর দুইচারদিন পরেই ফিরে আসে। কিন্তু এবার যে টানা নয়দিন। মানুষটা কাছে থাকলে বোঝা যায় না। দূরে গেলে বোঝা যায় সে না থাকলে মনটি কেমন করে। এ বাড়িতে এসে যখনই মায়ের জন্যে মনটা হা-হুতাশ করে ওঠে তখনি কর্তার ছবি সামনে এসে দাঁড়ায়। মায়ের দুঃখী একলা মুখখানি ঝাপসা হয়ে যায়। মন জুড়োয় তার হাতের বাঁধনে। মন সুস্থির হয় যখন সে বলে—তুমি আমার হৃদ্দ করলে পদ্মমুখী।—কিন্তু এখন। এই নয়দিনের নটি কালরাত্রি কি করে কাটবে। বিয়ের পরদিন যে কালরাত্রি এসেছিল সেইদিন মনে ভয় ছিল—কাল কি হবে গা। ফুলশয্যে আবার কেমন জিনিস। আর আজ থেকে মনে হচ্ছে কবে আবার বাবুর মুখ দেখবো। সে চলে যেতে মনে হয় এই বাড়ির আর সকলে যেন কতো দূরের। কতো পর পর।

কার্তিক গুপ্তিপাড়ায় যাবার পর রাত্রে লক্ষ্মী পূর্ণর কাছে এসে শোয়। শুয়ে শুয়ে শোনে বাইরে চালার নিচে সোনা বিশ্রী শব্দে ডাকছে। অনেকটা কাতরে ওঠা কান্নার মতন। সওয়ার নেই, দখলদার নেই। তাই বুঝি অমন মন কেমন করা ডাক। লক্ষ্মী বিরক্ত হয়ে বলে —এযে দেখছি জ্বালালে। ঘুমুতে দেবে না নাকি।

পূর্ণ বলে—ওর মন ভাল না তাই—

—আহা-হা। মেয়ে আমার ঘুড়ির মনও পড়ে ফেলেছে।

—হ্যাঁ গো। তোমার দাদার জন্যে ওর মন কেমন করছে।

লক্ষ্মী হাসে—তাহলে ও তোর সতীন বল্।

—কেন, সতীন কেন ?

—বাহ হবে না। দাদা যে ওকে তোর চেয়েও ভালবাসে।

—যাঃ।

—হ্যাঁ। তুই তো সেদিনকার। দাদার সঙ্গে ও যে অনেকদিন ঘর করছে।

—কিন্তু সতীনে সতীনে ভাব কি করে হয়। আমিই তো ওকে খেতে দিই। দেখাশোনা করি। কই ও তো কখনো আমাকে রাগ ঝাল করে না।

—ওরে মুখ্যু তাহলে দাদা ওকে বিষনজরে দেখবে। ও কি আর তোর মত হাবা।

—কিন্তু তোমার দাদা যে বললে ওর জন্যে একটি ছেলে-ঘোড়া নিয়ে আসবে।

—বলিস্ কি! এ যে সব্বোনাশের আদ্ধেক রাত্তির।

—কেন ঠাকুরঝি?

—শেষকালে ঘোড়ায় ঘোড়ায় চুলোচুলি বাঁধবে।

পূর্ণ হাসে—কেন আমি তো আছি। তোমার দাদা কেন ঝগড়া করবে। ছেলেতে ছেলেতে কি চুলোচুলি মানায়।

লক্ষ্মী আড় হয়ে উঠে বসে—কেন, চুলোচুলি কি কেবল মেয়েতে মেয়েতে হয়।

পূর্ণ চুপ করে থাকে। এ কথাব উত্তবে কি বলবে বুঝতে পারে না। কেবল আবছা অন্ধকারে বুঝতে পারে লক্ষ্মী ফুঁসছে। আলো থাকলে বোঝা যেতো এ ফুঁসে ওঠার ধারা কেমন। তার মুখে রাগ না অন্য কিছু। লক্ষ্মীকে চুপ করে থাকতে দেখে অসোয়াস্তি হয়। এ মেয়ে তো চুপ করে থাকার না। রাগ ঝাল যাই হোক না কথা বলে। পূর্ণ ননদিনীব গায়ে হাত দিয়ে বলে—ঠাকুরঝি।

—বল্।

—একটা কথা বলি?

—সেই থেকে তো অনেক কথাই বলছিস্। আব একটা বললে ক্ষেতি কি।

—বলছিলাম ঠাকুরজামাইয়েব জন্যে তোমাব মন কেমন কবে না।

লক্ষ্মীর মুখে আবার কথা নেই। এমনকি ফোঁস ফোঁসানিও জুড়িয়েছে। একটু পরে কেমন এড়িয়ে আসা গলায় বলে—মন থাকলে তো কেমন কববে।

পূর্ণ বুঝতে পারে না কি বলছে লক্ষ্মী। আব কি বা এ কথার মানে। লক্ষ্মী আবার বলে—কখনো শ্মশানে মড়া পোড়াতে দেখেছিস?

পূর্ণর মনে পড়ে একটি মাত্র শ্মশান দৃশ্য। বাবার চিতা জ্বলছে খাঁ খাঁ গঙ্গাব তীরে। সে দূরে মায়ের আঁচল কামড়ে বসে আছে। সে বলে—হ্যাঁ, বাবাকে—

—পোড়াবার পর চিলুধুয়ে একখানা বাঁশ পুঁতে তার গোড়ায় জলভবা কলসি রাখা হয়। মনে আছে?

—আছে।

লক্ষ্মী আবার খানিক জিরেন নেয়। তারপর বলে—চলে আসবার সময় যে মুখে আগুন দিয়েছে সে দা হাতে করে পেছন ফিরে বসে। তাবপর ঐ কলসিতে দায়ের কোপ মারে। আব পিছু দেখে না। সোজা হেঁটে চলে যায় নিজের ঘরে। কলসি ফুটো হয়ে জল পড়ে যায়।

পূর্ণ কেবল বলে হুঁ।

—আমারও সেই দশা। সংসারের মুখে আগুন দিয়ে তার বুকে ঠিক অমনি করে দায়ের কোপ মেরে চলে এসেছি। আর ঘুবে তাকাইনি।

পূর্ণর গা শির শির করে। বাইরে চৌকিদার হেঁকে যায়। খোলা জানালা দিয়ে রাত্রির থমথমে আকাশ চোখে পড়ে। আকাশে মেঘ করেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাঁশবনের পাতায় হাওযা পড়ে সব সব করছে। একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠছে থেকে থেকে। পাশের ঘরে ভাসুর ঠাকুর শব্দ করে হাই তুললেন। রান্নাঘরের চালে কি একটা জীব ভারি পাযে হেঁটে গেল। হযতো সেই বনবিড়ালটা। দিনে তাকে দেখা যায় না, রাতে বার হয়। সোনা এখনো কাঁদছে টেনে টেনে, অনেকটা মানুষের মতন ইনিয়ে বিনিয়ে। পূর্ণ আকাশ দেখে বুঝতে পারে জল এলো বলে। সেই মানুষটা হযতো এখন আঘাটায় নোঙর করা নৌকার ছইয়ের নিচে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বাইরে হাওযা উঠেছে। গঙ্গার জলে ঢেউ উঠছে পড়ছে। দোল দোল নৌকা দুলছে। কার্তিককুমাব সব ভুলে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

পূর্ণ লক্ষ্মীকে আব কিছু বলে না। বলবেই বা কি। সে তো শুনেছে ঠাকুরজামাইয়ের গুণপনার কথা। ভিন্ন মেয়েছেলেতে ভালবাসার কথা। ঠাকুরঝি এক বছরও স্বামীর ঘর করেনি। কলসির মাজায দা বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি। কিন্তু কপালে এখনো সিঁদুর জ্বলছে।

জানলার কাঠ আছড়ে পড়ে খবখাব। কালো আকাশ ঝবঝবিয়ে নেমে আসে বৃষ্টি হযে। বাঁশবনে সোঁ সোঁ হাওয়াব তীব চালাচালি হয়। চৌকিদাবের ঝমাঝম ঘুঙুরের শব্দ দূরে কোথাও পালিয়ে বাঁচে। সোনার কান্না বৃষ্টিতে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এতো ডামাডোলেও লক্ষ্মীর কান্না ঢাকা থাকে না। কাঁদুক কাঁদুক। জল হলে মেঘ কেটে যায়। আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার।

নয় দিনের কালরাত্রি কেটে গেল। কেটে গেল মনে মনে আঁচলেব গেরো দিয়ে। উল্টোরথের দিন বেলাবেলি এসে পড়লো কার্তিককুমার। মাঝির মাথায চাপানো বোঝা প্রায় শূন্য। অর্থাৎ বাণিজ্য বেশ ভালই হয়েছে। এক হাতে খাসা মণ্ডার হাঁড়ি আর কাঁধে পাট করা একটি রঙদার নতুন গামছা। পূর্ণ রান্নাঘর

থেকে বেরোয়নি। বসে বসে কুমড়ো ফালি করছিল আর আড়ে আড়ে কর্তার কথা শুনছিল। দাদার জন্যে দুটি নতুন ক্ষুর এনেছে আর এনেছে হাতল লাগানো হাল কায়দার আয়না। মার জন্যে একটি পাথরের গেলাস। লক্ষ্মীর জন্যে কানের দুল আর মালা। আরো আছে। সোনার জন্যে পুঁতির মালায় বাঁধা পিতলের ঘণ্টা। সোনা চলবে ফিরবে। ঘণ্টা বাজবে টং টং।

রাতে দেখা হয় দুজনে টিমটিমে রেড়ির তেলের আলোর পাশে। বাইরের আকাশ আজও অস্থির। বিদ্যুৎ দপ দপ করছে, ভিজে বাতাসে ঘরের কোণের আলো কেঁপে উঠছে। অন্ধকার আকাশের কালিঢালা পথে এক সাজোয়া ঘোড়সয়ার দশদিক আলো করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শব্দ উঠছে গুরু গুরু মেঘের পিছনে কোনো লুকনো ময়দানে। বিছানায় পাশাপাশি বসে দুজনাতে। কার্তিক বলে—কেমন আছো ?

—তুমি ?

—এটা কি আমা. জবাব হল।

পূর্ণ মুখ নিচু করে ভাবে কর্তা কিছু বলছে না কেন। সে তো আজ সেজেছে। কর্তার কথা মনে রেখে বিকেলবেলা গা ধুয়ে এসে বেশ সুন্দর করে চুল বেঁধেছে। বেঁধে দিয়েছে লক্ষ্মী। তাকে কিছু বলে দিতে হয়নি। ননদিনী কুটিলা হলেও মনের ভাবটি বোঝে। তাই পায়ে পরিয়ে দিয়েছে তিন প্রস্থ করে আলতা, চোখে কাজল আর সিঁথি জোড়া চওড়া সিঁদুর। কার্তিক হঠাৎ পূর্ণর মুখ তুলে ধরে বলে—একি এমন পাতা কেটে চুল বেঁধেছো কেন ?

তোলা মুখ নেমে যায় কার্তিকের ছেড়ে দেওয়াতে। মাথার সঙ্গে মনও বুঝি হেঁট। কার্তিক এবারে একটু ভারি গলায় বলে—পাতা কাটে বেশ্যারা, তুমি কেন ?

পূর্ণ কাঁপা ঠোঁটে কোনমতে বলতে চায়—না না।

—কে বেঁধে দিলে, লক্ষ্মী বুঝি ?

পূর্ণ মাথা কাত করে।

—ও আমি দেখেই বুঝেছি। ও তো বাঁধবেই। ওর বন্ধু যে পারুল।

পূর্ণর ভিতরে বাইরে মেঘ ধেয়ে আসে। হাওয়া নেই, তার বদলে গুমোট। নয়দিন পরে দেখা, এখন কিনা পারুলদের কথা। আর কি কোনো কথা ছিল না। পূর্ণ সরে বসতে চায়। কার্তিক অনুমান করে আকাশ বুঝি কালো হল। মুখখানি ভার ভার। নাকের পাটা ফুলছে। কার্তিস হেসে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে আনে বুকের কাছে। তারপর বলে—আমার বউ কি ঢিপ কপালে যে পাতা কাটতে হবে। এমনি আঁচড়ালেই ভাল লাগবে।

একটু পরে দমকা বাতাসে আলো নিবে যায়। তুমুল বৃষ্টি নামে বাইরে। সোনা হঠাৎ নতুন করে কেঁদে ওঠে। পূর্ণ কার্তিকের দুই কানে নিজের হাত চাপা দিয়ে বলে—ওর জন্যে ঘোড়া আনবে না ?

কার্তিক হাসে—তাহলে তুমিও ওর দুঃখ বুঝেছো।

কাঁধে মাথা ঘষে পূর্ণ—অমন কান্না আমার ভাল লাগে না।

কার্তিক কি বোঝে কে জানে। সে কেবল বলে—তোমার জন্যে জরির ফিতে আর পুঁথির মালা এনেছি। খাসা মণ্ডাও আছে।

পূর্ণ মুখ তোলে—তাহলে সোনাব জন্যে মালা আনলে কেন ? আমি আর ও কি সমান ?

—তা একরকম বটে।

পূর্ণ কেঁদে ওঠে। বৃষ্টি নামে আকাশ থেকে মাটিতে। আর এই ঘরের কোণে পূর্ণশশীর ন'টি দিন চেয়ে থাকা খাঁ খাঁ চোখে। কার্তিক হতবাক। কি হল হঠাৎ। এমন কি কথা হল যাতে এমন করে কান্না আসে। কার্তিক কেবল তার মাথায় হাত রাখে। পূর্ণ সে হাত ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—তোমার ও মালা আমি নোব না, নোব না।

কার্তিক হেসে ফেলে—সত্যিই তুমি ছেলেমানুষ। কাল সকালে উঠে খাসা মণ্ডা খেও কেমন।

সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটলো কাঁটা।

দিনমণি খানিক পূর্ণর ধারা পেয়েছে। বাপের মতন মানেব পাতায় ভাত খায় না। বেশ বসে বশে আছে। ছেলের মুখ কখনো কালো নয়, একটু না একটু আলো আছেই। এতোটুকুন ছেলেব বুদ্ধি-বিবেচনা দেখলে হবাক হতে হয়। লেখাপড়া করালে কেউকেটা না হলেও যেমন তেমন একজন মানুষ হতে পারতো। পূর্ণ জানে সে চোখ মুদলে বংশেব ঝাড়ে কোপ পড়বে। সব নির্মূল করে আশশ্যাওড়ার জঙ্গল আর বাবলার বন গ্রাস করে নেবে। যতোদিন যাবে লোকে ভুলে যেতে বসবে পরামাণিক না ছুঁলে অশুচি শুচি হয় না। সে এসে না দাঁড়ালে দায় ওঠে না, উদ্ধার হয় না ইহকাল থেকে পবকাল। তবু তারই মধ্যে দিনমণি এই অন্ধকারে মিড়মিড়ে প্রদীপ। তেল যোগান দিলে মন্দ জ্বলবে না। তাই পূর্ণ তাকে কাছে ডেকে তার নিবু নিবু প্রদীপের পোড়া তেলই খানিক খানিক যোগান দেয়। প্যাঁচ পয়জার শেখায়। বিদ্যের ছিটেফোঁটা দেয়। যার হয় না নয়ে তার হয় না নব্বুইয়ে, তেমনি যাব হবার তার গোড়া থেকেই লক্ষণ থাকে। দিনমণির গানের গলাখানি খাসা। মাইক থেকে শুনে শুনে বেশ গায়—সাধের

লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী। পূর্ণ পুতিকে বলে রেখেছে—আমি মরলে আমার থলে আর বাপের হাতবাকসো তোকে দিয়ে যাবো। আর তো কিছু নেই। ঐ তবিল ভেঙেই তোর জীবন চলে যাবে। কখনো না খেয়ে মরবি না। জাতবিদ্যেকে মাথায় রাখলে সে তোকে ফেলবে না কখনো।

পুতি বলে—কেন বড়মা। তেলক কেটে গান গেয়ে ভিক্ষে করব।

—ওরে ছেলে, সুমুখে আবো কুদিন আসছে রে। তখন আর নবদ্বীপেও হরি বললেই সিকি কাঁড়া চালও পাবিনে।

—তবে কি কববো বুদ্ধি দাও।

—বুদ্ধি। হুঁ, সে তো তোব রক্তে আছে। কেবল যা একটু শান দিতে হবে। তাহলে আর জীবনে কারো কাছে ঠকবিনে।

হাবাধন খেতে বসে শুনছিল সব। রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে—তাহলে আমি কেন সেবারে শিমুবালির ঐ বিয়েবাড়িতে যেয়ে ছেলেপক্ষেব নাপিতেব কাছে হেনস্তা হলাম বলো। এক বাড়ি মানুষ আমাকে হেসে বসিয়ে দিলে কেন। আমার কি বক্ত খাবাপ?

—কি যে বলিস তা একবাব ভেবে দেখিস না। বক্তে মবচে পড়ে গেলে অমনি হয। যদি শান দিয়ে বাখতিস তাহলে সেযানে সেযানে গলাগলি হতো।

—সে আবাব কি।

—বলি শোন্ তবে। এক পরামাণিক অনেকদিন পব শ্বশুববাড়ি গেছে। শ্বশুরও পরামাণিক। তবে জামাইযেব মতন হাডহাভাতে অবস্থা তার নয। খামতির মধ্যে শ্বশুরের কেবল একটি চোখ কানা। তা শ্বশুব জামাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। গবম গবম ভাতেব ওপরে বেশ এই অ্যাত্তোখানি করে ঘি দেওয়া হয়েছে। জামাই কতোকাল এমন বাসওযালা ঘেবতো খায়নিকো। তাডাতাডি একখাবলা ঘি মাখা গরম ভাত যেই না মুখে তুলে দিয়েছে আব যায কোথায। এতো গরম যে না পারে গিলতে না পাবে মুখ থেকে উগরে ফেলতে। গলাব টাগরা পুড়ে একসা। বেচারা জামাই তখন কি করে—ওপব পানে মুখ তুলে হাঁ করে রইল। ধূর্ত শ্বশুব বুঝতে পারলো হাঘরে জামাইয়ের হাল। সে বললে—হ্যাঁ বাবা, অমন ওপর পানে হাঁ করে কি দেখছো?

জামাইও বুঝলো শ্বশুরের বজ্জাতি। সে তখন ঘরের চালের নিচে আডা দেওয়া বাঁশগুলো দেখিয়ে বলে—ভাবছি ঐ বাঁশগুলো কোথা থেকে কেনা।

শ্বশুর হেসে বলে—ওগুলো টাগবাপোড়ার হাট থেকে কেনা বাবা।

জামাই আড়চোখে শ্বশুরকে একবার দেখে মিচকি হেসে বলে—অ। তাই এর গাঁটে গাঁটে কানা।

শ্বশুরের মুখে কুলুপ।

দিদিমার মুখে গল্প শুনে হারাধনও চুপ। কেবল দিনমণি বলে—একটা গান করো বড়মা।

—আমার কি আর তোর মত গলা আছে বাবা যে যখন তখন গান বলতে পারি।

—না না, করো। একখানা করো।

—বেশ বলছি। এবারে কিন্তু তোকে ঘুমুতে হবে অনেক রাত হয়েছে।

—আচ্ছা।

দিনমণি পাশ ফিরে শোয়। পূর্ণ আস্তে আস্তে সুর তোলে—ললিতা লো চিনবি তখন তোর ললিত অংস হবে যখন—কি গুণ আছে ঐ রাই চরণে—

ঘরে বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে এই গানখানি নিচু গলায় গাইছিল পূর্ণ। বাইরে শ্রাবণ পূর্ণিমার আকাশে দুধ সমুদ্র। মেঘ সম্পূর্ণ কেটে না গেলেও আলোর আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। তারই মধ্যে গোল পরাতের মতন চাঁদ—যেন রসের ভিয়েনে চাপানো একখানা প্রকাণ্ড রসকদম্ব। থই থই হাসছে, ভেসে বেড়াচ্ছে টইটম্বুর আনন্দে। সারাদিনের গুমোট কেটে বাতাস ছেড়েছে সন্ধ্যার পর। হেঁসেলের ওপাশে বাগানে বেল ফুল ফুটেছে আর ফুটেছে কামিনী। ফুলের মুখে ভিজে বাতাস পড়ে গন্ধ উসকে উঠেছে। আর তাইতে সারা বাড়ি চনমন করছে। বাড়িতে কেউ নেই এ বেলা। ভাসুর গেছেন শান্তিপুরে—শ্রাদ্ধ বাড়ি। ফিরবেন কাল। জা আর শাশুড়ি গেছেন হরিসভার পাঠ শুনতে। ছেলেরাও নেই। লক্ষ্মী রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে কোথায় গেছে কে জানে। আর কার্তিককুমার গেছে যাত্রার মহড়া দিতে। বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে ঐ সোনা। সেও চালার নিচে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের গোড়ায় চাঁদের আলোর ঢেল খেল কিন্তু দেহটা আঁধারে।

মাঝখানে চারটি বছর কেটে গেছে। পূর্ণকে এখন আর কেউ ছেলেমানুষ বলে না। এমনকি লক্ষ্মীও না। কেবল কর্তার কাছে এখনো সে পাকা হতে পারল না। এখনো সময়ে সময়ে রাতেরবেলা তাকে কোলে বসিয়ে চুল আঁচড়ে দেয় কার্তিক। একেবারেই আগোছালো দেখতে পারে না। যেমন ছিমছিমে খাওয়া দাওয়া, তেমনি ছিমছিমে সাজগোজ, ওঠা বসা। এরই মধ্যে পূর্ণর গর্ভ হয়েছে। ভরা নয় মাস চলছে, এখন কেবল যন্ত্রণার জন্যে অপেক্ষা করা।

বিছানা ঝাড়ে আর চাপা গলায় গান করে পূর্ণ। এ বাড়িতে এসে এই প্রথম গলা খুললো সে। বাবার কাছে যজমানির বদলে এই বিদ্যেটা খানিক পাওয়া

গিয়েছিল। অনেককাল শান না পড়লেও এখনো খুব একটা বেসুরো বলছে না। গান করতে করতে মনে পড়ছে বাবার কথা, মায়ের মুখখানি আর কাঁচরাপাড়া গ্রামের কথা। চার বছর বিয়ে হলেও এই মনে পড়ায় ভাঁটা পড়েনি। তবে আগে যেমন দিবানিশি মন টানতো এখন আর তেমন হয় না। অনেকদিন পরে একলা একলা মন চলে যায় সেখানে, সেই স্মৃতির দেশে। আর সেই অনেকদিন পর যাওয়ার কারণে আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে মন চায় না। তখন মন বলে আর একটুক্ষণ থেকে যাই না কেন। পূর্ণ গেল বছর একবার মাকে দেখতে গিয়েছিল, আর যাওয়া হয়নি। গত মাসে কর্তা কাঁচরাপাড়ার পাশের গ্রাম হালিশহরে যজমানিতে গিয়েছিল। পূর্ণ যাবে বলে বায়না ধরেছিল। কিন্তু তার আট মাস। শাশুড়ি বললেন—যেতে হলে তো টেরেনে যেতে হবে। সে এখন চলবে না। আটে কাঠে উঠতে নেইকো।

কি গুণ আছে ঐ রাইচরণে—এই শেষ পদটি গাইতে গাইতে পূর্ণ চমকে ওঠে। ঘরের বাইরে এস্রাজ বেজে চলেছে তার গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। সে যেমনটি গাইছে তেমনটি বাজনা বাজছে, মিহি সুরে একটু বা জলদে। অনেকটা ঐ শ্রাবণ পূর্ণিমার জলধরা আকাশের আলোর মতনই মোলায়েম, শান্ত আর নিরিবিলি সে সুরের টান। কোনো তাড়াহুড়ো নেই ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেলেই হল। পূর্ণ তাড়াতাড়ি গান বন্ধ করে দরোজার কাছে গিয়ে দেখে রোয়াকের সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে কার্তিককুমার। উঠোনে চাঁদের আলোর দুধ সাগরে তার পা দুটি ডোবানো, গলা অবধি ভাসছে—কেবল মুখখানা অন্ধকারে। কাঁধে ফেলা এস্রাজে ছড় উঠছে আর নামছে। পূর্ণ লজ্জা লুকানোর জায়গা পায় না। ছি ছি, কি হবে। কি হবে।

বাজনা থামে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় কার্তিককুমার।—কি হল, থামলে কেন?

পূর্ণর মুখে কাপড় চাপা। কি আর বলবে। তাই কেবল সামান্য হাসে। কার্তিক হয়তো অন্ধকারে আলোর ধাঁধায় পড়ে পূর্ণর হাসি বুঝতে পারে না। তাই আবার বলে—নাপতেনী একেবারে, বে-গুণ নয়। কিছু গুণও আছে দেখছি।

পূর্ণ ছুটে ঘরের ভিতরে চলে যায়। কার্তিক এস্রাজ বগলে করে ঘরে উঠে আসে। তারপর পূর্ণকে বিছানায় নিজের পাশে বসিয়ে বলে—গাওনা। আবার ধরো না।

—ছিঃ। তোমার বাজনার সঙ্গে কি গাইতে পারি।

—এ সময়ে মনে ফুর্তি রাখতে হয়। মন খারাপ করতে নেইকো পেটে ছেলে নিয়ে।

পূর্ণ ধীরে চোখ তোলে—কিন্তু আমার যে লজ্জা করে। কেউ যদি শুনে ফেলে।

—এই তো। আমি শুনে ফেললাম। আর তো লজ্জা নেই।

—আরো বেশী লজ্জা।

—কেন ?

—তেমার অমন বাজনার পাশে আমার গান কেমন ম্যাড় ম্যাড় করে। ছিঃ।

—তাই নাকি। তাহলে আমার গলার গান শুনলে যে তুমি আরো লজ্জা পাবে।

—পূর্ণ কেবল হাসে আর ভাবে কর্তার গানের গুণপনা তো জানা ছিল না। অবাক কাণ্ড তো। সে মুখে কিছু বলবার আগেই কার্তিক বাম কানে হাত চেপে ডান হাত সামনে তুলে বিকট সুবে হেঁড়ে গলায় গেয়ে ওঠে—

কতো ভালোবাসি তোরে কেমনে জানাই বল
অরুচিব রুচি তুমি কচি আমের অম্বল
রুগীর পথ্য সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট তুমি ধনী
আব উচ্ছে চচ্চড়ি কি বাখানি, খেতে নোলায় আসে জল।
রুইযেব মুড়ো চেতল পেটি, ছেঁচকির কাঁটা পরিপাটি
গাঙেব ইলিশ গলদা চিংড়ি, প্রাণ তুমি আমার মাগুর মাছের ঝোল।

এস্রাজ বাজনা পাশে পড়ে আছে। কার্তিক হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে গেয়ে চলেছে। পূর্ণ বিছানায় হেসে কুটিপাটি। এ মাথা থেকে ও মাথা গড়াগড়ি দেয। যে মানুষেব হাতে এতো সুর তার গলা কি করে এমন অসুর হয। হাত থেকে গলা অনেক তফাতে বলেই কি। গান থামিয়ে কার্তিক বলে—দেখলে. তোমায আমি কতো ভালবাসি।

দশ মাস পাব হলো না। নয মাস ছেড়ে দশের মাঝামাঝি এসে মেয়ে হল। আগে থেকে জানান দেবার মতন ব্যথা বেদনা হয়নি। হঠাৎ ব্যথা উঠলো আর হঠাৎই পূর্ণ পোযাতি হল।

সকালবেলা পূর্ণ তুলে রাখা ধান থেকে একগড় বার করে নিয়ে ভেঙেছে। পেটে অতোখানি ভার, কাজ কবতে হাঁপ লাগে তবুও। ভাসুর হাটে গেছে কামাতে। পূর্ণ পুকুর থেকে খাবার জল ভরেছে, হেঁসেলে কুটনো-বাটনায় যোগান দিয়েছে। তখনো কোনো ইসারা পায়নি। দুপুরে স্নান করে এসে তুলসী মঞ্চে জল দিতে যাবে অমনি ব্যথা উঠলো। কোনমতে কাপড় ছেড়ে পূর্ণ গিয়ে শুয়ে পড়লো ঘোড়া ঘরের পিছনে খোড়ো আঁতুড় ঘরে। এ ঘরখানা এ জন্যেই বরাদ্দ। পূর্ণ শুনেছে কর্তাও নাকি এ ঘরে জন্মেছে। মেঝেতে একখানা নিচু

তক্তপোশ পাতা। তার ওপরেই পড়ে পড়ে কাতরায় পূর্ণ। লক্ষ্মী দাই ডাকতে গেছে। কেননা এ বাড়ির কেউ দাইয়ের কাজ জানে না। পূর্ণ যন্ত্রণায় ছটফট করে আর মনে হয় এ সময়ে মা কাছে থাকলে আর ভাবনা ছিল না। দাইয়ের হাতে ভরসা করতো হতো না। যার গর্ভে জন্ম সেই মা মেয়ের গর্ভ মুক্ত করতো।

দাই এসে পৌঁছবার আগেই পূর্ণ খালাস হল। অজ্ঞান অসাড় অবস্থায় কোলের সামনে পেটের ধনকে নিয়ে পড়ে আছে। হুঁশ নেই। এদিকে আদরের নড়ি পড়ে পড়ে কাঁদছে। খানিক পরে দাই এসে নাড়ি কেটে মেয়েকে মায়ের থেকে আলাদা করে। পূর্ণ সাড় ফিরে দেখলো—রক্তের পুঁটুলি, তার দেহের যন্ত্রণার ভার। আরো দেখলো মাথা ভর্তি কুচকুচে চুল আর কেমন টিকলো নাক।

প্রথমে এলেন ভাসুর। বাইরে থেকে বললেন—প্রথমে মেয়ের মুখ দেখবে তার বাপ। পরে আমি।

বেলা গড়াতে কার্তিককুমার এসে দাঁড়ালো দোর গোড়ায়। মুখে হাসি। পূর্ণ মুখ তুলে কোনমতে ফিকে হাসি হাসল। কর্তা চালা গলায় বলে—তাহলে আর একটি নাপতেনী বাড়ল।

পূর্ণ মেয়ের গায়ে নেকড়াটা টেনে দেয়।

সকাল বেলা ধান কোটা দিয়ে দিনটি শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে বুঝি মিল রেখেই মেয়ের নাম রাখা হল অন্নপূর্ণা। মেয়ের বাপই রাখলো নাম। নামকরণের অনুষ্ঠানের আর তর সইল না কার্তিকের। কার্তিক বলে—আর তোমায় পুতুল খেলতে হবে না।

পূর্ণ ভ্রূ তোলে—ওমা সেকি! পুতুল খেলা তো সেই কোন কালে ছেড়ে দিয়েছি।

—সেগুলো জলে দিয়েছো না আছে?

—রেখে দিয়েছি। মেয়ে ডাগর হয়ে খেলবে।

সেদিন অনেক রাতে চৌকিদারের হাঁক ছাপিয়ে সোনা আবার কেঁদে ওঠে। পূর্ণ চমকে ওঠে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। কার্তিক তখন ঘুমে পাথর। অনেকদিন পরে আবার কাঁদছে ঘুড়িটা। পূর্ণ মেয়ে নিয়ে আঁতুড় ছেড়ে ঘরে উঠতেই তার যেন শোক উথলে উঠলো। মাঝখানে মেয়ে আর ওপাশে স্বামী। এ পাশে শুয়ে পূর্ণর মনটা কেমন যেন কু বলে। কর্তার কি মনে নেই ওর জন্যে একটি ঘোড়া আনবার কথা। না আনা অবধি যে ওর সুখ নেই। এমনি করে যে নিত্য অশান্তি করবে। এই মেয়ে একদিন বড়ো হবে। তার জন্যেও একটি ছেলে আনতে

হবে। না হলে সেও যে অমনি কেঁদে বেড়াবে পারুলের মতন। বুকের ব্যথায় প্রাণ অস্থির পঞ্চম হবে। সত্যি জগতের আইন বড়ো তাজ্জব। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটি স্বপ্ন দেখে।

গভীর বনে একটি সরোবরের ধারে পূর্ণ একলা বসে আছে। কোলের কাছে পুতুলের ঝাঁপি। তার মধ্যে একটি বর আর একটি বউ। বরের মুখটি কার্তিককুমারের আর বউয়ের মুখ অচেনা। পুতুলের বিয়ে হচ্ছে এখানে এই নিরিবিলিতে। পূর্ণ ছেলে মেয়েকে সাজায়। কার্তিকের মাথায় জরি বসানো রাংতার টোপর। মেয়ের পাতাকাটা চুলের সীমানায় ঝকমকে মুকুট আর পরনে লাল বেনারসী। সরোবরের জলে পদ্ম ফুটেছে। গাছে গাছে পাখিরা কিচির মিচির গান করছে। দূর বনের পশ্চিম মাথায় সূর্য নামতে বসেছে। গাছের পাতা ছুঁয়ে জলে তার চলে যাওয়ার শেষ আলো এসে পড়েছে। জল কাঁপছে রাঙা হয়ে। এরই মাঝে প্রজাপতি উড়ছে, রাঙাফড়িং পাক খাচ্ছে। পূর্ণ বর কনেকে আপন মনে সাজায় আর গুন গুন করে। সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে। কতো না বাজি পুড়বে, বাদ্য বাজবে, আলো জ্বলবে। আজ মেয়ের বর হবে, কাল হবে ঘর, পরশু হবে রাজকন্যে, সেও হবে পর। হঠাৎ মেয়ে বরকে বলে—আমায় কানবালা দেবে না ?

কার্তিক কিছু বলে না। মেয়ে আবার বলে, আমায় মান্তাসা দেবে না ? কার্তিক তবুও রা কাড়ে না। মেয়ে নাছোড়। বলে—তবে আমায় কি দেবে ?

কার্তিক হেসে বলে—তোমায় ভালবাসি যে।

—কি বললে ?

—ভালবাসি।

মেয়ে অমনি খিল খিল করে হেসে ওঠে। তার হাসিতে সোনার কুচি ঝরে পড়ে সরোবরের কাকচক্ষু জলে। মেয়ে হাসে। সে হাসিতে গাছ থেকে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে। মেয়ে হাসে। পাখিরা গান থামিয়ে চুপ করে শোনে। পূর্ণ ভাবে সত্যি এ বনটি কি সুন্দর। এই ভাবা মাত্র সরোবরের জলে একটা ঘূর্ণী ওঠে। পূর্ণ চমকে দেখে তার মাঝখান থেকে এক সোনার ঘোড়া উঠে এল। তার পিঠে এক সোনার বরণ মেয়ে বসে আছে—দশদিক আলো করে। কার্তিক তাকায় সেদিকে। ঘোড়া উঠে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। তারপর সেই মেয়েটিকে পূর্ণর কোলের কাছে নামিয়ে দিলো। পূর্ণ যেই না তাকে বুকে তুলে নিয়েছে অমনি কার্তিক এক লাফে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। কার্তিক বলে—আমি তাহলে যাই। পূর্ণ কিছু বলবার আগেই দেখে ঘোড়ার মুখ নেই, তার বদলে এক মেয়ের মুখ যে কিনা এখানে বিয়ের সাজ পরে বসেছিল। তার

কানে কানবালা, নাকে নথ। মুখ নামিয়ে দেখে সেই সোনার বরণ মেয়ে পূর্ণশশী হয়ে কনের আসনে বসে আছে। পূর্ণ বলে—একি !

মেয়েঘোড়ার নাকে নথ দোলে, কানবালায় সূর্যাস্তের আলো কাঁপে। কার্তিককুমারকে পিঠে নিয়ে সে জলাশয়ে ঝাঁপ দেয়। পূর্ণ সব ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে, ওখানকার পদ্মবনে। জলে জলে হাজার ঢুঁড়েও সে পায় না। অবশেষে ক্লান্ত মেয়ে যখন পাড়ে উঠে আসে তখন বনে বনে গভীর অন্ধকার ঘনিয়েছে। আলো বলতে কেবল যা আছে জোনাকির টিমিটিমি। সেই মৃদু সবুজ আলোয় পূর্ণ আর তার পুতুল খেলার ভাঙা বাসরটি খুঁজে পায় না।

মেয়ে ককিয়ে উঠতে পূর্ণ চমকে ওঠে। স্বপ্ন ছিঁড়ে ঘুম ভেঙে যায়। দেখে বাইরে ভোরের আলো। আকাশ সবে ফর্সা হল। কর্তা পাশে নেই। কখন যে উঠে গেছে। পূর্ণ মেয়ের মুখে মাই গুঁজে দেয় আর দেখে তার চোখের জলে কচি মেয়ের বুক ভেসে যাচ্ছে।

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না।

কাঞ্চনপল্লী থেকে যেমন কাঁচবাপাড়া তেমনি চক্রদহ থেকে চাকদহ। তা সে যাই হোক না কেন সোনার দেশ ছেড়ে এই কাদা মাটির দেশে এসে জীবনের ষোল হাল হল, কাঁচা বয়সে পাকা শিক্ষা হল, দুঃখের ভিত পাকা পোক্ত হয়ে অন্ধকারের দিকে অগস্ত্যযাত্রা হল। মাঝখানের জন্যে বরাদ্দ কেবল চারটি বৎসর। সুখের কাল বলো, আহ্লাদের দিন বলো সবই তোলা রইল ঐ সময়টুকুর জন্যে। পিছন ফিরে তাকালে মন আড়ষ্ট হয় না বরং পাথরের গর্তে জল ওঠে। শ্মশানভূমিতে চেয়ে দেখলে মন যেমন উদাস হয় আর প্রফুল্লও হয় বইকি। ঐখানেই তো একদিন দেহের খাঁচা পুড়ে ছাই হয়, সমস্ত সাধ বাসনা সারা হয়, ঝড় ঝাপটে উড়ে যায় তাবৎ লীলা খেলা। এখন ঝড় নেই কেবলতার চিহ্নটুকুন আছে। ঐ খাঁ খাঁ শ্মশানের প্রান্তরে কোনো জনমানব নেই। হাওয়ায় হাওয়ায় পোড়া কাঠকয়লার গুঁড়ো উড়ছে। ধুলোর ঘূর্ণীতে একটি পাখির পালক লাট খাচ্ছে। মাটিতে মাথা কুটে মরছে দুঃখ সুখের দিনগুলি।

চক্রদহ গ্রামের পাশ দিয়ে বহে যাওয়া গঙ্গায় মানুষ ডুবে মরতো। মা গঙ্গা এখানে হারিণী। তিনি যেমন পাপ হরণ করেন তেমনিআবারসুখও। এক হাতে বরাভয় আর এক হাতে ভয়। একদিকে দান আর একদিকে গ্রহণ। লোকে বলে এখানকার গঙ্গার ঘূর্ণী বড়ো সাংঘাতিক ছিল। তার চক্রে পড়ে যে কতো মানুষ হারিয়ে গেছে তার হিসাব নেই। পড়েছে আর ওঠবার মতন কুটোটি পায়নি।

তলিয়ে গেছে কোন অতলে, জননীর জঠরে। যে মায়ের গর্ভ থেকে বার হয়ে সে আলো দেখে তারই জঠরের ফাঁদে আবার চিরকালের জন্যে নির্বাসন হয়—অন্ধকারে। সেই মরণচক্র থেকেই নাকি চাকদহ।

আর একটি কথা প্রচলিত আছে। পূর্ণর সেই দ্বিতীয় কথাটিও মনে ধরে। ফেলে দিতে পারে না। ভগীরথ তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্যে হিমালয় থেকে মা গঙ্গাকে নিয়ে আসছিলেন রথে চেপে। অনেক পথ পার হয়ে তাঁকে যেতে হবে গঙ্গাসাগরে। চলতে চলতে ঠিক এই গ্রামের মাঝখানে এসে তাঁর রথের চাকা ভেঙে পড়ল। রথ টেনে আনা অশ্বগুলি হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সেই চাকা ভাঙার জের টেনেই এ গ্রামের নাম নাকি চক্রদহ।

চলতে চলতে একদিন ঠিক তেমনি করেই পূর্ণর চোখের সামনে রথের চাকা ভেঙে পড়েছিল। জলের ঘূর্ণীর চক্করে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে দেখেছিল রসাতল কোথায়। সেই বলেনা, ডুবেছি কি ডুবতে আছি পাতাল কতো দূরে দেখি। সেই ভেঙে পড়া দিনটির কথা মনে পড়ে নিরিবিলিতে থাকলে। মনে পড়ে ষোড়শী মেয়ের ষোল হাল পূর্ণ হবার পাঁচালী।

আঁতুড় থেকে ওঠবার পর দিনই মেয়ে ট্যাঁকে করে পূর্ণ সংসারে জুতে পড়ল। লোকে বলে কলুর ঘানি টানে বলদ। কিন্তু সংসারের ঘানি টানে মেয়ে মানুষ—গাভী না ঘুড়ি সে খবর কে রাখে। চোখ বাঁধা থাকলে এ ঘানি টানা যায় না। চারদিকে নজর রেখে মুখ দিয়ে ফেনা উগরে চৌপর দিন রাত টেনে যেতে হয়। তবে তো তেল বার হয়। রাঁধন বাড়ন হয়। আলো জ্বলে।

মেয়ে অন্নপূর্ণা বড়ো কাঁদুনী। রাতে বেশ থাকে। ঘুমোয়। কিন্তু দিনের আলো আর পুরুষ মানুষ দেখলেই কেঁদে কেটে একশা। এ কেমন মেয়ে বাপু যে কিনা আঁধার ভালবাসে। মেয়েমানুষেরু আঁচলের আড়াল চায়। তাই বঝি বাপের কোলের দিকেও টান নেই। সেই অটানই কি এমন করে আকাল এনে দিলো তার কপালে।

পূর্ণ এখন গিন্নীবান্নী না হলেও মোটামুটি সাচ্ছল্য তো বটে। এখন সে মেয়ের মা, সংসারে একজন পাল্লাভারি মানুষ। আগে তাকে বলতে হতো এটা করো সেটা করো। এখন সে জেনে গেছে কি তার দায়, কোন জিনিসটি তাকে দেখতে হবে। এ সমস্ত কাউকে বলে কয়ে শেখানো যায় না। আপনিই হয়। মেয়েমানুষের বুকে দুধ জমলেই তার চোখ খুলে যায়। সে অনেক কিছু দেখতে পায় পরিষ্কার।

সকালবেলাকার হেঁসেলের ভার এখন তার হাতে। আগে শাশুড়ি হাল ধরতো আর সে বইঠা বাইতো। লক্ষ্মী বরাবরই ধান পান নিয়ে ব্যস্ত। এখন পূর্ণ

হেঁসেলের মুল গায়েন, জা শাশুড়ি দোয়ারকি। কেবল রাতের পাট তোলে জা। এছাড়া জল আনা খেতে দেওয়া তো আছেই।

বর্ষা শেষ হতে বসেছে। আশ্বিন মাস পড়ে গেছে। উঠোনে সকালবেলাকার রোদের দিকে তাকালে বোঝা যায় একটু যেন ভোল পালটে গেছে। ছোট ফুল বাগানের ঘাসে, গাছে পাতায় শিশিরের জল। ঘোড়া ঘরের পাশে দাঁড়ানো শিউলীতলায় সকালের শিশিরে ফুলগুলি বিছিয়ে থাকে, তাদের অঙ্গে ভিজে ধুলোর দাগ। শাশুড়ি ঠাকুরকে দেবার আগে ফুল ধুয়ে নেন। পুকুর ঘাটে গেলে ওপারে তাকালে আর চোখ উঠে আসতে চায় না। ঘন ঘাস বনের ফাঁকে ফাঁকে দুটি একটি করে কাশফুল মাথা তুলছে। তাদের মাথায় বসে গঙ্গাফড়িং দোল খায়, হাওয়া দেয় নরম নরম। পূর্ণ এইসব দেখতে দেখতে ঘাটের কাজ সারে! একটু বেলায় মেয়েকে রোদে ভাজতে দেয় উঠোনের একপাশে। মেয়ের চিৎকার মাঝে মধ্যে কাজে বাধা দেয়, তখন উঠে গিয়ে তাকে তোয়াজ করে আসতে হয়। তার হাত জোড়া থাকলে শাশুড়ি উঠে গিয়ে মেয়ের মুখে তার শুকনো ডেলা মুখে গুঁজে দেন। লক্ষ্মী ভুলেও সেদিকে ঘেঁষে না।

আজ সকালেও রোজকার কাজের জের টেনে চলেছে পূর্ণ। ছেলেমানুষীর দিনগুলিতে কোন কোনদিন বিছানা ছাড়তে একটু দেরী হয়ে যেতো। কর্তা হয়তো আগেই উঠে পড়েছে। ঘুম ভেঙে শুনতে হতো লক্ষ্মীর চিৎকার—মেয়ের দাঁতে রোদ না লাগলে ঘুম ভাঙে না। তারপর আড়ালে ডেকে বলতো সারারাত ফষ্টিনষ্টি করলে বেলা হবে না তো কি। কিন্তু এখন সেসব দিন অনেক দূরে। এখন রাত থাকতে ওঠে পূর্ণ। এ বাড়ির সকলের তখন ঘুম ভাঙে না। কেবল হয়তো জা উঠে পড়েছে।

আজ সকালে উঠে পূর্ণর প্রথমেই মনে হয় কর্তা যাবে মদনপুরে জমি দেখতে। কাল বিকেলে ভাগীদার এসে বলে গেছে একবার যেতে। কোন একটা জমির আল নিয়ে নাকি পাশের লোকের সঙ্গে নিত্য কাজিয়া। কার্তিক না গেলে অনর্থ ঘটবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে পূর্ণ অমনি মেয়ে কেঁদে ওঠে। আর উঠে দোর খোলা হল না। মেয়েকে থাবড়াতে বসল পূর্ণ। কার্তিককুমার বুকের ওপর হাত দুটি জড়ো করে ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাসে চওড়া বুকটি উঠছে নামছে। বুকের রোমের জঙ্গলে মোটাসোটা ফর্সা আঙুলগুলি ডুবে আছে। বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন মহাশয়। মানুষটার ঘুম দেখবার মতন। চোখদুটি আধবোজা না বলে বলতে হয় সিকিবোজা। শিবনেত্র বললেও ঠিক বলা হয় না। পূর্ণ একদিন বলেছিল—ঘরে চোর ঢুকলে বেশ হবে। সে ভাববে তুমি চেয়ে চেয়ে তার চুরি করা দেখছো।

অন্নপূর্ণাকে স্তন দিতে দিতে পূর্ণ মনে মনে গজগজ করে। মেয়ের এখনই বুড়ী মানুষের হাল। আলো ফুটলো তো চোখের ঘুমও ছুটলো। কোনো মতেই আর তাকে সামলানো যাবে না। এদিকে যে দেরী হয়ে যায়। ঘরের দোরে, উঠোনে গোবর ছড়া দিতে হবে। রোয়াকে ঝাঁটার বাড়ি দিতে হবে। ঘরের মানুষ বাইরে বেরোবার আগে এগুলি না সারতে পারলে অমঙ্গল। তারপর নিজের স্নান ধ্যান। কর্তা, ভাসুর, ওঠবার আগেই যার যার ঘরের সামনে বদনায় জল রাখতে হবে। পাশে পাট করা গামছা।

মেয়ে ঠাণ্ডা হল। পূর্ণ আস্তে আস্তে কোল থেকে নামিয়ে তাকে শুইয়ে দিলো। অমনি একটি হাত এসে তার কোলে পড়ল। চমকে পূর্ণ দেখলো কার্তিককুমার হাসছে মিটিমিটি। সিকিবোজা চোখ একেবারে বন্ধ। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ গেল। অন্ধকার ভাঙছে, আকাশ আলো হবার আগে চোখ মটকাচ্ছে। হাত-পা খেলিয়ে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসবার যোগাড়যন্তর করছে। শিউলী গাছে এইমাত্র একটি কাক ডাকলো। দাওয়ার চালের খোপে দুই একটি করে চড়াই কিচমিচ ধবেছে। বাঁশ বাগানের পাশাল পথে একটি খঞ্জনী বাজতে বাজতে এগিয়ে আসছে। অঘোর বোষ্টম প্রভাতী নাম দিতে পথে বেরিয়েছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরতে ঘুবতে সকাল আলো হয়ে যাবে। আবার আসবে বৈকালে, ফিরে যাবে সন্ধ্যাব মুখে মাধুকরি নিয়ে। সকালে নাম দেয়, বৈকালে ভিক্ষা নেয়। পূর্ণ চোখ ফিরিয়ে আনল, দেখলো কার্তিকের হাতটি তার কোলের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে আর মুখে সেই বিটলেমির হাসি। পূর্ণ সে হাতের পিঠে হাত রেখে বলে কি গা?

চোখ খোলে না কার্তিক। কেবল ঠোঁট খোলো—কি গা?

—ওমা সেকি!

—কার্তিক বলে—ওমা সেকি!

পূর্ণ ফিক্ কবে হাসে। কার্তিকও ঠিক তেমনি ফিক্ করে। পূর্ণ বলে—এতো ভাল বিপদ হল।

—এতো ভাল বিপদ হল। কার্তিকের জবাব।

পূর্ণর হাসি পায়। সকালবেলা একি ঝামেলা। মানুষটার রকমই এমনি। থাকে থাকে এমন ছেলেপনা করে। কিন্তু এদিকে যে দেরী হয়ে যায়। বাইরে দমাস করে শব্দ হল। ওদিকে একটি ঘরের দোর খুললো। পূর্ণ তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চায় আর অমনি একটি হাত এসে কোমরে বেড় দিয়ে ধরে। পূর্ণ হাত দিয়ে বাধা দেয়—ছাড়ো ছাড়ো। সকলে উঠে পড়ল যে।

কার্তিক চোখ খোলে। বাইরে আকাশে লাল ছোপ। জানালা দিয়ে চোখ যায়

দূরে, আকাশের আগল ছাড়া আঙ্গিনায়, গাছ গাছালির মাথায়। আস্তে আস্তে আরো সব পাখি ডাকছে। একটি গরুর গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচ পথে বেজে ওঠে। ওদিকে সোনার মাথা নাড়ায় তার গলায় বাঁধা পুঁতির মালা আর ঘন্টা বাজে ঠিং ঠিং। বৈরাগীর খঞ্জনী দূর পথে হারিয়ে যায়। কাকটি শিউলি ডাল থেকে উড়ে যেতে যেতে জানান দেয় কা-কা-কা। কার্তিক মাথা নেড়ে বলে—না না না।

—না ছাড়লে যে আমাকে গাল মন্দ খেতে হবে।

—সকাল হয়েছে ?

—চেয়ে দেখো। বাইরে তাকাও।

কার্তিক টান টান চোখে পূর্ণর চোখের ভিতরে তাকালো। ঠোঁটের হাসিটি মিলিয়ে গেলেও চোখের কালো তারা ঝিকমিক করছে শেষরাতের আকাশে না মিলিয়ে যেতে চাওয়া নিশি জাগানিয়া তারাটির মতন। মাথার মাঝখানের সিঁথি ভেঙেকোঁচকানোচুল কপালে এসে পড়েছে। মুখখানা কেমন ছেলেমানুষের মতন লাগছে। সেদিকে তাকিয়ে পূর্ণর আর উঠে যেতে ইচ্ছে করে না। সে বলে—কই দেখলে না সকাল হয়েছে কিনা।

—দেখছি তো।

পূর্ণ নিজের দিকে হাত দেখিয়ে বলে—আকাশ কি এখানে ?

কার্তিক হাসে—হ্যাঁ। আকাশই তো দেখছি।

—এই সাত সকালে তোমার মাথার ব্যামো ধরেছে ?

—ধরেছে সেই চার বছর আগে। যতো দিন যাচ্ছে ততো চেগে উঠছে।

—তাহলে ওঝা ডাকি ?

কার্তিক অমনি বদখত সুরে গেয়ে ওঠে—সর্প হয়ে দংশন করো ওঝা হয়ে ঝাড়ো, আবার ঝাড়িলে বিষ নামাতে পারো যদি কৃপা করো রে—

পূর্ণ হাত ঠেলে সরিয়ে উঠে যায়।

একটু বেলা হতে কার্তিককুমার রওয়ানা হয়ে গেল মদনপুরে সোনার পিঠে চড়ে। যাবার আগে চাট্টি মুড়ি খেয়ে গেল। বলে গেল বেলাবেলি ফিরে এসে ভাত খাবে। পূর্ণ হেঁসেল থেকে দেখলো কর্তাকে পিঠে পেয়ে ঘুড়িটার কি চনমনে ভাব। উঠে বসতে না বসতে নেচে উঠলো। আর চোখের পলকে আশ্বিনের উঠোনে একরাশ শিউলি চারপায়ে চটকেমটকে উড়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল ধুলোর হাওয়া আর কিছু ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি।

যে মানুষ বলে গিয়েছিল বেলাবেলি ফিরবে অনেক অবেলায়ও সে ফেরে না। পূর্ণ ভাত বেড়ে তুলে রাখে। বড়ি দিয়ে চারামাছ ঝাল আর ভাত নিবে আসা কাঠের উনুনে থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখে। ভাসুর আর তার ছেলেরা খেয়ে

নিয়েছে। খায়নি কেবল তারা চারজন। চিন্তা করে কূল পায় না পূর্ণ। কোথায় গেল সে। এতো দেরী হবার তো কথা না। তবে কি জমির আল নিয়ে মারদাঙ্গা বাঁধল। নিজের ভাবনা নিজের মনেই রাখে পূর্ণ। কাউকে তো আর বলতে পারা যায় না। শাশুড়ি গালে হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে, একধারে লক্ষ্মী বসে অন্নর জন্যে কাঁথা সেলাই করছে। ভাসুর উঠোনে বসে, একখানা হাত পাথরে নরুন শান দিচ্ছে। সকলের চুপ করে থাকার মাঝখানে ঐ শান দেওয়ার শব্দ উঠছে খ্যাঁস খ্যাঁস। জা গেছে পুকুরে। আশ্বিনের বেলা নামতে বসেছে পশ্চিমে। সকালের প্রথম চোখ মেলবার সময়কার ফুটি ফুটি ভাব এখন নিবু নিবু। ক্লান্তিতে চোখ ভেরে আসছে, আলসেমিতে এলানো দিন আড়ামোড়া ভাঙছে। শয্যে পাত গো, শয্যে পাত। আর যে পারি না। সারাদিন বড়ো ডামাডোল গেছে। এখন একটু গা ফেলতে পারলে বাঁচি। আজকের মতন পালা শেষ। পূর্ণর ঘরের পশ্চিম জানালায় একলা দাঁড়িয়ে, বুকের কাছে অন্নপূর্ণা। ওদিকের পথ দিয়ে মুনিষ মাহিন্দরেরা গরু চরিয়ে ফিরে যাচ্ছে যে যার ঘরে। বাছুর তার মাকে ডাক দেয় হাম্বা আ আ। মা সাড়া দেয়। দূর আকাশের গাছপালার দিকে পাখিরা উড়ে চলেছে ডাকতে ডাকতে। পুকুর ধারে ও বাড়ির মেজো বউ হাঁস ডেকে নেয়—আয় আয়, চই চই চই চই। বাঁশ বাগানের সুঁড়ি পথে এক দঙ্গল হাঁস প্যাঁক প্যাঁকিয়ে গল্পগাছা করতে করতে ঘরে ফেরে। পিছনে মেজো বউয়ের গজগজানি। দুটি বউ কলসি কাঁখে জল নিয়ে ফিরে যায় হাসতে হাসতে। পূর্ণ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখে সকলেই ঘরে ফিরছে। এদিকে আকাশের রঙ বদলায়। গেরুয়া থেকে গোলাপী আর শেষকালে কেমন ম্লান হয়ে যায়। মরা আলোর উঠোনে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের স্থির ভেসে থাকার নিচে একটি চিল ওড়ে নিশ্চিন্তে। যেন সে সকলের শেষে ফিরবে। সকলের ফেরা দেখে তার ফিরবার সময় হবে। পথের শেষে খঞ্জনী বাজে। ফিরছে, অঘোর বোষ্টম ভিক্ষা কুড়িয়ে ঘরে ফিরছে। খঞ্জনী বাজে। ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্, গান হয় ঘুমের গলায়—দিনশেষের ঐ আলোর মতন নিচু সুরে। অমনি ঝপ্ করে আলো নিবে যায়। আকাশ হতে অন্ধকার নেমে আসে মাটিতে। পাড়ায় পাড়ায় শাঁখ ফুকরে ওঠে। উঠোনের তুলসীতলায় কে যেন প্রদীপ রাখে। দিন শেষ হয়ে রাত এসে দাঁড়ায় দোরগোড়ায়।

অনেক রাতে একটি গরুর গাড়ি এসে থামে উঠোনের মুখে। চার পাঁচজন মানুষ। সবার আগে কেরোসিনের বাতি হাতে চৌকিদার। পূর্ণ তখনো ঘরের জানালায়। ভাসুর চিৎকার করে ওঠে—ওরে এ কি করলি রে।

শাশুড়ি কেঁদে উঠতে পূর্ণ একলাফে মেয়ে কোলে বাইরে এল। দেখলো ছইয়ের নিচে বিচালির শয্যায় কার্তিককুমার শুয়ে আছে। ঠোঁট নড়ছে অল্প

অল্প। আর মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। গাড়ির পিছনে অন্ধকারে সোনা চুপ করে দাঁড়িয়ে। তার চোখ জোড়া অন্ধকারে জ্বলছে।

চৌকিদার বলে শিমুরালীর কাছে ধান ক্ষেতের পাশে কার্তিক মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে বুঝি পড়ে গেছে। মাথায় আর বুকে চোট লেগেছে। ভিন গাঁ থেকে ফেরবার সময় চৌকিদার দেখতে পেয়েছে তাকে। সেই থেকেই জ্ঞান নেই। কেবল ঘোড়াটা পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। চিনতে পেরে চৌকিদার ছুটে গিয়ে দু-পাঁচজন মানুষ আর গরুর গাড়ি যোগাড় করে তারপরে তাকে নিয়ে এসেছে। পূর্ণ দাওয়ার বাঁশ ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়ে।

নিমাই গিয়ে যখন পতাকি ডাক্তারকে ডেকে আনে তখন কার্তিক জোরে জোরে শ্বাস টানছে। দাওয়ায় বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার পাটকরা চুলে জল কাদা। বুকের কাছে জামাটা ছিঁড়ে ফালা ফালা। মাথার কাছে লণ্ঠন জ্বলছে। মেয়েটা মাই কামড়ে পূর্ণর বুকের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। ভাসুর উঠোনে অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। লক্ষ্মী কেঁদে মাথা কুটছে জোড়া পাঁঠা মানত করলাম মা। আমার দাদাকে বাঁচাও। সোনাকে কেউ আজ আর বেঁধে ঘরে তোলেনি। সে উঠোনের একপাশে তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ জোড়ায় গনগনে আঁচ। পতাকি ডাক্তার নাড়ি টেপে তারপর কার্তিকের বুকের কাছে হেঁট হয়ে দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে—কি সব্বোনাশ। বুকে যে ঘোড়া লাথি মেরেছে।

—কি বলছেন মোশাই! ভাসুর ছুটে আসে।

—হ্যাঁ। বুকটা যে মাড়িয়ে একেবারে ছেঁচে দিয়েছে। ইসস্ মাথায়ও দেখছি চোট।

পূর্ণ তাকায় সামনে। দেখে সোনা পা ঠুকছে। চোখের আগুন যেন তার দিকেই শানানো আছে। লেজের ঝাপটে শূন্যে চাবুক হাঁকাচ্ছে। গলায় পুঁতির মালা ঝকমক করছে আর ঘণ্টা বাজছে ঠংঠং। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ইনজেকশন তৈরি করতে বসেন। শাশুড়ি জা দূরে দাঁড়িয়ে, মুখে আঁচল চাপা। উঠোনে আরো কিছু মানুষ এসে জমেছে। একটু দূরে পারুল। সে কাঁদছে না। কেমন পলকহীন চোখে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাসুর ছুটে যায় সোনার দিকে—ওরে ডাইনী তোর জন্যে যে প্রাণটা দিতে পারতো তার তুই একি করলি।

সোনা মুখ ফিরিয়ে নেয়। পা ঠোকে। ঘণ্টা বাজে ঠন্ঠন্। শাশুড়ি কেঁদে ওঠে। ডাক্তার ধমকে বলেন—তোমরা এমন করলে আমি কি করে চিকিচ্ছে করি বলতো।

পূর্ণ যেন বুঝতে পারছে না কোথা থেকে কি .হচ্ছে। সকালবেলাকার সেই হাত দিয়ে বেড় দেওয়া টান এখনো যে দেহে লেগে আছে। আর সেই বেসুরো গান। হ্যাঁ তাও কানে রয়েছে। তবে, তবে কি হচ্ছে এ সমস্ত। পূর্ণ চারপাশে চোখ তুলে দেখে সবাই অস্থির। কাঁদছে, হুতাশ করছে। সে কেবল স্থির। তার চোখে জল নেই। আর একজন উঠোনে থেকে থেকে পা ঠুকছে। তার দুই চোখে শুকনো আংরা।

পতাকি ডাক্তার সুঁচ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পিছিয়ে নেয়। বাম হাতে কার্তিকের নাড়ি আর অপর হাত বুকে। আস্তে আস্তে ফোঁড়বার যন্ত্র পাশে নামিয়ে রাখে। পূর্ণ দেখতে পায় কর্তার নাক দিয়ে সরু সুতোর মতন রক্ত নামছে। ঠোঁট, চিবুক আর গলা বেয়ে দুটি ধারা নেমে আসছে বুকের কাছে। গেঁজলা ওঠা মুখটি সামান্য হাঁ আর বোঁজা চোখ দুটি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে—সকালবেলাকার সেই সিকিখানি বোঁজা চোখের মতন। কর্তা সেইরকম বিটলে হাসি হেসে পূর্ণর চোখের দিকে চেয়ে এখুনি বলে উঠবে—আকাশই তো দেখছি। কিন্তু এই আকাশে এখন কর্তা কোন সকাল দেখবে গা ? সত্যি বাপু, মাথার ব্যামো সত্যিই চেগেছে।

উঠোনে হাওয়া হয়। শিউলির বাস এসে নামে তার মাঝখানে। আকাশে কাটাছেঁড়া মেঘের আড়ালে এক চিলতে চাঁদ বাঁশঝাড়ের মাথায় আটকে থাকে। রান্নাঘরের চালে বনবিড়ালটা এসে গুঁড়ি মেরে বসে। সোনা মাথা নামিয়ে তার চালার দিকে হেঁটে যায়। পতাকি ডাক্তার হেঁট হয়ে কার্তিককুমারের বুকে কান চেপে ধরে কি যেন শোনবার চেষ্টা করে।

রাত শেষ হতে আর দেরী নেই। একটি রাতের বিশ্রামের পর আবার জাগরণ। অন্ধকার সরিয়ে আলোর আগমন। পাখি ডেকে উঠলো বলে। গাছপালা এখুনি আয়েশ ভেঙে চোখ মেলবে। পৃথিবী নড়ে উঠবেন। দুয়ারে গোবর ছড়া ঝাঁটপাট পড়বে না আজ। কেননা কারোর তো আজ রওয়ানা হবার নেই। কেউ ফিরেও আসবে না আজ। ঘোড়ার পিঠে ঘণ্টা বাজিয়ে কোনো পুরুষের দূর মফস্বলে যাবার তাড়া নেই আজ। তাই তো সকল কাজে এতো এলাকাঠি।

আলো আঁধারি পুকুরের আঘাটায় বাসি ছাইয়ের স্তূপ মাড়িয়ে পূর্ণ জল থেকে ওপরে উঠে আসে। ঠক ঠক কাঁপছে মেয়ের আদুল অঙ্গ। এমন সময় স্নান করা তো এই প্রথম। পুকুরের ওপারে ঘাস বনে আর চুড়ো করা গাছপালার জঙ্গলগড়ে ফিরে অন্ধকার গড়িমসি করছে। একটি কাক ডেকে উঠলো। এদিকে চোখ পড়তে দেখে পারুল এসে দাঁড়িয়েছে ঘাটের মাথায়। অন্ধকারে তার মুখ

দেখা যায় না। তবুও বোঝা যায় সে ঠিক তেমনি পাতা না পড়া চোখে পূর্ণর দিকে চেয়ে রয়েছে।

দুই বিধবা পূর্ণর হাতের শাঁখা ইঁট দিয়ে ভেঙে দেয়। আর একজন মাথার সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলতে থাকে অতি যত্নে। পূর্ণ দুই হাঁটুতে মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকে।

উঠোনে পা দিতে চোখে পড়ে দুয়ারের একপাশে আগুন করা হয়েছে। ভিজে কাপড় মানুষগুলির অন্ধকার হাত আগুন স্পর্শ করছে। চালার নিচে সোনা। ডাবায় মুখ ভরে বাসি জাব গপগপ করে গিলছে। সে এসব দেখেও দেখছে না। ওপাশে শিউলিতলার ঘাস শাদা হয়ে আছে। কেউ সেখানে পা দিয়ে দলে যায়নি।

ঘরে অন্নপূর্ণা ককিয়ে উঠতে পূর্ণ এই প্রথম দুয়ারে আছড়ে পড়ে কেঁদে ওঠে। মাটিতে মুখ ঘষে, ভিজে চুলে জলকাদা মাখামাখি হয়ে যায়। পূর্ণ এই প্রথম রাত্রি শেষের আকাশে মুখ তুলে কাঁদে।

লক্ষ্মী এসে তুলে ধরে তার মুখখানি।—তুই কাঁদবি কেন। ভাই তো মরেছে আমার। তোর জন্যে তো মেয়ে রেখে গেছে। বল্, কাঁদবি কেন বল্।

দুয়ারেব ওপারে পথের ধুলায় খঞ্জনী বাজতে বাজতে হারিয়ে যায় দূরে। নাম দিতে পথে নেমেছে বোষ্টম।

বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি নেমেছে। চালাব নিচে এ বড়ো সুখের বাত। নাতি, পুতি, বউ আর ছাগলছানা নিয়ে শুয়ে আছে পূর্ণ নিজের ঘরে। কেউ বাইরে নেই, সকলে ঘরে। এর চেয়ে শান্তির আর কি আছে এ জগতে। এমনি সুখের রাতে মনে পড়ে সেই মানুষটির কথা যে কিনা একদিন মসকরা করতে করতে চলে গিয়েছিল। বলেছিল ফিরে এসে চাট্টি ভাত খাবে। কিন্তু ফেরেনি। কিন্তু আজ তো সকলে ঘরে ফিবে এসেছে। কারো্র না ফেরাব ভাবনার দায় মাথায় নিযে পূর্ণকে বসে থাকতে হয়নি জানালা আগলে। পূর্ণর মনে হয কর্তা তার কথা রাখেনি। সোনার জন্যে একটি পুরুষ এনে দেয়নি। চক্রদহে মানুষ ডোবে, ভগীরথের রথের চাকা ভেঙে যায়। আর সেই নিযম রক্ষা করতে গিয়ে পূর্ণর জীবনরথের চাকাও ভাঙল সেই মাটিতেই। আর এখানেও সেই ঘোড়া যতো কারণ—-অকারণ।

আমপাতায় বৃষ্টি পড়ে শব্দ উঠছে পট পট পট। পূর্ণ শুনছে খট্ খট্। সওয়ার হারানো সোনা বুঝি আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পথে, প্রান্তরে, আকাশে—পূর্ণশশীর মনের খাঁ খাঁ উঠোনে।

যায় যায় যায়, পেছু পানে চায়।

কার্তিককুমার চলে গেল, পূর্ণর জন্যে রেখে গেল অন্নপূর্ণাকে—আনন্দের চিহ্ন, স্মৃতির পুঁটুলি। যাবার সময় নিজের আনন্দটুকু নিয়ে গেল, পূর্ণর জন্যে পড়ে রইল তার ছোট ঐ মেয়ে।

কার্তিক চলে গেল শরতে যখন কিনা তার প্রথমবার আগমনের সময়। কার্তিকঠাকুর হ্যাংলা, একবার আসে মায়ের সঙ্গে একবার আসে একলা—সে কথা আর সত্যি রইল না। এবারের শরতে কি মা দশভুজা কি দুই মেয়ে আর গণপতিকে নিয়ে আসবেন। আর একপাশে কি ময়ূরটি কেবল কার্তিক ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে। সোনাকে ভাসুর নবনীধর কোনো সাজা দেয়নি। বাড়ি থেকে দূর করে দেয়নি। তার বরাদ্দ অন্ন-জল ওঠেনি। কেবল তার লাগাম খুলে নেওয়া হয়েছে।

কার্তিক চলে যাওয়ার একমাসের মধ্যে কাকা রামকৃষ্ণ পূর্ণ আর অন্নপূর্ণাকে নিয়ে এসেছে কাঁচরাপাড়া গ্রামে। মেয়ে আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। ভাসুর কেবল একবার বলেছিলেন—তোমার এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা তো আছি।

কাকা বলে—বেয়াই অপরাধ নেবেন না। এ সময়ে মার হাতের ছোঁয়া যে বড়ো দামী। সে বিধবা যে অনেককাল ভাঙা বাড়িতে একলাটি পড়ে আছে।

ভাসুব বলেন—বেশ, আ: তোমায় কি দিয়ে ধরে রাখি বলো। তবে মন করলেই খবর করো। আমি নিজে যেয়ে তোমায় নিয়ে আসবো।

মায়ের কাছে ফিরে আসবার আগের দিন রাত্রে পূর্ণর চোখে ঘুম নেই। মেয়ে ঘুমোচ্ছে। একলা শুয়ে শোনে বাইরে বাতাসের শব্দ। আজই শেষ রাত। চার বৎসরের জন্যে পাতা সাধের আসন কাল রাত পোহাতে গুটিয়ে ফেলতে হবে। এতোদিন যেখানে বসা হল তার প্রতি কি একটুও মায়া পড়েছে? একবারও কি ইচ্ছে করছে আসনের কাজ কবা ফুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দেখতে? কি করে করবে, আর একটি আসন যে উধাও। সেটি বগলদাবা করে তার অধিকারি যে সটকে পড়েছে। একলা আসনে বসে থাকতে কার আর ভাল লাগে। সব সাধ যে জলে যায়। পূর্ণ শুয়ে শুয়ে শোনে দূরে কোথায় কীর্তনের আসরে খোলকরতাল বাজছে। বাতাসে বাতাসে সে সুর ভেসে আসছে এইদিকে। আরো পরে কীর্তনের আসর ফিরতি মানুষজন পাশের পথ দিয়ে গল্প করতে করতে ফিরে যায়। হেঁসেলের চালে সেই বনবিড়ালটি ধুপধাপ আনগোনা করে। পূর্ণ জানালা দিয়ে দেখে পূর্ণিমার দিকে যাত্রা করা চাঁদের আলোয় বাইরের চরাচর

ধুয়ে যাচ্ছে। আকাশের কোথাও কোনো আঁচড় নেই, কুটোটি লাগেনি অঙ্গে। দিক আলো করে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসছে। ঘরের ভিতরে চোখ যায়। দেয়ালে আংটার সঙ্গে ঝুলছে এস্রাজখানা।

এস্রাজ বাজে বাইরে। কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে, টেনে টেনে জলদে। জ্যোৎস্নার দুধে পা ডুবিয়ে বাজনদারটি বুঁদ হয়ে বসে আছে। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। বাঁশবনে পাতার সরসরানি। বাতাস ভারি হয়ে আছে শিউলি ফুলের বাসে। দূরে ছোট চালার নিচে অন্ধকার মুখে করে সোনা দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের কাছে চাঁদের আলো। বাজনদারের কোনো দিকে তাকাবার অবসর নেই। বাজনা বাজে ধীর জলদে এই মোলায়েম বাতাসের মতন—প্রাণ তুমি আমার মাগুর মাছের ঝোল···। পূর্ণ শোনে আর মুখ টিপে আসে।

পূর্ণ ফিরে এল আবার সেই পুরনো মাটিতে যেখানে তার নাড়ি পোঁতা। সেই নাড়ির টানেই বুঝি এমন করে চলে আসতে হল। পিছনে পড়ে রইল দিনকয়েকের সংসার। চিলু ধুয়ে পরিষ্কার হয়েছে। পোঁতা বাঁশের গোড়ায় দায়ের কোপ বসানো কলসি ফুটো হয়ে জল পড়ে বগবগিয়ে।

মার কাছে মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে কাকা চলে গেল। বলে গেল—বৌদিদি, বিপদে আপদে যেন ডাক পাই।

মা বলে—আমার আর কোনো ভয় নেই ঠাকুবপো। সব কেটে গেছে।

পূর্ণ বার দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলো কিছুই তেমন বদলে যায়নি। পথের পাশে বনজঙ্গল, বাবলা আশশ্যাওড়ার বন। কচু বনের রাজ্যপাট। আর আছে তেমনি করে সাজানো জমিদার বাড়ির সেই এলোমেলো বাগানটি যার শেষ মাথায় আকাশ নেমে এসে ডুব দিয়েছে ঘন কালো গাছপালার মধ্যে। সেই জল টল টল পুকুর পাড়ে দাঁড়ানো কুলগাছটি। নারকেল সুপারির সার, আম কাঁঠালের ছায়া—কিছুই হারায়নি। কেবল যা বাড়িটি একটু জীর্ণ হয়েছে আব মায়ের শরীরটি সামনে একটু ঝোঁক নিয়েছে।

ফিরে এসে প্রথমেই মনে হয়েছিল উমার কথা। কিরণের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সেই বিধবা তার একমাত্র সখী হয়েছিল। আজ আবার তাকেই ধরে বসতে মন চায়। বিধবার প্রাণ বিধবা ছাড়া আর কে বুঝবে। কিন্তু ডালাভরা আশা আর কুলোভরা ছাই। উমা মারা গেছে গেল বছরে জ্বরবিকারে। পূর্ণ নিরিবিলি বাগানে বসে উমার জন্যে কাঁদে ঠিক যেমন করে কেঁদেছিল কিরণশশীর বিয়ে হয়ে চলে যাবার কালে। সেদিন বিয়ের আসরে এসে দাঁড়াতে বাধা ছিল বলে আসেনি। কিন্তু আজ যখন পূর্ণর পথ ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার তখন উমার পথ ফুরিয়ে গেছে। আর যে আসবার উপায় নেই। পূর্ণ মেয়ের মুখে স্তন গুঁজে দেয় আর

ভাবে উমা একটিবার এলে সেদিনকার না আসার বোঝাপড়াটা সেরে নেওয়া যেতো।

পূর্ণ মার সঙ্গে যজমান বাড়ি যায়, মন্দিরে পালা সেবা করে আর মেয়ে ট্যাঁকে করে বাগানে বসে নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি তৈরি করে। মা বলে—ঠাকুরের কাজ করতে করতে ভাববি মানুষের সেবা করছি। তাহলে দেখবি বিগ্রহকে আর পাথর মনে হবে না। নিজের মনের পাথরও নেমে যাবে অমনি।

পূর্ণ বলে—তোমায় এ কথা শেখালে কে মা?

—কাউকে শেখাতে হয় না মা। আপনিই শেখা হয়। তবে হ্যাঁ কাউকে তো পথ চিনিয়ে দিতে হয়। তেমন একজন আছেন। তোকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।

—তিনি কে মা?

—উকিলমা। আমাদের বেহারী উকিলের পরিবার।

—আমাদের যজমান?

—যজমান তো বটেই। তবে আমিও তেনার যজমান।

—সে আবার কি?

—যজমান কি কেবল্ কামান করলেই হয় রে। উকিলমা যে আমার ভেতরের কাঁটাগুলি একটি একটি করে তুলে দেন। দুঃখীর দুঃখু যে মানুষ বোঝে সে তো আরো বড়ো যজমানী করে মা।

পূর্ণ অবাক হয়ে শোনে মার কথা।

—'গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।'

বই বন্ধ করে তিনি পাশে রাখা ডাবর থেকে একটি পান তুলে মুখে দিলেন। ঘোমটা নামিয়ে ভেঙে পড়া হাত খোঁপা আবার তুলে বেঁধে দিলেন। সামনে ছোট জলচৌকির ওপর বই রাখা আছে আর আছে একটি পাখির পালক। বইয়ের পাতা খুলে পালকটি তার মধ্যে রেখে আবার বই বন্ধ করে তিনি প্রসন্ন মুখে সকলের দিকে তাকালেন। মাঝখানে সেজ জ্বলছে। আলোর চারপাশে একটি পোকা ঘুরছে। পোকাটা এক সময় আলো ছুঁয়ে ফেলল আর তৎক্ষণাৎ

মরণ। উকিলমা বলেন—দেখলে কাণ্ড

এ পাশে তিনজন পাড়ার বউ বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে—হ্যাঁ।

—কি হ্যাঁ।

—পুড়ে মোলো।

—আর কিছু না?

সকলে চুপ। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে। পিছনে নিভাননীর কাছে ঘেঁষে অন্নপূর্ণাকে কোলে নিয়ে বসেছিল পূর্ণ। নিভাননী বলে ওঠে—আমার কিন্তু একটি কথা মনে পড়ছে দিদি।

হেসে দৃষ্টি পিছিয়ে নিয়ে যায় উকিল মা অন্ধকারে যেখানে মা-মেয়েতে মিলে জড়োসড়ো বসে আছে।—ওমা, তুমি কখন এলে গা?

—এই এলাম দিদি।

—বেশ। তা তোমার কি মনে পড়ছে শুনি।

—আপনি সেই একখানি পদ বলেছিলেন, সেই-পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয় বোকার মত—

—বাঃ। দেখলে তোমরা। ছেলেমানুষ তোমরা তাও মনে থাকে না। হ্যাঁ গো, কবি মধুসূদনের পদ বলেছিলাম।

নিভাননী লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয়। উকিলমা বলেন—এই দেখো না, আজ বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল শেষ হল। তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?

নিভাননী বলে—আমার মন্দ কপাল দিদি।

—বেশ তো। পরে আবার হবেখন। কাল থেকে আবার নতুন বই ধরবো। তা তোমার সঙ্গে ওটি কে?

—এও এক আটকপালে দিদি। আমার মেয়ে পূণ্যশশী। নে মা দিদিকে পেন্নাম কর।

পূর্ণ উঠে গিয়ে উকিলমার পায়ে হাত ছোঁয়ায়। অমনি অন্ন কেঁদে ওঠে। উকিলমা তাড়াতাড়ি পূর্ণর হাত ধরে বলেন—আহা মবে যাই। সত্যি তোমার নাম সাত্থক মা। কিন্তু কপাল যে আমারই মতন। আমার নামও যে ধরিত্রী, কিন্তু—

পূর্ণ উকিলমার কপাল আর সিঁথি জোড়া সিঁদুর দেখে বুঝতে পারে না এমন জ্বলজ্বলে কপালের কি দোষ থাকতে পারে। অমন মা দুর্গার মতন চেহারায় কি আটফাটা কপাল মানায়। উকিল মা বলেন—তুমি এর কথাই সেদিন বলেছিলে?

নিভাননী মাথা হেলায়। হ্যাঁ। দু মাসের ঐ মেয়ে রেখেই জামাই আমার—

থাক্ থাক্ । তা হ্যাঁ মা, রোজ সন্ধেবেলা এখানে এলেই তো পারো তোমার ভাল লাগবে। পূর্ণর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—আচ্ছা মা।

উকিলমা পূর্ণর একটি হাত ধরেন—মা যখন বললে তখন তো তোমাকে চুমো খেতে হয়। কাছে এসো মেয়ে।

পূর্ণ এগোবার আগেই তিনি দুই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার কপালে একটি চুমো দেন। পান জর্দার সুরভির ভিতর থেকে পূর্ণ অনুভব করে তাঁর স্পর্শ কতো ঠাণ্ডা। সে চোখ বোজে। উকিল মা বলেন—ভয় কি তোমাব। আমি আছি। তোমার গর্ভধারিণী আছেন। আমরা দুজনাতে মিলে তোমার সব দুঃখু ভাগ কবে নেবো। এ বেশ হল। দুঃখের তেমাথা এক হল। কি বলো নিভাননী।

মা বলে—মেয়ে আমার বোকা হাবা নয় দিদি। ওকে একটু ভাল ভাল পদ শিখিয়ে দেবেন। একটু গড়ে পিটে দেবেন।

উকিল মা হাসেন—বেশ তো, আমার যতোটুকুন ক্ষমতা। তা হ্যাঁ মা, তোমার নামের মানে জানো ?

পূর্ণ অবাক। এমন কথা সে তো কোনদিন শোনেনি। সে মাথা হেঁট করে থাকে। উকিল মা বলেন—পূর্ণশশী। তুমি যে পূর্ণিমার আকাশ জুড়ে থাকো মা।

পূর্ণ চোখ তোলে। আশ্চর্য, তার নামেব এতো আলো। উকিলমা বলে যান—যে সাবা আকাশ জুড়ে সমস্ত পৃথিবীতে আলো দেয় তাব কি কখনো মনে কোনো কালো থাকতে পারে। তুমি যে আমাকে আলো দাও। আমার অন্ধকার দূব করে দাও মা।

পূর্ণ অবাক হয়ে বলে—সে কি মা !

—হ্যাঁ আমি যে ধরিত্রী, পৃথিবী।

পূর্ণ বুঝতে পাবে। মনে পড়ে যায় সেই দিন বাতেব চরাচর ভাসানো আলোর উঠোনের ছবিখানি। সে আলোর সামনে অন্ধকার যে মোটেই মানায় না। কেবল যে মানুষ জোব করে মুখ আড়াল রাখতে চায় তাব কথা আলাদা। গলা অবধি আলোয ডুবে গেলেও মুখটি যে সেই আঁধারে বাস করে। এ আলো তাব যেচে নেওয়া কুটুম্ব।

—কাল থেকে রোজ সন্ধেবাতি দিযে এখানে চলে এসো। তোমার জন্যে শেলেট পেনসিল আনিয়ে রাখবো।

তিন বউ যারা এতো সময় চুপ করে বসেছিল গা তোলে। পূর্ণ বলে—আমি যে পড়তে পারি না মা।

—আমি পড়বো তুমি শুনবে। শুনতে শুনতে দেখবে তোমারও পড়তে ইচ্ছে করছে। তোমাকে আমি একটু একটু করে শিখিয়ে দেবো।

বাইরের উঠোনে খড়মের শব্দ ওঠে। তার সঙ্গে গলা খাঁকারি। পাশের ঘর থেকে দাসী মেয়ে এসে বলে—মা, বাবু খেতে এলেন।

উকিলমা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন—বেশ বলেছো নিভাননী। পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়, না দেখিলি, না শুনিলি এবে রে পরান কাঁদে। চললাম সেই আগুনের কাছে ভাই।

উকিল মা দুই পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ান—পূর্ণশশী, এই সব নিয়ে থাকলে দেখবে আর কোনো দুঃখু নেই। তাহলেই তোমার নাম সাত্থক হবে। কাল এসো কিন্তু।

নাতি বউ কাজলী জিজ্ঞাসা করে—উকিল মার মন্দ কপাল কেন ?

পূর্ণ পাতে জল ঢেলে ঢক ঢক করে গলায় ঘটি উপুড় করে হাত তোলে। অর্থাৎ জল গলা দিয়ে নামতে একটু সময় লাগবে। পথঘাট যে বড়ো অপরিষ্কার।

হারাধন খেয়ে শুয়ে পড়েছে অনেক সময়। কাল থেকে তার আবার চটকলে ডাক পড়েছে। সকাল সকাল বেরোতে হবে। ছেলে মেয়েরাও সব ঘুমিয়ে গেছে। কেবল ঐ পোঁদ পাকা দিনমণিটার চোখে ঘুম নেই। যতো রাতই হোক না কেন সে বড়মার পাশে বসে খাবে। শুধু কি খায় কথাও যে হাঁ করে গেলে—না বুঝুক। আবার কথার মাঝখানে মুরুব্বির মতন ফুট কাটে। পরামাণিকের ঝাড় কি সহজে নির্বংশ হয়। কাজলী আপত্তি করে—বড়ো মানুষের কথার মাঝখানে তুই কেন রে ? যা শুতে যা।

পূর্ণ বলে—থাক্ না। ও তো কোনো ক্ষেতি করছে না বউ।

—উচ্ছন্নে যাবে যে।

—কথা শুনে কেউ কখনো উচ্ছন্নে যায় না বউ। যে যাবার সে অমনিই যায়।

পূর্ণশশী এঁটো হাতেই উকিলমার কথা বলতে বসে। সে কথকতা শোনে নাতি বউ কাজলী আর এক পেকে বরানগর চলে যাওয়া ড্যাবা চোখো বালক।

বিহারী মুখোপাধ্যায়ের এটি দ্বিতীয় নম্বর বিবাহ। প্রথম স্ত্রী বিয়ের বছর না ঘুরতেই চলে গেলেন ওপরে। তারপর অনেককাল বাদে এই বিবাহ। ধরিত্রী দেবীর বাপের বাড়ি ছিল এই নদে জেলারই মুড়াগাছায়। বাপ ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় সাণ্ডিল্য কুলীন। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। কুল রাখতে মেয়ের থেকে

পঁয়ত্রিশ বছরের বড়ো বিয়ে দিলেন বাঁড়ুজ্যে মহাশয়। কিন্তু বাপ কি জানতেন উকিলবাবুর কাছা অন্য একটি মেয়ে-মানুষের সঙ্গে বাঁধা। মেয়ে-মানুষটি বাগদীপাড়ায় থাকে আর ধামা ঝুড়ি বোনে। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে সে উকিলবাবুর ঘরগেরস্থালির কাজ করে দিতো। কেবল রান্না বাদ। তার জন্যে বামুন মা বরাদ্দ। বাবুর দুটি বাড়ি। একটি বাগান বাড়ি আর একটি একমহলা দোতলা। বাগান বাড়িতে তাঁর কেতাবপত্র থাকতো, মক্কেল মুহুরি এসে বসতো। বসবার ঘরের দেয়ালে সার সার হুঁকো টাঙানো ছিল। প্রথম পক্ষের কোনো ছেলেপুলে হয়নি। বিয়ে করে বাবু বউ এনে তুললেন সেই এক মহলা বাড়িতে। ধরিত্রীর মাথার ওপর শাশুড়ি ননদ কেউ নেই। বিয়ে উপলক্ষে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন এসেছিল তারা চলে গেল। আর ঠিক তিনদিনের দিন থেকে নতুন বউকে সংসারের দায় কাঁধে তুলে নিতে হল। তখন বয়স মাত্র চোদ্দ।

এ বাড়িতে এসে মেয়ে দেখলো কোথায় কোনো ঠাকুর দেবতার ছবি নেই, লক্ষ্মীর আসন তো দূরের কথা। কেবল কেতাব আর কেতাব। বাপের বাড়িতে বাঁধা মাস্টারের কাছে পড়ে ধরিত্রী লিখতে পড়তে ভালই জানতো। এ বাড়িতে এসে আলমারি ঠাসা বই দেখে তার আনন্দ হল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, বঙ্কিম কিছু বাদ নেই। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এ ছাড়া বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি দেবার মতন তুলসীমঞ্চও নেই। ধরিত্রীর মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক খুঁজে পেতে বাসনের সিন্দুক থেকে একটি শঙ্খ বার করল। প্রদীপ পিলসুজও পাওয়া গেল।

উকিলবাবু কাছারি থেকে ফিরে সোজা ঐ বাগান কোঠায় গিয়ে উঠতেন। রাতে আসতেন এ বাড়ি। কচি বউ রেঁধে রাখতো দুই এক পদ তরকারি, বাকিটা বামুন মেয়ে। দিনে ভাত খেতেন বাবু, রাতে লুচি আর ক্ষীর। বেশ বড়ো কানা উঁচু শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে ঘন ক্ষীর দিতেন উকিলমা আর একটি একটি করে লুচি ভেজে দিতেন থালায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের কোণ পরিষ্কার করে একটি ঘট পেতে তার সামনে প্রদীপ জ্বেলে শাঁখে ফুঁ দিয়েছে বউ। একটু পরেই বাইরে গলা খাঁকারি—কে, কে শাঁখ বাজায় ?

বউ ঘট প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দেখে সামনে বাবু। উকিল কর্তা বলেন—তোমাকে শাঁখ বাজাতে কে বললে ?

—কেউ না তো।

—তবে বাজালে কেন ?

স্বামীর এমন কঠিন মূর্তি বিয়ের পর এই প্রথম দেখলো ধরিত্রী। চোয়াল শক্ত, চোখ স্থির। কোনমতে বলে—এমনি।

—ও সব এমনি এমনি এখানে চলবে না। শুনে রাখো, এ বাড়িতে শিঙে ফোঁকা, জল বাতাসা দেওয়া, পুজো আচ্চা হবে না। ওসব আমি পছন্দ করিনে। শিঙে মানুষ বারবার ফোঁকে না বুঝলে, একবার কেবল ফোঁকে'।

সেই শুরু। তারপর থেকে যতোদিন কর্তা বেঁচে ছিলেন উকিল-মা কোনদিন পুজো পাঠ করতেন না, সন্ধ্যাবাতি দিতেন না, উপোস, পার্বণ, তীর্থযাত্রা এমনকি গঙ্গাস্নানও না। বলতেন—আমার সব পুজো ব্রত উদ্‌যাপন হয়ে যায় বই পড়লে। বইয়ের মধ্যেই তো সব কিছু আছে।

উকিল কর্তার মন মেজাজ ভাল থাকলে বউকে জয়দেব, ভারতচন্দ্র পড়ে শোনাতেন। বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ থেকে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতেন। আব সময় পেলেই বউয়ের খোঁপা বেঁধে দিতেন। ধরিত্রী আপত্তি করতো। পুরুষ মানুষের মেয়েদের চুলে হাত দিতে নেই।

কর্তা বলেন—তুমি না বই পড়ো। যে বই পড়ে তার মনে এ সমস্ত থাকতে নেই।

ধরিত্রী হেসে বলে—পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি মেয়েদের চুল বাঁধা কি করে শিখলে গা ?

বিহারী অমনি গম্ভীর হয়ে যান। থমথমে মুখে বলেন—বড়ো বেশী কথা বলো তুমি।

বিয়ের ঠিক উনচল্লিশ দিনের মাথায় ঘটলো সেই ঘটনা। সেদিন রাতের খাওয়া খেতে বসেছেন কর্তা। উকিল-মা লুচি ভাজছেন আর বামুন মেয়ে বেলে দিচ্ছে। কর্তা খেতে খেতে কাছারির গল্প করছেন। ধরিত্রী শুনছে অবাক হয়ে। বাইরে বৈশাখ মাসের অমাবস্যার রাত্রি। মিশ কালো হয়ে আছে চারিধার। কালির দোয়াত উপুড় করা আকাশে মিট মিট তারা জ্বলছে। দূরের নারকেল গাছের পাতায় দুটি ভুতুম পাশাপাশি বসে আছে আর মাঝে মাঝে ডাক পাডছে। এমন সময় দরোজায় আলো পড়ল। ধরিত্রী মুখ তুলে দেখলো দরোজার ওপাশে যে এসে দাঁড়িয়েছে তার বর্ণ ঐ আকাশের মতন। বাইরের অন্ধকার থেকে যেন উঠে এলো ঐ মূর্তি। বেশ ডাঁটো গড়ন, মাথার চুল টেনে বাঁধা। খোঁপায় ফুল, মুখে পান আর হাতে কাঠির আগায় নেকড়া জড়িয়ে আগুন জ্বলছে—অনেকটা মশালের মতন। মেয়েটি কালো হলে কি হবে মুখখানি লাবণ্যে ঢলো ঢলো। চোখ দুটি বেশ টানা টানা—একটু রক্তিম আর ঘুম ঘুম। বামুন মেয়ে চাকি বেলুন রেখে বলে উঠলো ওমা, একি !

কর্তা পাত থেকে হাত তুলে বসে তার দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। সেই চেয়ে থাকায় রাজ্যের আদেখলাপনা। ধরিত্রী বুঝে উঠতে পারে না কি হল

কর্তার। আর ঐ মেয়েই বা কে। কালোশশী মেয়ে দরোজায় ঠেসান দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে তারপর বলে ওঠে—কই গা, কেমন বউ হল একটু দেকি।

ধরিত্রী আস্তে উঠে দাঁড়ায়। আর সেই মেয়ে দরজা ছেড়ে ঘরের ভিতর পা রাখে। তারপর ধরিত্রীর সামনে এসে তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখের সামনে মশাল তুলে ধরে বসে—বাঃ, বেশ বউ, খাসা বউ। তাই তো বলি বাবুর দেকা কেন পাইনে। কচি মাগ নিয়ে মজে আচে যে।

কর্তা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মুখ বন্ধ, চোখ স্থির। মেয়ে বলে—কিন্তু ভাই, তোমার কি আর বর জুটছিলো না। অভাবে শুনিচি নাতজামাইও ভাতার হয়, তা তোমার কি ভাসুর ভাতার হয়েচে?

ধরিত্রীর কান গরম হয়ে ওঠে। ঠোঁট কামড়ে এতোগুলি কথার জবাব চেপে রাখতে চেষ্টা করে। মেয়ে আর দাঁড়ায় না। বাতি হাতে দরোজার দিকে যেতে যেতে বাবুর চোখে আড়ে তাকিয়ে বলে—পিরীত করলুম আমি তালগাছের আড়ে, সেই পিরীত চটে গেল মাঘ মাসের জাড়ে।

মেয়ের পিছনে পিছনে কর্তাও এঁটো হাতে চলে যান। পিছু ফিরে একবার তাকানও না। ধরিত্রী বুঝে উঠতে পারে না কি হল হঠাৎ। কেবল বামুন মেয়ে কেঁদে বলে—ওমা কি সব্বোনাশ হল। মাগী বিষবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল গা।

সেই দিন থেকে বিহারী কর্তা আর ধরিত্রীর সঙ্গে শুতেন না। বাক্যালাপও প্রায় বন্ধ। রাতে কেবল একটি বারের জন্যে খেতে আসতেন। খেয়ে আবার ফিরে যেতেন সেই বাগান বাড়িতে। উকিল মা ঐ সামান্য সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতেন।

উকিলমার কথা শুনতে শুনতে কাজলীর চোখে জল আসে। পূর্ণ ভাবে ঘুড়ি কেবল পুরুষ চায়। সে স্বামী রূপে বা সন্তানরূপে হোক না কেন। কেবল ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায় যখন মনে পড়ে ধরিত্রী দেবীর বুক নিঙড়ানো শ্বাসের কথা। মাতা বসুমতীকে কতো কি না সইতে হয়, ধারণ করতে হয়। তবুও তাঁর বুকে এক একদিন পূর্ণিমার অবসানে অমাবস্যার কালো আকাশ নেমে আসে। গভীর অন্ধকারে তিনি নিজেই নিজের আলো হয়ে জ্বলেন, নিজের অন্ধকারে নিজেই পুড়ে খাক হন। আলোই কেবল জ্বালায় না, অন্ধকারও যে সময় সময় পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

পূর্ণ উঠে দাঁড়ায়—শুয় পড় বউ। রাত হলো। সকাল করে উঠতে হবে যে।

দিনমণি বলে—বড়মা শোবে চলো।

—ওমা তুই এখনো চেয়ে আছিস যে। চোখ দিয়ে শুনিস নাকি অ্যাঁ। দিনমণি কথা বলে না। বুঝুক না বুঝুক ওরও যেন উকিলমার কথা শুনে ঘোর

লেগেছে। কুকুরটা ভুক ভুক করে। হারাধনের নাকে জগঝম্প বাজে। বাদলী ঘুমের ঘোরে কথা কয়। কৌটো খুলে নস্যি মুখে দেয় পূর্ণ। শোবার আগে নেশা না মুখে দিলে ঘুম আসতে চাইবে না কিছুতেই।

অভাগীর লগ্নে চাঁদ যায় দখ্নে।

মায়ের কথায় কাঁচরাপাড়াব এই মাটিতে কেউ পড়ে মার খায় না। কিন্তু অপর দিকে অন্য এক প্রশ্ন যে হাত উঁচিয়ে বসে থাকে। সামনে যাকে পায় তারই কোপ মাবে। উকিলমা বলতেন—আমাদের ওপর ঈশ্বরগুপ্তর হতভাগিনী পরিবারের অভিশাপ আছে। কেউ না কেউ তো তাঁর দুঃখের ভাগ নেবে।

পূর্ণ উকিলমার মুখেই শুনেছে এ গ্রামেরই এক ধনীর রূপসী মেয়েকে ঈশ্বরের বিয়ে করবাব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁকে জোর করে কুলীনের ঘরে বিয়ে দেওয়া হল। ছেলেমানুষ তাই জোর খেটে গেল। ঈশ্বর জীবনে তাঁর মুখ দেখেননি মেয়ে কুরূপা আর হাবা বলে। শোনা যায় তাঁর রামা নামে একটি খাস চাকর ছিল। সে সব সময় তাঁর পাশে পাশে থাকতো। বিয়ের প্রথম প্রথম স্ত্রী কাছে আসতে চাইলেও ঈশ্বর তাঁকে ঘেঁষতে দিতেন না। কেবলই এড়িয়ে চলতেন। একদিন ঘরে বসে বই পড়ছেন ঈশ্বর, আর রামা মেঝেতে বসে আছে। এমন সময় পাশের বারান্দা দিয়ে নতুন বউয়ের পায়ের শব্দ। পায়ের মল বাজছে ঝনাৎ ঝন। ঈশ্বর ভাবলেন বউকে একটু ভাল করে শিক্ষা দেওয়া যাক। ছেলেবেলা থেকেই তিনি হুল ফোটাতে বেশ পোক্ত ছিলেন। তা বউ যেই না দরোজার কাছে এসেছেন অমনি ঈশ্বর বিকট চিৎকার করে উঠলেন—ওরে রামা রে এ এ—

রামা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে বলে—কি হল দাদাবাবু?

ঈশ্বর বউয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বলে ওঠেন—ও রে রামারে, ঐ যে। ঐ যে রে—

এই পর্যন্ত কোনমতে বলে ঈশ্বর রামার কাঁধে মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। লজ্জায় অপমানে বালিকাবধূর মনটি যে কেমন করে উঠলো তা আর বলার নয়। সত্যি কি আমি এতো কুৎসিত যে স্বামী আমায় দেখলে জ্ঞান হারান। আমার মূর্তি কি মানুষের অসহ্য। ভাঙাচোরা মন নিয়ে মেয়ে সেখান থেকে তখনি ছুটে চলে গেলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কপট জ্ঞান হারা ছেড়ে উঠে বসলেন।

উকিলমা এই কথাটি প্রায় বলতেন। আর শেষকালে বলতেন—সেই

অবোলা নারী না জানি কতো নিঃশ্বাস ফেলেছে এখানকার বাতাসে।

উকিলমার কাছে এসে অবধি পূর্ণর নিষ্কর্মা মন অনেক কাজে জুতে পড়ল। নিকাজি মনই তো যতো অশান্তির আখড়া। তাই যতো পারো মনকে খাটাও। সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যা হলেই আর কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। মা রোজ যেতে না পারলেও পূর্ণ ঠিক বাতি জ্বলবার পরে উকিল মার দালানে গিয়ে জমে। তখনো হয়তো আর কেউ এসে পৌঁছয়নি। উকিলমা বামুন মেয়েকে ডেকে বলেন—ওরে পূর্ণকে কড়াটা এনে দে। এখুনি আবার সব এসে পড়বে।

এ নিত্যকার ব্যাপার। উকিলকর্তার ক্ষীর খাওয়ার শেষ ভাগ—কড়া পোঁছা ক্ষীরের চাঁচি পূর্ণর জন্যে রোজ তোলা থাকে। অতোখানি ক্ষীরের চাঁচি কম না, বেশ বড়ো তাল একটি। পূর্ণ হারাধনকে বলে—সেই চাঁচি খেয়েছি বলেই এখনো টই টই করে হেঁটে বেড়াতে পারি।

হারাধন মাঝে মাঝে তার মা অন্নপূর্ণার কথা বলে। বলে—মায়ের আমার কিছুই মনে পড়ে না। কেবল সেই আলতা রাঙানো চরণ দুটি।

নিজের বুকে হাত রেখে বলে নাতি—এখানে আঁকা আছে।

পূর্ণ বুঝতে পারে না কি করে হারাধনের সে কথা মনে থাকতে পারে। অন্নপূর্ণা যখন চলে গেল তখন ছেলের বয়স মাত্র দুই। তখনকার স্মৃতি মনে থাকে কি করে। না কি হারাধন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে দেখতে পায় চিতার শয্যায় মা শুয়ে আছে, বাইরে জেগে আছে আলতা রাঙানো টুকটুকে পা দুখানি।

অন্নপূর্ণার জীবনের একটি দিক মিলে যায় পূর্ণর সঙ্গে। মা-মেয়ে দুইজনেই মাত্র চার বৎসর স্বামীর ঘর করেছে। বিয়ে হয়েছিল কাষ্ঠডাঙায় ষোল বছরে। স্বামী অনাথের পাটের কারবার ছিল। প্রথম সন্তান ঐ হারাধন এল আঠারোয় আর মেয়ে গেল কুড়িতে পা দিয়ে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে নিয়ে। অনাথও গেল আর তিন বৎসর পর—সাপের কামড়ে। পূর্ণর তখনো যৌবন যায়নি। শোকে উপবাসেও দেহে ভাঁটা টানেনি। এসব কথা ভাবলে শ্মশানের একধারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই এক বগ্গা বাবলা গাছটির কথা মনে হয়। তার পায়ের নিচে কতো দেহ পুড়ে ছাই হচ্ছে। আগুন তাপে তার দেহ ঝলসে কালো হচ্ছে, ডালপালায় ঝুল পড়ছে,কিন্তু সে কখনো জ্বলে উঠছে না। তার ঐ দম্ভে মবাই সার। নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছে সারা অঙ্গে কাঁটার গহনা নিয়ে শ্মশান পাহারায়। এই শ্মশান পর্যন্ত চলে আসতে যে কতোবার হোঁচট খেতে হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। সে সমস্ত দড়িতে গেরো দিয়ে রাখলে এই বয়সে এমন করে নাতি-পুতি নিয়ে জেবড়ে বসে সংসার করতে হতো না। আসলে দুঃখ শোক হয়তো মানুষকে

আরো বেশী করে বেঁধে ফেলে। তখন—এই রইলতোরসংসার বলে মনের সঙ্গে চাতুরি করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। বার হলেও সে দু-পাঁচ দিনের জন্যে। আবার ঘুরে আসে এই আমতলায় নাতি-পুতির আস্তাবলে। পুতিরা টেনে ধরে আঁচল। বাদলী ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—তুই একটা লাক্কুসী। খালি খালি চলে যায়।

পূর্ণ তাকে বুকে নিয়ে বলে—ধন আমার। তা তোদের জন্যে কি জাত ধম্মো খোয়াবো।

হারাধন ঝামটা দেয়—তোমার ঐ একটাকা আট আনার জন্যে কি আমাদের রাজভোগ বন্ধ থাকছে।

পূর্ণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—সে বুঝলে এমন চটকলি হতিস্ না। তোর কি কোনো জাত আছে। তুই তো মেলেচ্ছ রে।

—তাই বলে তুমি হুটহাট বেরিয়ে যাবে। এটা একটা সংসার না।

—আমি তোর সংসারের ইজেরা নিয়ে বসে আছি নাকি। আমার তোর মত কেবল আপনি আর কোপনী করলে চলে না। আমার সংসার পাঁচজনাকে নিয়ে।

পুতিরা এসে সামনে দাঁড়ায়। পূর্ণ বলে—আমার হয়েছে সেই তীর্থে গিয়েও লাউ গাছ। নে তোরা হাত পাত।

তাদের হাতে দুটি একটি করে নকুলদানা তুলে দেয় পূর্ণ। খালি হাতে তো আসবার উপায় নেই। তাহলে যে বিভীষণের ঝাড় ছিড়ে খাবে। সকলকে লুকিয়ে থলি থেকে একটি কয়েত বেল বার করে কাজলীর হাতে দেয। বউ তো সেটি পেয়ে যাকে বলে আনন্দে কাঁসিহারা। পূর্ণ বলে—লুকিয়ে রাখিস্ বউ। ছেলেপুলে যেন না দেখে।

অমরনাথ এসে আঁচল টেনে ধরে—তুমি আর যাবে না বলো।

পূর্ণর শুকনো চোখে জল আসে। না মানিক। আমি যে মরে গেলেও তোদের ছেড়ে কোথাও যাবো নাকো। শাঁখচুন্নী হয়ে ঐ আমডালে বসে তোদের পাহারা দোবো।

উকিলমা মহাভারত পাঠ করতে করতে বড়ো চমৎকার ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। বকরূপী যক্ষ যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন ব্রাহ্মণত্ব কাকে বলে তখন ধর্মরাজ বলেছিলেন যিনি কেবল বেদপাঠ, হোমযাগ আর শাস্ত্র চিন্তা করে দিন কাটান তিনি মূর্খ। তাঁকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলে না। কিন্তু যিনি নিজের মনটিকে উঁচু রেখে হীন প্রবৃত্তি ত্যাগ করে কেবল সকলের মঙ্গলের জন্যে কর্ম করে যান, নিজের বৃত্তি থেকে সরে দাঁড়ান না তিনিই ব্রাহ্মণ।

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করে—তবে আমার কি হবে মা। মহাভারতে আমার কথা কিছু

বলেনি ?

—বলেছে বইকি। এই তো সব বলা হল। তুই একে নাপতেনী তায় আবার মেয়েমানুষ। তোর কাজ হল যজমানি করে মানুষের সেবা করা। তাই করলেই তোর সব হবে। ঠাকুর পুজো না করলেও চলবে। এই আমাকে দেখছিস না।

—আর ?

—আর ? মরে গিয়েও তোর নিস্তার হবে না মেয়ে। এই ধর আমি আজ রাতে মরে গেলাম।

—ওমা কি অলক্ষুণে কথা।

—হ্যাঁরে। মরেও গিয়েও যে পার পাবো না। পেত্নী হয়ে ঐ বেলগাছে বসে দেখবো তোর কত্তাবাবা ঠিক মতন লুচি ক্ষীর যোগান পাচ্ছে কিনা। যদি না পায় তো ঐ বামুন মেয়ের ঘাড় মটকাবো।

বামুন মেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ওঠে।

উকিলমার কথা মনে করেই পাথর মূর্তিকে মানুষ জ্ঞানে সেবা আর বাঁশীর বদলে গভীর রাত্রে এস্রাজ শোনা। এ স্বভাব তো তাঁরই দান। তিনি উসকে না দিলে প্রদীপ যে নিবে যেতো। উকিলমা তো শেখালেন পাথরের চেয়ে মানুষ বড়ো। আর সেই বিশ্বাসটি বুকে করে, ঈশ্বরগুপ্তর পরিবারের তপ্ত নিঃশ্বাস মাথায় নিয়ে ধরিত্রীদেবী উকিলকর্তার সেবা দেন। তাঁর পানটি নিজে হাতে সেজে রাখেন। বদনায় জল ভরে রাখেন। গরমের দিনে বিকেলবেলা জলে ভিজানো তরমুজ কেটে তার ওপর গোলাপ জল ছিটিয়ে রেকাবিতে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেন বামুন মেয়ের হাত দিয়ে। তিনি যে ধরিত্রী। এ সবই তো তাঁর বৃত্তি। কর্তা চান না তাই তিনি ঠাকুর দেবতা ভজেন না। দেব দর্শনে যান না, তীর্থস্নান করেন না। যে ঈশ্বরগুপ্তর কারণে তিনি এতো ব্যথা পান তাঁর কথাতেই তিনি বলেন—দরশনে দরশন, করে হয় কার। খটমট, ঘট-পট, ভজকট সার।

পূর্ণ হেসে বলে—তবু আমার ভাগ্যি মা। আপনি কত্তার জন্যে ক্ষীর না করলে কি আর আমি চাঁচি পেতুম।

উকিলমা কপট রাগে বলেন—ওরে মেয়ে। দাঁড়া কাল তোকে সাজা দেবো।

—কি সাজা মা। জীবনে ক্ষীর দিয়ে কাঁঠাল খাইনি। সেই সাজাই দেবেন।

—কাল তোর গরম ভাতে ঘি।

পরদিন একপাত্র ক্ষীর কাঁঠালের সাজা পূর্ণর জন্যে সাজানো থাকে। সেদিন পাঠ হয় মহাভারতের কার্তিকেয় জন্ম সূচনা পর্ব।

লোকে আড়ালে আবডালে বলতো—ওরা ঠাকুর বাড়ির লোক। ওদের যেন

ছুঁস নে। কেউ আবার বলতো—ওদের ছায়ায় যেন পা দিস্‌নে। ওরা হল দেবদাসী। এই দুই নম্বর কথকদের কথার মধ্যে যেন বেঁকা বঁড়শির টেরা নজর ছিল। মায়ের কারণে ওরা কথাটি যোগ করা হতো। আসলে লক্ষ্য তো একজনই। পূর্ণশশীর দেহে বিয়ের জল পড়ে সেই কোন কালে বাষ্প হয়ে গেলেও সহজে মজে যায়নি। মেয়ে অন্নপূর্ণা যখন বারো বছরের তখন পূর্ণ ভরা আটাশে রমণী। অমাবস্যা, একাদশী আর পার্বণের নির্জলা উপবাসেও শরীর ভাঙেনি, আতেলা রুখু কেশে চাকচিক্য যায়নি। থান কাপড়ের আড়ালে যে শরীরের আটপৌরে রাখবার এতো ঘটাপটা তার ঐ বিনি সাজই যেন ঝিনুক সাজিয়ে দেওয়া। সকালবেলা বুনো ফুলের পাপড়িতে শিশির আর রোদ পড়ে যেমন দেখতে হয় এও ঠিক তেমনি। মা বলতো—ঐ যারা ছায়ার কথা বলে তাদের ছায়া থেকে সাবধান থাকবি।

একদিন হালিসহর লালকুঠির এক বাড়ি এয়ো কামিয়ে পূর্ণ হাঁটা ধরেছে ঘরের দিকে সিধে ঘোষপাড়া রোড ধরে। বেলা তখন দুপুর। গরমকালের দুপুরে রাস্তায় মানুষজন কম। মাথার চাঁদিতে ভিজে গামছা চাপিয়ে পূর্ণ বড়ো বড়ো চরণে চলে। সে না ফেরা অবধি মা-মেয়ে না খেয়ে বসে থাকবে। হালিসহর খাসবাটির মোড়ের কাছে আসতে ডান হাতে ছোট চালার মুদির দোকানের বাখারির বেঞ্চিতে বসা একটি লোক উঠে এসে পূর্ণর সামনে দাঁড়ালো। এক পলকে দেখলো পূর্ণ লোক টির মাথায় বাবরি চুল, সারা মুখে মায়ের দয়ার দাগ, বেশ ঢ্যাঙা আর পোক্ত চেহারা। চোখ দুটি লাল আর মালকোঁচা মেরে ধুতির মাজায় একটি গামছা বাঁধা। দেখে মনে হয় এই মাত্র যেন চারটে মোষ বলি দিয়ে উঠে এল। পূর্ণ রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়ালো। লোকটি বলে—দাঁড়ান, কথা আছে।

পূর্ণ চারপাশে তাকায়। বামদিকে গঙ্গা আর দক্ষিণে ঘন গাছপালার ফাঁকে দুই একটি বড়ো কোঠা বাড়ি। দূরে এক রাখাল ছেলে এক পাল গরু নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুদির দোকানী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চারদিকে কেমন এক ভাতঘুমের নেশা। এমনকি বড়ো বড়ো গাছগুলিও যেন ঢুলছে। লোকটি আবার বলে—আপনি তো এখান দিয়ে প্রায়ই যান দেখি।

—হ্যাঁ, যাই বইকি।

—আপনাকে আমি চিনি। আপনি আমাকে চেনেন না।

পূর্ণ এবারে একটু খর হয়—তা চিনবেন বইকি। প্রায় যেখানে দেখেন।

লোকটি একটি নিচু হয়—না না সে কথা নয়। আপনি তো আমাদের নিভাননী দিদির মেয়ে।

পূর্ণ চোখ তোলে—কেন বলুন তো ?

—তিনি আমার দিদি হন। আমার বাবা তাঁর মামা হতেন।

পূর্ণ দুই পা এগিয়ে দাঁড়ায়—তা বেশ তো, একদিন যাবেন আমাদের ওখেনে।

—যাবো। দিদিকে বলবেন হালিসহরের পরমেশ্বর দাসের ছেলে গজাননের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আহা দিদির হাতের বেগুনি কতোদিন খাইনি।

—আপনি তাহলে আমাব মামা হলেন।

লোকটি হাসে—ঐ আর কি।

—কেন, ঐ আর কি কেন। মামাকে কি কেউ মেসো বলে

পূর্ণ হাঁটা ধরে। গজা পিছন থেকে বলে—'সামনের রোববার বিকেলে যাবো। ঘরে থেকো।'

আপনি থেকে তুমি খট্ করে কানে বাজে। দূরে তাকায় পূর্ণ। দেখে জেলেপাড়ার দিক থেকে তিনজন মানুষ বাঁশে জাল চাপিয়ে কাঁধে করে গঙ্গার দিকে হেঁটে আসছে। সবার আগে এক ছোট মেয়ে। মাথায় মেটে হাঁড়ি আর হাতে কেরোসিনের ডিবে—কাঁচ দিয়ে ঘেরা। বাপ ভাই নৌকায় মাছ ধরতে যাবে বলে মেয়ে ভাত ডাল আলো সব এগিয়ে দিতে এসেছে। পূর্ণ মানুষ দেখে আরো বল পায়। বেশ বড়ো বড়ো পা ফেলে চলে যেতে যেতে বলে যায়—হ্যাঁ গজামামা, যেওখুনি। মা তোমায় দেখে কি আহ্লাদই না করবে।

ঘরে ফিরে মাকে সব বৃত্তান্ত বলে পূর্ণ। মা বলে—মামার ক্ষেতে বিয়োল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।

—সে কি মা!

—হ্যাঁ। আমি তো বাপু কোনকালে গজাকে দেখিনি। তবে পরমেশ্বরকে চিনি। সে তো সেই কোন কালে মরে ভূত হয়ে গেছে। গ্রাম সুবাদে মামা।

—তা তো জানি না মা। বেগুনি ভেজে রেখো। রোববার বিকেলে এসে খাবে।

রবিবার সন্ধ্যার ঝোঁকে এসে পড়লো গজানন। পূর্ণর গজামামা, নিভাননীর মামাতো ভাই। আজ আব তেমন লাগছে না। বেশ সেজেগুজে ধোপদুরস্ত হয়ে এসেছে। লপেটা ধুতি, জামা, মুখে পান আর বাবরি উড়ছে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মিটি মিটি হাসছে মামা পূর্ণর দিকে চেয়ে। বারান্দার একপাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা ভোলা কুকুর নতুন কুটুম্বকে দেখে সেই যে ডাকতে আরম্ভ করল আর থামে না। মামার রুমাল চাপা মুখ থেকে যে বদখত গন্ধ উঠছে তাতে ভোলারও বুঝি কেমন কেমন ঠেকছে। মা বলে—এসো ভাই এসো।

গজানন হেঁট হয়ে মুখে হাত দিয়ে পা ছোঁয়। মা বলে—তোমার মুখে কি হল ভাই ?

—দাঁতে ব্যথা দিদি। বড়ো ব্যথা।

—মধুর সঙ্গে চুন মেড়ে গালের ওপর দিও। সেরে যাবে। তোমার মা এখন কোথায় ?

পঞ্চানন আকাশে হাত দেখিয়ে বলে—যেখানে যাবার সেখানেই গেছেন।

পূর্ণ বারান্দার কোণে উনুনে আঁচ দেবার যোগাড় করে। পাশে ফালা ফালা করে বেগুন কাটা। বেসন গুলে ভাজা হবে। মামা গরম গরম খাবে। গজা বলে—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কি যোগাযোগ না রাখলে চলে। তোমার মেয়েকে দেখতুম আর ভাবতুম পরিচয় করি। তা কথা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকতো।

—সে কি কথা ভাই !

—মেয়ে তোমার বড়ো তেজী যে।

পূর্ণ উনুনে কাঠ দিতে দিতে শোনে ভাই বোনের কথা। মা বলে—অবলা বিধবার যে ঐ তেজটুকুই সম্বল ভাই।

—আহা, তোমার মেয়েকে দেখে আমার বুকটা ফেটে যায় দিদি। কাঁচা বয়স।

—কাঁচা নয়। ওর এই এতো বড়ো একটি মেয়ে আছে।

—সে কোথায় ?

—মন্দিরে গেছে পালার বাসন মেজে দিতে।

গজানন বলে—একটু জল খাবো। বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

নিভাননী গলা তুলে বলে—পুণ্য, তোর মামাকে এক গেলাস জল দেনা মা।

পূর্ণ ঘোমটা টেনে জল নিয়ে যায়। জল নেবার সময় পূর্ণর হাতটা হঠাৎ মামা চটকে দেয় কসাইয়ের মতন আঙুল দিয়ে। পূর্ণ শিউরে উঠে হাত ছেড়ে দিতে গেলাস ঝন ঝন করে মেঝেতে পড়ে যায়। গজানন হেঁ হেঁ করে বলে—দিদি তোমার মেয়ে বড়ো লাজুক।

পূর্ণ নিঃশ্বাস চেপে গেলাস তুলে নিতে হেঁট হয় আর বুঝতে পারে তক্তপোশে বসা মামাটি তার বুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। মা বলে—মামার কাছে লজ্জা কিসের।

গজানন বিড়বিড় করে বলে—ও সমস্ত বাইরের সম্পর্ক। তোমার সঙ্গে আমার হল ভেতরের সম্বন্ধ।

পূর্ণ ছিটকে সরে যায়। মা হয়তো শুনতে পায়নি কথাটি। পূর্ণ বলে—মা,

আমি ভোলাকে মাঠ থেকে ঘুরিয়ে আনি। ওর পাইখানা পেয়েছে।

ভোলার দড়ি ধরে পূর্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে বিহারী উকিলের বাগান বাড়িতে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে। এই প্রথম উকিলবাবার কাছে সাহায্য নিতে এলো—বলতে গেলে প্রাণের দায়ে। ঠোঁট কাঁপছে, মাথার কাপড় পড়ে গেছে, জিভ টেনে ধরেছে।—বাবা আমাদের বাঁচান। ঘরে মদ খেয়ে লোক এয়েছে।

সেদিন ঐ পাষাণ বিহারী উকিল বিধবার মান রেখেছিলেন। তিন-চারজন মক্কেল, মুহুরি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কসাইটিকে জুতোপেটা করতে করতে রথতলার সীমানা পার করে দিয়ে এসেছিলেন। মামার বেগুনি খাওয়া হয়নি। পূর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পায় লোকটা টলতে টলতে দৌড়োচ্ছে আর বলছে—যেতে দেবেন তো? আমায় যেতে দেবেন তো?

রাতে শুয়ে মা বলে—কে বলে অবলা বিধবার হাত নেই। তুই তো দশভুজা মা।

পূর্ণ হেসে বলে—তোমার পাঁচ হাত আর আমাব পাঁচ।

কিন্তু যে পূর্ণ বিপদকালে দশভুজা সেই যে আর এক চরম বিপদের দিনে দশ হাত দূরের কথা দুটি হাতও যে বার করতে পারে না। বিপদ চোখের সামনে দিয়ে এসে ধীরে সুস্থে গুছিয়ে চলে গিয়েছিল। হারাধন যখন তার মায়ের কথা বলে তখন পূর্ণর নিজেকে বড়ো অপরাধী বলে মনে হয়। একটি পুরনো আফশোষ মনে মনে মাথা কোটে। কেন যে মেয়েটাকে নিজের কাছে আনলাম। প্রথম ছেলে যেমন স্বামীর ঘরে হয়েছিল তেমন হলে ক্ষতি কি ছিল। পরেরটি আমার কাছে হোক এমন সাধ না করলেই বুঝি ভাল হতো। কিন্তু মা যে একরকম জোর করে বলেছিল আমার নাতনি আমার হাতে একবারও তো বিয়োবে। আমি যে কেবল নাপতেনী নই পাকা ধাইও বটে একথা নাতজামাই জানুক। কিন্তু একথা তো ঠিক যে মা তার বিদ্যের দৌড় দেখাবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। নাতজামাই তার হাতযশ দেখবার সুযোগ পেল না।

তবুও হারাধন যখন বলে মা অন্নপূর্ণার আলতা পরা পা দুখানি তার বুকে আঁকা হয়ে আছে তখনি ভিতরটা ঝলসে যায়। বাবলা কাঁটার গয়না যেন উলটে নিজের অঙ্গেই হুল বিঁধে দেয়। নাতিকে বলে পূর্ণ—ও কথা থাক্।

হারাধন নাছোড়।—কেন থাকবে। মার কথা শুনতে কার না ভাল লাগে।

—এক কথা কতোবার শুনবি ভাই।

—তুমি যতোদিন আছো ততোদিন।

হারাধন ঠিক ঐ পর্যন্ত শুনতে চায় যেখানে তার স্বপ্ন এসে মিলে যায়। পূর্ণ কিন্তু তারপরেও একটু বলে। তবে মুখে না। মনে মনে। আপনার কথা

আপনাকে।

গর্ভ যন্ত্রণার সঙ্গে অন্নপূর্ণার যে একটি কাল যন্ত্রণা উঠেছিল সে কথা কেউ বুঝতে পারেনি। তার পায়ে তিন-চারদিন আগে একটি পেরেক ফুটে জায়গাটা সামান্য ফুলে উঠেছিল। সেই ব্যথা নিয়ে মেয়ে পা টেনে টেনে পুকুর নেবেছে, দু' বছরের ছেলেকে কোলে করে হাঁড়িতে চাল ধুয়ে এনেছে। রাতে কুঁচকি আউড়ে যন্ত্রণায় কাতরেছে। পায়ের তলা তিনদিনের দিন পুঁজ নিয়ে থর হয়ে ফুলে ওঠে। মা সেই জায়গায় মুখটা নরুন দিয় চিরে যষ্টিমধুব সঙ্গে তিলবাটা প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। তাতে কাজ হল কিনা বোঝবার আগেই সে রাত্রে মেয়ের বেদনা উঠলো। সেও ছিল শরৎকালে একটি রাত্রি। বাইরে শিশিব পাত হচ্ছে। জমিদারের পুরনো বাগানে দূর দেশের বিদেশী পাখিবা নামতে শুরু করেছে একটি দুটি। এ সময়ে পুকুর ধারে নানা জাতের পাখি এসে জোটে। তিন চার মাস এ বাগানে সে বাগানে বাসা বদল করে উড়ে ফেবে তারপর আবাব গঙ্গার চরের দিকে চলে যায়। অন্নপূর্ণা মেঝেতে শুযে যন্ত্রণায কাতবায। ওদিকে ছোট ঘরখানিতে মেয়ের আঁতুড় পাতা হয়েছে। বাগানে ডাক পাখিব সঙ্গে বেলে হাঁসের কাজিয়া বাঁধে। পূর্ণ মেয়ের হাত টেনে দেয়, মাথায় হাত বুলোয়। মা নাতনির কাছে বসে তার পেটে তেল-জল ডলে দেয। যদি একটু আরাম দেওয়া যায়। দুই বছরের হারাধন পাশেব ঘবে ঘুমে অচেতন। ও ঘবে শুয়ে ছেলে জানতেও পারছে না তার রক্তের ভাগ নিতে আব একজনেব আসবাব দাপটে মা জননীর দেহ কিরকম হিম হয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় অন্নপূর্ণার শরীর দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। চোখে মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। কেবলি একবার এপাশ আব একবার ওপাশ করছে আব বারে বারে বলে উঠছে—ও মা, কখন ছেলে হবে মা। আমি যে পারছি না মা।

পূর্ণ মেয়ের হাত টেনে দেয়—হবে মা। এই হল বলে।

মা বলে—আর দেরী নেই দিদি। আর একটুখানি।

অন্নপূর্ণা শূন্য চোখে একবার মাকে আর একবার দিদিমাকে দেখে। নিভাননী পেটে তেলজল মালিশ করতে করতে হাত চেপে বোঝবার চেষ্টা করছে অন্দরের প্রাণটিকে। কেমন ধড়ফড় করছে বাইরের আলোয আসবার জন্যে। গর্ভের অন্ধকারে হেঁট মস্তক আর উর্ধ্বপানে পা নিয়ে কতো দিনেব সাধনাব শেষ হতে চলেছে আজ।

পূর্ণ হাতের কাছে ছেঁড়া কাপড় নেকড়ার বোঝা, জলের পাত্র আর বাখারি চাঁচা যোগাড় করে রেখেছে। অন্নপূর্ণা হাঁ করে দম নেয়—ওমা কখন ছেলে হবে মা।

মা সেই একই উত্তর দেয়। দিদিমা সান্ত্বনা দেয়—আর দেরী নেই দিদি।

এর পর সত্যি আর দেবী হয়নি। অন্নপূর্ণার সমস্ত শরীর হঠাৎ বেঁকে ওঠে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাজ পড়বার আগে বাঁকা বিদ্যুতের চেহারা নিয়ে ছিটকে মাটিতে নেমে আসে। চোখ দুটি শূন্যে ঘুরতে থাকে। হাতের মুঠিতে মায়ের আঁচল খামচে ধরে অন্নপূর্ণা হেলে পড়ে। ঠিক তখনি পূর্ণ মেয়ের পূর্ণ ঘটে হাত রেখে বুঝতে পারল ভিতবকার অস্থিরতা দু চারবার কাটা ঘুড়ির মতন মাটিতে গোঁত্তা খেয়ে থেমে গেছে। সমস্ত দাপাদাপি জুড়িয়ে স্থির। নিভাননী চিৎকার করে ওঠে—ওমা, মেয়ের টংকার লেগেছে রে।

বাইরে ভোর হয। পাখি জাগে। শরতের আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে এই গ্রাম দেশের মানুষ জেগে ওঠে। মাহিন্দরবা গরু নিয়ে মাঠে যায়। বউ ঝি কলসি কাঁখে জলে। ভোলা কুকুর বারান্দায় বাঁধা। ডেকে ডেকে সেও আলা। হারাধন এখনো ঘুমে। জ্ঞানহাবা মেযেব মাথা এক কোলে আব এককোলে প্রাণ-নেই অন্নপূর্ণাব মাথা নিয়ে একলা নিভাননী অপেক্ষা করে কখন পাঁচজন মানুষ আসবে।

শ্মশানের আঘাটায় কুলগাছটিব নিচে পূর্ণশশী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে টেব পায সাবা দেহে কুলকাঁটাব ব্যথা। জ্ঞান ফিরতে দেখে ওপরে চিতা সাজানো হয়েছে। তাবই একপাশে বাঁশেব মাচায় অন্নপূর্ণার পা দুখানি হাসছে। নাপতেনীব মেয়েকে আলতা পবানো হয়েছে। পবনে বাঙা শাড়ি। পাশে পাষাণ মা নিভাননীব কোলে হারাধন, অন্নপূর্ণার স্মৃতিব ধন, পূর্ণর পাপেব বোঝা—ড্যাবাডেবিয়ে চেযে আছে।

ডোম এসে অন্নপূর্ণার পেটে ছুরি বসায়। এক মরণে দুইজনে মরলেও সৎকার যে আলাদা। পেটের মধ্যে যে বয়েছে তার যে আগুনে ওঠবার অধিকার নেই। তাব জন্যে ববাদ্দ ওই অগাধ গঙ্গার মাটি। কিন্তু যতক্ষণ না গর্ভ খোলসা হয় ততক্ষণ যে আবার বহস্যের আড়াল। কি আছে, কি আছে ওর ভিতরে। কে সেই জন যে আসি বলেও আসতে পেল না। একটু পবেই শ্মশানডোমের কালো হাতের পাঁজায় উঠে আসে ধবধবে সোনার শিশু। মাথা ভর্তি কোঁচকানো চুল, বড়ো বড়ো নিবু চোখ আব এই পাটভাঙার দেহ। জুড়িয়ে পাথর হয়ে গেছে। পথিবীর বাতাস নেবাব আগেই নিজের দম হারিয়েছে। ডোমের হাতের ঘেরে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে জড় শিব। হারাধনকে আর রক্তের দাবীদারের জ্বালা সইতে হল না। শিশুর পেটের নিচে চোখ পড়তে পূর্ণ তাড়াতাড়ি চোখে হাত চাপা দেয়। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল পূর্ণশশী কার্তিককুমার দিগম্বর ভোলানাথ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। মুখের সেই ফিচেল হাসি ঠোঁটের

কাছে এসে পাথর হয়ে গেছে।

সেদিন রাতে হারাধনকে মাঝে রেখে মা-মেয়েতে শোয়। পূর্ণ টের পায় সারা শরীরে বিষকাঁটার যন্ত্রণা। ছিঁড়ে যাচ্ছে দেহমন। অন্ধকারে কাঁপা হাতে একটি একটি করে কুলকাঁটা তোলবার বৃথা চেষ্টা করে পূর্ণ। একটি কাঁটাও উৎখাত হয় না।

সেই কাঁটাগুলি আজও বয়ে চলেছে রক্তের স্রোতে দেহের আগাপাছতলা পরিক্রমা করে চলেছে দেহের আঁস্তাকুড় না কি মন্দির। কে জানে।

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার, এই যে নন্দিনী আইল...

অগ্রহায়ণ থেকে আশ্বিন। মাঝখানে দশটি মাস। মায়ের জঠরে বাস করে কালরাত্রির অন্ধকার উদযাপন।

আমতলার ভিটেতে আজ এই আশ্বিনের মাঝ সময়ে এসে পৌঁছে দশমাস পোহানো শেষ হল। আশ্রয়দাত্রী মাটিও যে গর্ভধারিণী। তিনিও যে ধারণ করেন, জায়গা করে দেন। এতোকাল পরের আশ্রয়ে বাস করে শেষ বেলায় বুঝি নতুন করে জন্ম নিতে এই মাটিতে মাথা রাখা। মায়ের জঠরে অহর্নিশি যন্ত্রণার ব্রত পালন করতে করতে অপেক্ষা করা কখন রাত্রি শেষে দিন আসবে, পুব আকাশ ফুটে উঠবে পদ্মের পাপড়ির রঙ নিয়ে। কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে—বাবার কাছে শোনা এ গানটির মানে এখন কতক কতক বুঝতে পারে পূর্ণশশী।

গর্ভধারিণী মাটির যে গর্ভযন্ত্রণা নেই এ কথা তো জানা। গর্ভযন্ত্রণা হয় তার যে অন্দরে বাস করে। তাই তো প্রার্থনা চলে দিবানিশি—অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলো. রাত্রি হতে দিনে—রসাল নন্দনে।

আশ্বিনে শরৎ। এই শরৎ ঋতু পূর্ণশশীর কাছে বরাবরের জন্যে বিজয়ার কথা বলে। আকাশে আগমনীর নীল মেঘ ওঠে, গঙ্গার উদাস চরে কাশফুলের শোভার মাঝখানে বিদেশী পাখিরা খেলে বেড়ায় আনন্দে, সাদা বকের দল নদীর জলে আকাশের ছায়া মেখে পারাপার করে। প্রবাসী মেয়ে বৎসর পরে বাপের বাড়ি আসে। পূর্ণ বসে দেখে আর ভাবে যারা এল তারা আবার ফিরে যাবে। কেউ থাকতে আসে না এখানে। বিদেশী পাখির দল এসে হেসে-খেলে যায় দুদিনের জন্যে। খেলা শেষে বিসর্জন, ফিরে যাওয়া আপন ঘরে। এই শরতে আশ্বিনের আগমনকালে পূর্ণ দুটি বিজয়া দেখেছে। শরতে যেমন কার্তিককুমার আর শরতেই অন্নপূর্ণা। এখন তার নিজের পালা। তাহলেই তেমাথা এক হবে—সে চলে

যাওয়া শরতে বা বসন্তে হোক না কেন।

বৎসর পরে জমিদার বাড়ির নাটদালানে আবার রঙ পড়েছে। আলো জ্বলেছে। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ি জম জম করছে। ললিতকর্তা তলব করেছেন পূর্ণকে পূজার পাঁচদিন জমিদার বাড়ি পালা। আর এ পালার মূল গায়েন হল পূর্ণশশী। বোধন থেকে শুরু করে বিজয়া পর্যন্ত। পূজার সমস্ত যোগাড়যন্ত্র পূর্ণ ছাড়া কেউ করতে পারে না। পূর্ণ কতবারই না বলেছে ললিতগিন্নীকে এবারে আমায় রেহাই দিন। কিন্তু সে নিবেদন তাঁর কানে ওঠে না। পূর্ণ বলে, আমি বেঁচে থাকতে কাজগুলো আর একজনকে শিখিয়ে বুঝিয়ে নিন। এবারে উত্তর হয়—তুমি থাকতে অন্য কারোর কথা যে ভাবতে পারি না। বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় পূর্ণর হাতে জমিদার বাড়ির গোমস্তা একখানি থান কাপড়, পাঁচটি টাকা আর মিষ্টি তুলে দেন। পুরনো আমলের একটাকা থেকে বেড়ে পালা সেবার দক্ষিণা হয়েছে পাঁচটাকা। আর তিনচার বৎসর পূর্ণর সঙ্গে নৈবেদ্যর ঘরে হাতে হাতে কাজ যোগান দেবার জন্যে তিনচারজন মেয়ে বউকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ রাত্রি পোহালেই মহাসপ্তমী। দেবীর মূল পূজা আরম্ভ। সকালে জমিদারবাড়ির নাটমন্দিরের লাগোয়া ঘরে পূর্ণ তার কাজের দখল বুঝে নিয়েছে। বোধনে পূজার সমস্ত আয়োজন হাতে হাতে এগিয়ে দিয়েছে। বোধন হয়েছে সন্ধ্যার মুখে সূর্য ডোবার পর—অন্ধকার ঘণালে। এখন রাত্রির মধ্য প্রহর। ভোর হবার অনেক আগে পৃথিবীতে রাত্রি থাকতে পূর্ণকে উঠতে হবে। মহাসপ্তমীর দেবীস্নানের শেষ যোগাড়টি সারতে হবে। সে ভিন্ন এ কাজ অন্য কারোর দ্বারা হয় না। মেঝের চাটাইয়ে শুয়ে পূর্ণ শুনতে পায় বাইরে কুকুরটা ডাকছে, ঘরের মধ্যে ছাগলছানা গা ঝাড়া দিচ্ছে। হারাধন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে অভ্যাস মতন। ছোট নাতি অমরনাথ ক্রিমি রোগে দাঁত কড়মড় করছে থেকে থেকে।

আজ সন্ধ্যায় দেবীর বোধনের সময় পূর্ণর মনে পড়েছিল অন্নপূর্ণার চলে যাওয়ার সেই ছবিখানি। আবাহনের আনন্দ আসরে অকাল বিজয়ার চিত্রপট যে কেন উঠে এলো তার মানে খোঁজবার অবসর তখন মেলেনি। বোধনের সন্ধ্যায় পূর্ণ একটি আশ্চর্য ছবি দেখলো যার মানে তখনি পরিষ্কার হয়ে যায়। এয়োরা উলু দিচ্ছে, বৃদ্ধ ললিতকর্তা দূরে উঠোনের মাঝখানে গলবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করে প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জোড়া ঢাকে বাজছে উৎসবের বাজনা, ছেলেপুলেরা হুটোপাটা করছে। উঠোনের এক কোণে বোধনে বসেছেন পুরোহিত বেলগাছটির নিচে। পূর্ণ প্রতিমার সামনে বসে পূজার সামগ্রী গোছ করছে। সহসা চোখ গেল দেবীর ঘটের সামনে রাখা কুণ্ড হাঁড়ির তেকাটার

ওপর পেতে রাখা দর্পণে। ঝাপসা নজরে বিজলী আলোয় পূর্ণ পরিষ্কার দেখতে পেল দর্পণে দশভুজার মুখ নেই। নেই কান পর্যন্ত টানা চোখের অপার শান্তি, ট্যাঁপা নাকের পাটায় নথের শোভা আর নকল গজমোতির ঝকঝকে মুকুট। তার বদলে ভেসে উঠেছে একমাথা রূপোর চুলের ছাদনাতলায় দোমড়ানো কোঁচকানো সাত বাসটে একখানি মুখ, নড়বড়ে নাক আর একটু ওপরে এক জোড়া ঘসা পাথরের চোখ যার দুটি মণি একটু ইদিক উদিক। মা জননী লক্ষ্মী ট্যারা। পূর্ণ তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকালো ওপরে। দেখলো নিষ্প্রাণ প্রতিমার মুখে যেমন হাসি লেগেছিল ঠিক তেমনি আছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলে হাসি নড়ে উঠবে। মুখ নামিয়ে পূর্ণ কাঁপা হাতে পাশে রাখা ঘটের গামছাখানা দর্পণে চাপা দিয়ে দিল। উঠে যেতে গিয়ে টের পেল বুক গুরগুর করছে। মনে হল এবার কি বিজয়ার সময় হল। আনন্দে আতঙ্কে পূর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়ে।

চালাঘরের অন্ধকারে রাত্রির তৃতীয় প্রহরের জন্যে অপেক্ষা করে পূর্ণ। এ জগতের পশুপক্ষী, মানুষজন, গাছপালা সব এখন ঘুমিয়ে রয়েছে। কেবল ঘুম নেই তার চোখে। একা জেগে রাত্রির এই নিরিবিলি অবসরে পূর্ণ ভেবে মরে কেন আজ সকালে আবাহনের বাজনায় বিসর্জনের ঘোর লেগেছিল। কেন অন্নপূর্ণার ছবি মনে এল। এ কথা মনে হতে আবার সেই উকিল-মার দোরগোড়ায় গিয়ে মনে মনে দাঁড়াতে হয়। উকিল-মা—যিনি তার জ্ঞান অজ্ঞানের চাবিকাঠি তাঁকে টেনে আনতে হয়। উকিল-মা বলতেন—আমি মরে গেলে স্বর্গেও যাব না নরকেও না। আমি থাকব মাঝামাঝি এই মাটিতে। আমার বাপু বড্ড মায়া।

উকিল-মা একদিন বলেছিলেন—হ্যাঁরে মেয়ে, এতো যে বছর বছর হাতে করে দুর্গাপুজোর যোগাড় করিস, তা বোধনের মানে বুঝিস?

পূর্ণর তখন একটু জ্ঞানগম্যি হয়েছে। সে বলে—হ্যাঁ।

—কি বলতো শুনি।

—কি আবার, এসো বসো বলে মাকে আদর তোয়াজ করা।

উকিল-মা হেসে বলেন—আমি কিন্তু পুজোতলায় যাইনে। তবু বলি শোন্। বোধন হল দেবীর নিদ্রাভঞ্জন। তাঁকে ঘুম থেকে তুলে পূজার বেদীতে বসানো হয়। শরৎকালের আগে পর্যন্ত থাকে উত্তরায়ণ, দিনমানের কাল। আর শরতে শুরু দক্ষিণায়ন, রাত্রির কাল। দিনের বরাদ্দ কাজকর্ম আর রাত্রির নিদ্রা। দক্ষিণায়নে তাই দেবীকে ঘুম ভাঙাতে হয় বোধন করে।

বোধনতলা কখনো চণ্ডীমণ্ডপে হয় না। উঠোনে বা বেলতলায়। চার কোণে শরকাঠি পুঁতে সুতো দিয়ে ঘিরে তৈরি হয় বস্ত্রগৃহ বা আঁতুড় ঘর। সেই সুতোর

বেড় দেওয়া তফাৎ-ঘরে জোড়া বেল সমেত বেল ডাল পোঁতা হয়। সামনে বেদীতে আলতা সুতো আর ছুরি। জোড়া বেলের একটি হল মায়ের গর্ভ আর একটি হল গর্ভের মধ্যে থাকা মায়ের সন্তান। নাড়ি কাটবার জন্যে ঐ ছুরি। নাড়ি বাঁধবার জন্যে সুতো আর আলতা হল রক্তস্রাব। বোধন কখনো দিনের বেলা হয় না। কেননা রাত্রি হল মায়ের সন্তান প্রসবের সময়। তাই তো রাতের বেলায় দেবী দশভুজার অকাল বোধন। অকালবোধন শরতে। রাবণ বধের জন্যে বর-লাভ করতে রামচন্দ্র পূজা করেন দশভূজা চণ্ডীর। সন্ধ্যালগ্নে সাগরতীরে শ্রীরাম বোধনে বসেন।—সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন। আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাদি বসন ॥

অন্নপূর্ণার আঁতুড় ঘরে নাড়ি কাটবার বাখারি নেকড়া সবই যোগাড় ছিল। সব আয়োজন ঠিক ঠিক হয়েছিল। কেবল ছেলে কোলে করে সেজে ওঠেনি মেয়ে। দক্ষিণায়নের কালরাত্রিতে তার আর নিদ্রাভঙ্গ হল না। বোধনতলায় আবাহনের বাজনায় পথ ভুলে বিসর্জনের বোল বেজে উঠলো। প্রথম রাতেই কুণ্ড হাঁড়ির দর্পণে অন্নপূর্ণার কালো মুখ হেলে পড়লো পশ্চিমে।

বাইরে শরতের রাত্রি থমকে থাকে না। এক সময় থেকে আর এক সময় পলকে পার হয়ে যায়। অন্ধকারে কুবকুবো পাখি ডাকে। আর ডাকে শিয়াল। চোখে ঘুম ভারি হয়ে এলেও চোখ বোজবার উপায় নেই। সারাদিনে যা পরিশ্রম গেছে তারপরে আর ঘুম না এসে পারে কি? সকালে উঠে পূজার ঘর গোছানো থেকে কাজের পত্তন। নাড়ুর হাঁড়ি, সন্দেশের হাঁড়ি, ঘি, আসন অঙ্গুরী, মধুপর্কের বাটি সব কিছু গোছ করে রাখতে হয়েছে। যেন চোখ বুঁজে হাতে পাওয়া যায়।

আজ সকালেই মহাসপ্তমীর প্রথম স্নানের সামগ্রী গুছিয়ে রাখতে হয়েছে। বাকি কেবল একটি। আর সে কারণেই এই জেগে থাকা। মহাস্নানের জন্যে তেত্রিশ রকমের দ্রব্য প্রয়োজন। তার মধ্যে বত্রিশটির যোগাড় সারা। বেশ্যাবাড়ির মাটি, নদীর দুই কূলের মাটি, তিল তেল, পঞ্চদ্রব্য, পঞ্চ কষায়, আখের জল থেকে ধরে সাত-সমুদ্রের জল পর্যন্ত। আর শেষকালে একটি ছোট বেল ডাল—মায়ের দাঁতন কাটি। পূর্ণ এতো সব দ্রব্য মাটির খুরিতে সাজিয়ে রাখে আর ভাবে কতো সহজে না সব কিছু যোগাড় হয়ে গেল। দশকর্মা ভাণ্ডারের ছোট ছোট মোড়ক আর শিশির মধ্যে মহাস্নানের যাবতীয় সামগ্রী। ভাবলে অবাক লাগে ঐ ছোট শিশির মধ্যে রয়েছে সাতসমুদ্রের জল। আর ঐ কাগজের মোড়কে আছে গজদন্ত মৃত্তিকা আর পর্বত মৃত্তিকা। পূর্ণ বুঝতে পারে না কি করে এতো কম দামে দোকানী সাত-সমুদ্রের জল হাতের কাছে এনে দেয়। পূর্ণ তাই সব ছেড়ে শিশিরের জল যোগাড়ের দায় নিজের হাতে তুলে

নিয়েছে। একটি জিনিস অন্তত মনের মতন হোক।

বাইরে অন্ধকার হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না সময় হল কিনা। হ্যাঁ, আর দেরী নেই। দরমার দরোজার ফাঁক গলে যে বাতাস বইছে তার ধরন পালটে গিয়ে রাত্রি শেষের দিকে যাত্রা করেছে। সূর্য দেবের সাত ঘোড়ার রথ এখনো বহুদূরে। এখনো এক প্রহরের পথ বাকি। তিনখানি পাহাড়, তিনটি সমুদ্র আর অনেকখানি আকাশ পার হয়ে তাঁকে এখানে আসতে হবে। পূর্ণ আস্তে আস্তে উঠে বসে। আঁচলের কাপড় গলায় দিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে মনে মনে পঞ্চকন্যাকে প্রণাম করে। দরোজা খুলে বাইরে দাঁড়াতে কুকুরটা ভুকভুকিয়ে সাড়া নেয় আমতলার দিক থেকে। মাটিতে নখ গর্ত করে পেট ডুবিয়ে শুয়ে আছেন মহারাজ। আকাশে তাকায় পূর্ণ। তারার আলো ধোঁয়ার মতন ভাসতে ভাসতে আকাশ থেকে নিচে নেমে এসে খানিক পরেই পথ ভুলেছে। আমগাছটিব ওপরে তাকালে চোখ অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখনো পাতার ফাঁকে দুই একটি জোনাকি জ্বলে নেভে। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। সে বাতাসে নতুন হিমের গন্ধ যে কিনা এখনো ভারি কুয়াশা হয়নি। চারিদিকে পাতলা ধোঁয়ার মতন এখন তার চেহারা। বয়সের সঙ্গে ওজন বাড়বে। পূর্ণ স্নান সারতে পুকুরে গেল।

ঠাকুর দালানে জোরালো আলোর নিচে একলা প্রতিমা দাঁড়িয়ে। দূরে ঢাকি দুজন আর কাঁসিদার ছোঁড়া দুটি ত্রিপলের গাদায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে। এক পাশে জোড়া ঢাক। তিন চারজন মুনিষ চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনের এক কোণে জড়ো সড়ো ঘুমিয়ে। গোলা পায়রার দল মণ্ডপের দরোজা মাথায় আর কড়িকাঠের ফোকরে গম্ভীর বকবকম করছে। একটা কুকুর দূরে জল রাখার টিনের পাত্র ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে। সে একবার পূর্ণকে দেখে। পূজার নৈবেদ্য ঘরের চাবি খুলে তাক থেকে ছোট পাথর বাটি আর একটু তুলো নিয়ে পূর্ণ বেবিয়ে এল। খিড়কির দরোজা দিয়ে পূর্ণ জমিদারদের প্রাচীন বাগানে পা রাখে।

অন্ধকার হলেও চেনা পথে চলতে অসুসবিধা হয় না। পূর্ণ বাগানে পা দিয়ে দেখলো সুমুখে অন্ধকারের কাঁড়ি। দূরের নিরেট আকাশ এসে মিশেছে বনেদী গাছপালার মাথায়। সব গাছের রঙ এখন এক। হাওয়া দিচ্ছে শির শির আর তারই পলকা ঠোনায় পাতা-পত্রে শব্দ উঠছে ঝির ঝির। যেন দূর দিয়ে একটি ঝর্না বহে চলেছে। এ অন্ধকারে একমাত্র আলো হয়ে আছে ঐ সাবেক পুকুরের জল। এখানে সেখানে চক চক করছে, ঝিলমিল করছে অন্ধকারের আলোয়। একটি রাতজাগানি পাখি ওদিকের গোলাপ জাম গাছের দিক থেকে নেমে এল, তারপর জলে ডানা ছুঁইয়ে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। পূর্ণ দেখলো মাধবীলতার ঝাড়ে আর শ্বেত টগরের ফুল পাতায় তেলা ভাব। আরো পিছনে

অপরাজিতা, রঙ্গন, রক্তকরবী আর স্থলপদ্ম। বুনো আর পোড়ো বাগানটি এখনো এদের ধরে রেখেছে। পূর্ণকে যেতে হবে ঐ দিকে।

পুকুরের জলে একটি মাছ ঘাই মেরে উঠলো। শব্দ শুনেই বোঝা যায় মাছটা বেশ পাকা। পূর্ণ চমকে সামনে তাকালো। অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে পথ করে চোখ গেল সামনে ঐ পুকুর ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে থমকে দাঁড়ানো বাঁধানো শানে। শেষ রাত্রির শান্ত নির্জন বাগানে এতক্ষণ পাখির ডাক, পাতার শব্দ আর নিজের পা ফেলা ছাড়া কোনো শব্দ ছিল না। আচমকা ঐ মাছের জল ভেদ করার শব্দে পূর্ণর হাতে ধরা পাথরের পাত্রটি কেঁপে উঠলো। আর তখনি তার চোখের সামনে ঐ আলো না থাকা পুকুরঘাটের প্রাচীন শানে তার বাসি জীবনটিকে কে যেন আছড়ে ফেলল। পাটায় কাপড় কাচার আছড়ানির মতন সে শব্দ বড়ো নিদারুণ। জীবন তো আর ভিজে কাপড না যে আছাড় দিলে জল ছিটকে উঠবে। তাই আলো জ্বলে উঠলো। চোখ বাঁধানো আলো। প্রথমে শব্দ তারপবে আলো। এই আশ্চর্য মুহূর্তে, দিন আগমনের আগে, দেবীর মহাস্নানের আয়োজন সম্পন্ন হবার মুখে পূর্ণশশীর জীবন বেজে উঠলো পুরনো খেলার সাথী এই প্রাচীন বাগানের পুকুরঘাটে। অন্ধকারে একমাত্র মৃদু আলো হয়ে থাকা ঐ জলের কাছে। জলই তো জীবন। তাই জীবন জেগে উঠলো আর এক জীবনের কাছাকাছি। পূর্ণশশী অবাক হয়ে ভাবল জীবনে ছবি কোথায়, কোথায় বা রঙিন বেরঙিন চলে যাওয়া দিনগুলি। জীবন কি কেবল মাত্র আলো। জীবন কি কেবল ঐ জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক আগুন। আর কি কিছু নেই। পূর্ণশশীর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবন সাত রঙে রেঙে উঠলো আর তার পিছনে একে একে সিঁড়ি নেমে এল আকাশ থেকে। সেই জ্বলন্ত সিঁড়ির ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা প্রাণকৃষ্ণ, মা নিভাননী, সই কিবণশশী। উমা, উকিল-মা এমনি আরো অনেকে। তাঁদের সকলের অঙ্গে পূর্ণব জীবনেব ঐ সাত রঙা আলোব আভা। তার মাঝখানে দাঁড়িযে সকলে হাসছেন। আর একেবারে শেষ ধাপেব ওপর ধাপে দাঁডিয়ে আছে কার্তিককুমার। সেই কোঁচকানো চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা, মুখে মচব মচর পান আব কাঁধে ফেলা এস্রাজ। ঠোঁটের আগায় সেই ফিচেল হাসি। এস্রাজে ছড় উঠছে নামছে। বাজনা বাজছে জলদে আলোব ওপারে, আলোর আভার মাঝখানে। সুরটি কেমন চেনা চেনা ঠেকে। পূর্ণ কান পেতে শোনে। বাজনায় বাজছে আগমনী গান—আজ শুভ নিশি, পোহাইল, তোমাব এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘবে…

পূর্ণশশী তার জীবনেব আলোর সামনে দাঁডিয়ে দেখে সিঁড়িব শেষ ধাপটি এখনো খালি পড়ে আছে।

এক আকাশ তারা মাথায় করে পূর্ণশশী অন্ধকার বাগানে হেঁটে বেড়ায়। এখনো পূব আকাশে চির ধরতে খানিক দেরী আছে। গাছেরা এখনো রাতঘুমে। বাতাস স্নিগ্ধ। বাম হাতে পাথরের বাটি আর দখিন হাতে তুলো। গাছের পাতা থেকে ফুলের পাপড়ি থেকে পূর্ণশশী শিশির তোলে। কচি পাতার আর ফুলের মুখে আলতো করে তুলো রাখে। শিশিরে তুলো ভেজে। পাতার নরম দেহ আর ফুলের মৃদু পাপড়ি ধোয়া হিম শুষে নেয়। নিংড়ে পাত্রে ভরে নেয়। ঘুমন্ত চরাচরের মাঝখানে এই ঘুমে বেভুল ফুল পাতারা জানতেও পারে না কে তাদের দেহের হিম চুরি করে এই অন্ধকারে।

মাথার ওপরে আগল ছাড়া আকাশ থেকে যে মধু ঝরছে তার যে কোনো কৃপণতা নেই এখন। যতো পারো নিয়ে নাও। লুটে নাও ভাণ্ডার আর বোঝাই করো পাত্র। কেবল খেয়াল রেখো পাত্র যেন উপছে না পড়ে। তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। আলো উঠলেই আর পাবে না। আলো ফুটলেই হিম শুকিয়ে যায়। মধুর ভাঁড়ারে কুলুপ পড়ে।

পূর্ণশশী কাঁপা হাতে তাড়াতাড়ি শিশির তোলে। রাত পোহালেই মহাসপ্তমীর স্নানে বসবেন দেবী দশভুজা। স্নান শেষে হেসে উঠবেন দশদিক আলো করে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। পুব আকাশে সিঁদুরের ছিটে। ভোরের বাতাসে পাখি ডাকে ! পূর্ণশশী হাতের পাত্র পূর্ণ হবার আগেই টের পায় তার মাথা বেয়ে হিম ঝরছে। সে এতক্ষণ তা দেখেও দেখেনি।

মহাসপ্তমীর সূর্যোদয়ের মুহূর্তে জমিদার বাড়ির প্রাচীন বাগানে মানুষের অগোচরে এক চিন্ময়ী দশভুজার মহাস্নান সম্পন্ন হয়ে যায় একটি মাত্র উপচারে। সদ্য ঘুম ভাঙা পাখি আর গাছপালার দল সে দৃশ্য নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করে।